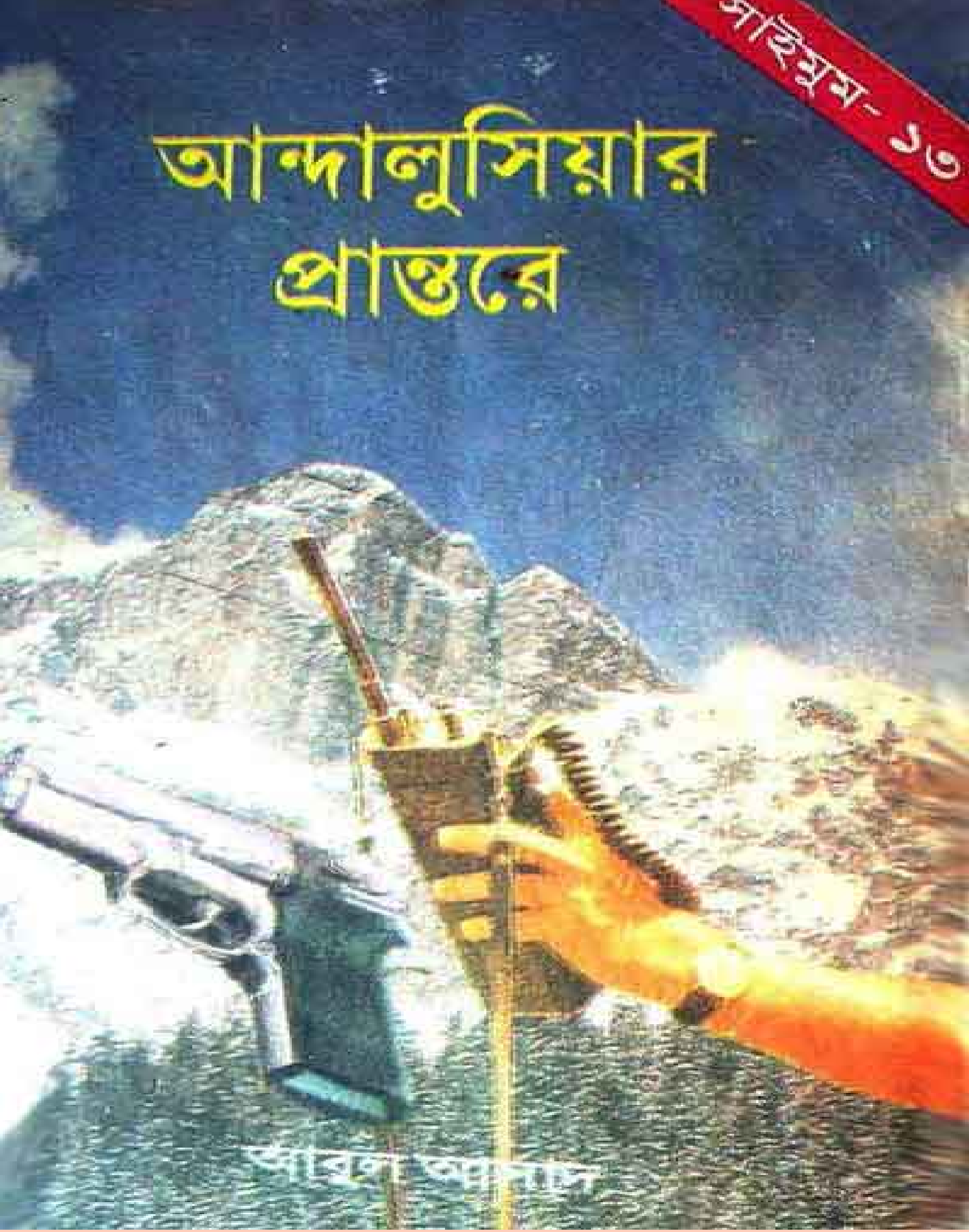
সাইমুম- ১৭
আন্দালুসিয়ার
প্রান্তরে

Taken From: saimumseries.com

More Books: priyoboi.blogspot.com

১

গ্রানাডা থেকে দু'মাইল দূরে 'মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস' পাহাড়, স্প্যানিশ ভাষায় 'Eultimo suspiro del Moro'। স্প্যানিশরা একে এই নামেই ডেকে থাকে স্পেনের শেষ মুসলিম সুলতান আবু আব্দুল্লাহর শেষ বিলাপকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। পরাজিত ও আত্ম – সমর্পিত সুলতান আবু আব্দুল্লাহ গ্রানাডা নগরীর চাবি বিজয়ী ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দেয়ার পর নিঃস্ব হয়ে নগরী ত্যাগ করে চলে আসেন। এই পাহাড়ে এসে ফিরে দাঁড়ান তিনি অতি সাধের গ্রানাডা কে শেষ বারের মত এক নজর দেখার জন্য। যে কান্না, যে অশ্রুকে সুলতান এই পর্যন্ত রোধ করে রেখেছিলেন, গ্রানাডার উপর শেষ নজরটি পড়ার পর তা আর কোন বাধ মানল না। শিশুর মত অঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন তিনি। আর তিনি বলতে লাগলেন, 'আল্লাহু আকবর, আমার মত দুর্ভাগ্য কার!' এই ঘটনা থেকে মুসলিমরা এই পাহাড়ের নাম দেয়, 'ফেজ আল্লাহু আকবর।' আর স্পেনীয় খ্রিষ্টানরা বলেন, 'মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস।'

মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের আহমদ মুসা যখন পৌঁছেছিল, তখন সাড়ে তিনটা। আসরের নামাযের তখনও অনেক দেরি। শোয়া চারটায় আসরের নামায এখানে।

আহমদ মুসা নামেনি গ্রানাডায়, সোজা চলে এসেছে মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ে।

কর্ডোভা থেকে যে আন্দালুসিয়ান হাইওয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেটা গ্রানাডার বুকের উপর দিয়ে মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের গিরিপথটি অতিক্রম করে চলে গেছে দক্ষিণে জিব্রালটার প্রণালীর দিকে। গ্রানাডা প্রবেশের অনেক আগেই আহমদ মুসা সিয়েরা নিবেদা পাহাড়ের পাদদেশে, দাঁড়ানো ‘আল হামরার দৃষ্টি মনোহর লাল প্রাসাদের একটা অংশ এবং তার ১২টি অভ্রভেদী চুড়ার একটির একটা ভাঙ্গা অংশ দেখতে পেয়েছিল। বুকে একটা প্রচন্ড খোঁচা লেগেছিল আহমদ মুসার। চোখের সামনে ভীড় করে উঠেছিল অতীতের হাজারো দৃশ্য এবং বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল হাজারো কথা।

ভারী হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার চোখ। হঠাৎ নিরব হয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। গ্রানাডায় পৌঁছে রবার্তো একবার বলেছিল আহমদ মুসা ভাই, গ্রানাডায় আমরা কি দাঁড়াব?

কোন উত্তর আসেনি আহমদ মুসার কাছ থেকে। রবার্টও পেছনে ফিরে আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেনি।

মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের শীর্ষদেশের নিচেই প্রশস্ত একটা চত্বর আছে এখানে দাঁড়িয়েই স্পেনের শেষ মুসলিম সুলতান আবু আবদুল্লাহ, তার পরিবার এবং তার সাথীরা গ্রানাডাকে শেষবারের মত দেখেছিল। এই জায়গাটা স্প্যানিশ খ্রিস্টানদের জন্যে গৌরবের জায়গা। প্রতিবছর ২রা জানুয়ারী যখন খ্রিস্টানরা গ্রানাডা বিজয়ের উৎসব করে, তখন এখানে তারা আবু আবদুল্লাহর দু’শ পুত্তলিকা দাঁড় করিয়ে তার চোখে একটা পানির নল লাগিয়ে দেয় যেখান থেকে অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে পানি। আর এই জায়গাটা মুসলিমদের জন্য কাঁদার জায়গা।

আহমদ মুসা মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ে উঠে এই চত্বরটিতে এসে দাঁড়াল।

মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়টি গ্রানাডার সোজা দক্ষিণে। তার চত্বরটি থেকে ভেগা প্রান্তরে দাঁড়ানো গ্রানাডা নগরীকে অত্যন্ত সুন্দর লাগে। দেখা যায়, গ্রানাডার

গা ছুয়ে সেনিল নদী সবুজ ভেগা প্রান্তরের বুক চিরে রুপালী ফিতার মত এগিয়ে গেছে।

চত্বরটিতে উঠে উত্তর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল গ্রানাডা। কিন্তু লাল পাথরের নিরাভরণ আলহামরা (যাকে সারাজিনী নাইডু বলেছেন তাজমহলের চেয়ে অধিকতর অনিন্দসুন্দর এবং ঐতিহাসিক স্যার আমীর আলী যার সম্পর্কে বলেছেন আলহামরার দৃশ্য বর্ণনা অত্যন্ত শক্তিশালী কলমের দ্বারাই শুধু সম্ভব) যেন বৈধব্যের পোষাক পরে মুখভার করে দাড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা চোখ সরাতে পারলো না গ্রানাডার উপর থেকে। ধীরে ধীরে আজকের গ্রানাডার দৃশ্য সরে গিয়ে তার চোখে ভেসে উঠছে আরেক গ্রানাডার দৃশ্য। যে দৃশ্যে আহমদ মুসা দেখল হৃদয় বিদারক এক নাটকঃ

১৪৯১ সালের ২রা জানুয়ারী। সূর্য উঠতে তখন ও অনেক দেরী। আত্মসমর্পিত গ্রানাডার মুসলিম অধিবাসীরা তখনও ঘুম থেকে জাগেনি। আত্মসমর্পণ এর শর্ত অনুসারে গ্রানাডা ত্যাগের জন্য সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার পরিজন ও সাথী সহ আল-হামরা প্রাসাদের পশ্চাতের এক দুয়ার দিয়ে বের হলেন এবং নগরীর সবচেয়ে জনহীন অংশ দিয়ে গ্রানাডা ত্যাগ করলেন। সুলতানের চোখে অশ্রু নেই, কিন্তু সুলতানের হেরেমের মহিলারা আত্ম-সংযম করতে পারলো না, তারা সকলেই রোদন করছিল। সুলতান চাইছিলেন, বিদ্রুপ- কঠোর তাদের এ দৃশ্য যেন না হাসে, আর শত্রু তাদের দেখে যেন জয়োল্লাস না করে, এই জন্যই এই গোপন বাবস্থা। সুলতানের এই ছোট কাফেলাটি গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে ভেগা প্রান্তরে সেনিল নদী অতিক্রম করে আল-পুজারিশ পাহাড় পাড়ি দিয়ে এক গ্রামে এসে দাঁড়ালেন।

.........ওদিকে বিজয়ী খ্রিস্টান সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড এবং রানী ইসাবেলার বাহিনী সেনিল নদীর তীরে শহীদ পাহাড়ের কাছে এক ক্ষুদ্র মসজিদের কাছে এসে উপস্থিত হল। সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার কয়েকজন সাথী সমেত খ্রিস্টান রাজ-দম্পতির সামনে এলেন। রাজ-দম্পতির সামনে বশ্যতা স্বীকার এর চিহ্ন ঘোড়া থেকে নামতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ফার্ডিন্যান্ড তাকে নিষেধ করলেন। অধীনতা

জ্ঞাপনের জন্য সুলতান তখন সম্রাট এর হাতে চুম্বন করতে অগ্রসর হলেন। ফার্ডিন্যান্ড তাও করতে দিলেন না। অবশেষে আবু আবদুল্লাহ নত ফার্ডিন্যান্ড এর ডান হাতকে সালাম করলেন। অতঃপর সুলতান আবু আবদুল্লাহ প্রাসাদের চাবি সম্রাট ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, 'এই চাবি স্পেনের মুসলিম শাসনের শেষ নিদর্শন। রাজন, আমাদের রাজ্য, আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের প্রাণ পর্যন্ত আপনার করায়ত্ব। আপনি অঙ্গিকার করেছেন, আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। আমরা আপনার সেই দয়া-ই প্রত্যাশা করি।' .....ঠিক এই সময় আল-হামরার দূর্গ শীর্ষ থেকে মুসলিম শাসনের অর্ধচন্দ্র পতাকা ভূ-লুণ্ঠিত হল, আর তার স্থানে সকালের সোনালি সূর্য কিরণে রৌপ্য নির্মিত প্রকাণ্ড ক্রস ঝলমল করে উঠল। ক্রসটি এখানে স্থাপন করলেন একজন বিশপ। পরে সেখানে উত্তোলিত হল রাজকীয় পতাকা, উত্তোলন করলেন ফৌজের প্রধান পতাকাবাহী।

আহমদ মুসার পলকহীন চোখ থেকে দু'টি অশ্রু ধারা নামছিল তার দু'গন্ড বেয়ে। একসময় গ্রানাডার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকাল জোয়ানের দিকে, রবার্তোর দিকে।

গ্রানাডার দিকে নিবন্ধ– দৃষ্টি আহমদ মুসার চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে দেখে জোয়ান এবং রবার্তো অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, জোয়ান, রবার্তো, শত শত বছর আগের গ্রানাডার ছবি দেখলাম।

'কি ছবি?' বলল জোয়ান।

'ছবিটা মুসলিম গ্রানাডার অন্তিম দৃশ্য।

দেখলাম সেই দৃশ্য, কিভাবে শেষ সুলতান আবু আবদুল্লাহ আল-হামরা থেকে, গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে এলেন, কিভাবে কি কথা বলে নগরীর চাবি তুলে দিলেন ফার্ডিন্যান্ডের হাতে, কিভাবে গ্রানাডার দূর্গশীর্ষ থেকে মুসলমানদের অর্ধচন্দ্র পতাকা ভূ-লুণ্ঠিত হল এবং তার জায়গায় উঠে এল ক্রস।'

'আপনার চোখের অশ্রু কি এই দৃশ্য দেখে?' বলল রবার্তো।

'ঠিক শুধু এই দৃশ্য দেখেই নয়, সুলতান আবু আবদুল্লাহকে ফার্ডিন্যান্ডের হাতে নগরীর চাবি তুলে দিয়ে তার সামনে মাথা নত করে নিরাপত্তা ও ক্ষমা–ভিক্ষা করতে আমি যখন দেখছিলাম, তখন গ্রানাডার আরেক সিংহ–দিল তরুনের কথা আমার মনে পড়েছিল। তিনি তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসা। সুলতান আবু আব্দুল্লাহর আত্ম-সমর্পণের বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, যখন দরবারে আমির-উমরাহ ও উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিক আত্মসমর্পণের পক্ষে মত দিচ্ছিল, তখন প্রতিবাদের জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে এই তরুন সেনাধ্যক্ষ বলল, 'শেষ পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা হোক। দরকার হয়, তাদের বর্ষার মুখে গিয়ে আমরা আত্মহত্যা করব। যেখানে শত্রু সবচেয়ে প্রবল, সৈনিকদের সেখানে নিয়ে যেতে আমি প্রস্তুত। যারা বেঁচে থেকে গ্রানাডা নগরীকে শত্রু হস্তে অর্পণ করবে, তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার চেয়ে যারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন-পাত করবে, তাদের মধ্যে গন্য হওয়াকে আমি গৌরবের মনে করি।' কিন্তু এই তরুণের প্রতিবাদ কোন কাজে আসেনি। সুলতান এবং দরবার আত্মসমর্পণেরই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর গোটা দরবার শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শুধু কান্না ছিল না ওই তরুণ সেনাধ্যক্ষের চোখে। সে কান্নার রোলের মধ্যে উঠে দাঁড়াল সেই তরুণ আবার। উচ্চ কন্ঠে বলল, 'জাতির প্রবীণ সর্দারবৃন্দ, অর্থহীন রোদন আর বিলাপ ছেলেদের ও অবলা নারীদের জন্যে রেখে দিন। আমরা পুরুষ। আমাদের অন্তর অশ্রু বর্ষণের জন্যে সৃষ্টি হয়নি, রক্ত বর্ষণের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। আসুন আমরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মত আত্মবিসর্জন করি। গ্রানাডার উপর যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রতিকারার্থে মৃত্যুকে বরণ করি। আমাদের মৃত দেহকে আচ্ছাদিত করার জন্যে যদি এক মুঠো মাটিও না জোটে, উদার অন্তহীন আকাশের কখনও অভাব হবে না।' তরুণ সেনাধ্যক্ষ কথা শেষ করে থামল। সমগ্র দরবার নিরব, নিস্পন্দ। সুলতান আবু আবদুল্লাহ আগ্রহ ভরে দরবারের মুখগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সাহস, শৌর্য ও আগ্রহের একটি কথাও বিশাল দরবারে একটি কন্ঠ থেকেও উচ্চারিত হল না। দূর্বল চিত্ত সুলতান আবু আবদুল্লাহ কাতর কন্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তকদীরের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লাভ

নেই। তকদীরের ফলকে অতিস্পষ্টভাবেই লেখা আছে, আমার জীবন হতভাগ্যের জীবনেই পর্যবসিত হবে। সাম্রাজ্য আমার শাসনকালেই বিলুপ্ত হবে।' অবশেষে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত যখন দরবারে চুড়ান্ত হয়ে গেল, আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষরের জন্যে সুলতানের কলম উত্তোলিত হলো, তখন তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসা ক্রোধ-কম্পিত কন্ঠে শেষবারের মত চিৎকার করে উঠল, 'আপনারা নিজেদের প্রতারিত করবেন না। মনে ভাববেন না যে, খৃষ্টানেরা তাদের অঙ্গীকার পালন করবে। যে লাঞ্ছনা এবং বিপদ আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, তার তুলনায় মৃত্যু তুচ্ছ ব্যাপার। আমাদেরই চোখের সামনে আমাদের এই প্রিয় নগরী লুন্ঠিত হবে, আমাদের মসজিদ, এবাদতগৃহ নিগৃহীত, অপমানিত হবে, আমাদের গৃহ-সংসার বিধ্বস্ত হবে, আমাদের স্ত্রী-কন্যারা উৎপীড়িত-ধর্ষিতা হবে। নিষ্ঠুর অত্যাচার, হৃদয়হীন অসহিষ্ণুতা, চাবুক এবং শৃঙ্খল, অন্ধকার কারাগৃহ, মৃত্যুর অগ্নিকুন্ড, ফাঁসির কাষ্ট, এ সবই আমাদের ভাগ্যে জুটবে, মৃত্যুর অগ্নিকুন্ড, ফাঁসির কাষ্ট, এ সবই আমাদের ভাগ্যে জুটবে, এ সবই আমাদের দেখতে হবে, এ সবই আমাদের সহ্য করতে হবে। অন্ততঃ এই সব হতভাগ্য কাপুরুষেরা এসব দেখবে- এখন যারা সম্মানজনক মৃত্যুকে বরণ করতে কুন্ঠিত। আমি নিজের কথা বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ, আমার চোখ দিয়ে এসব কখনও দেখবে না।' তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসা কথা শেষ করে বেরিয় এল দরবার থেকে। সে নেমে এল রাজপথে। কারও সাথে কথা বলল না, কারও দিকে তাকালোও না সে। ঘরে গিয়ে অস্ত্রে-শস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করল, আরোহন করল নিজের প্রিয় অশ্বে। তারপর গ্রানাডা নগরীর 'এলভিরা' নামক সিংহদ্বার অতিক্রম করে দৃঢ় পদক্ষেপে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলল।'

থামল আহমদ মুসা। শেষ দিকে তার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল কান্নায়।

জোয়ান ও রবার্তো রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল অভূতপূর্ব কথাগুলো। তাদের চোখ, বিস্ফারিত, উজ্জ্বল।

'তারপর।' আহমদ মুসা থামার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল জোয়ান।

'তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ঘোড় সওয়ার মুসা ফার্ডিন্যান্ডের একটি সেনাদলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমৃত্যু লড়েছিল সে। আঘাতে আঘাতে

জর্জরিত হয়েছিল তার দেহ। ভারি বর্ম আচ্ছাদিত মুমূর্ষ দেহ তার ডুবে গিয়েছিল সেনিলের পানিতে।’

আহমদ মুসা থামল। থেমেই আবার শুরু করল, গ্রানাডার দিকে তাকিয়ে সুলতান আবু আবদুল্লাহর আত্ম-সমর্পণ দৃশ্যের পাশাপাশি এই তরুণ সেনাধ্যক্ষের আত্ম-বিসর্জনের দৃশ্যই আমাকে বেশী অভিভূত করে।

আহমদ মুসা মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের যে চত্তরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সে চত্তরের এক পাশে পাহাড়ের শীর্ষ চূড়া, অন্য পাশে ছোট বড় চূড়ার দীর্ঘ সারি এগিয়ে গেছে পূর্ব দিকে। চত্তরের পাশেই দু’টি ছোট চূড়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। চূড়া দু’টির মাঝখানে দিয়ে সংকীর্ণ একটা পথ। সে পথটির মাথায় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু’জন যুবক। ওরা চত্তরেই দাঁড়িয়েছিল, তিনজন অপরিচিত যুবক অর্থাৎ আহমদ মুসাদের চূড়ায় উঠতে দেখে তারা পাথরের আড়ালে সরে গেছে।

দু’জন যুবকের কারও বয়সই বাইশের বেশী নয়। চেহারা ও দেহের গড়ন আরবীয় কিন্তু দেহের রং ইউরোপীয়দের মত সাদা, চুল ও চোখ এশীয়দের মত কাল। যুবকদের একজনের চেহারা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত, শরীরটাও অত্যন্ত সুগঠিত। নিষ্পাপ হাসিমাখা মুখ, কিন্তু দৃষ্টির তীক্ষ্নতা বাজপাখীর মত। এই তরুণের নাম যিয়াদ বিন তারিক। কার্ডোভার বৃদ্ধ একেই স্পেনের নতুন ফ্যাল্কন নামে অভিহিত করেছে। তার সাথের যুবক আবদুল্লাহ তার সর্বক্ষণের সাথী।

যিয়াদ বিন তারিক গ্রানাডার এক পার্বত্য গ্রামের সর্দারের ছেলে। গ্রানাডার দক্ষিণ-পূর্বে সিয়েরা নিবেদা পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণ ঢালে পশ্চিমে গোয়াদেল ফো এবং পূর্বে গোয়াদেলজ নদীর মাঝখানে বিশাল এক বনাঞ্চল। এই বিশাল এবং গভীর বনাঞ্চলেরই একটা গ্রামে বাস করে যিয়াদ বিন তারিকের পরিবার। দুর্গম বনাঞ্চলে এই জনবসতি গড়ে উঠার একটা ইতিহাস আছে। গ্রানাডার পতনের পর মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। জোর করে তাদের খৃষ্টান করা হয়, অথবা দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। বেশীর ভাগ বাঁচার জন্যে খৃষ্টান হওয়ার মহড়া দিল, অনেকে স্পেন থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু অনেকে খৃষ্টানও হলো না এবং স্পেন থেকে পালিয়েও গেল না। গ্রানাডা অঞ্চলের

এরাই এসে আশ্রয় নিয়েছিল সিয়েরা নিবেদা দক্ষিণ ঢালের এই দুর্গম বনাঞ্চলে। যিয়াদ বিন তারিকের পরিবার তাদের উত্তরসুরীদেরই একটা অংশ। যিয়াদ বিন তারিক খৃষ্টান ছদ্মনাম নিয়ে গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছে। সবে সে বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া কালেই যিয়াদ বিন তারিক 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট' নামে তরুণদের একটা গ্রুপ গঠন করে। প্রথম দিকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছদ্মবেশী মুসলিম তরুণরাই এর সদস্য ছিল। এর সদস্যপদ এখন ছাত্র-তরুণদের বাইরেও বিস্তৃত করা হয়েছে। 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট' এর সদস্যদের নিবেদা পার্বত্যঞ্চলে নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়।

পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে যিয়াদ বিন তারিক এবং আবদুল্লাহ চত্তরে উঠে আসা নতুন আগন্তুক আহমদ মুসাদের উপর চোখ রেখেছিল। যিয়াদরা প্রথমে মনে করেছিল, আগন্তুকরা কোন খৃষ্টান ভ্রমনকারী হবে, তারা মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড় এবং 'দীর্ঘশ্বাস' এর ঐতিহাসিক চত্তরটা দেখে আনন্দ করতে এসছে। কিন্তু আহমদ মুসার এশীয় চেহারা এবং মুখভাব দেখে তাদের চিন্তা প্রথম হোঁচট খায়। তারা দেখে আগন্তুকদের মুখে হাসি নেই, বরং গম্ভীর বেদনার্ত তাদের মুখ। তাদের মুখে কথাও নেই। কিন্তু তাদের হোঁচট খাওয়া চিন্তা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয় যখন গ্রানাডার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা আহমদ মুসার চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে তারা দেখে। তারপর যখন জোয়ানের সাথে আহমদ মুসার কথা শুরু হলো, যখন আহমদ মুসার কন্ঠ থেকে ফার্ডিন্যান্ডের কাছে আবু আবদুল্লাহর আত্মসমর্পণের বিষাদ -ছবি বেরিয়ে এল, যখন আহমদ মুসা তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসার বিরত্ব ও আত্মবিসর্জনের অভূতপূর্ব মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করল, তখন অভিভূত যিয়াদ বিন তারিক এবং আবদুল্লাহ আর অশ্রু রোধ করতে পারেনি। তাদের চোখ থেকে নেমে আসে অশ্রু অঝোর ধারায়। পবিত্র, জ্যোতির্ময় মুখের আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে যিয়াদ বিন তারিক কাঁদতে কাঁদতেই আব্দুল্লাহকে বলে, আবদুল্লাহ স্পেনের মুসলমানদের জন্যে এত দরদ তো কারও কন্ঠে শুনিনি, এত অশ্রু তো কারও চোখে দেখেনি, হতভাগ্য সেনাধ্যক্ষের এই কাহিনী তো কেউ কোনদিন এমনভাবে বলেনি। কে এই বিস্ময়কর বিদেশী যুবক আবদুল্লাহ। উঠ, চল যাই। এরপর লুকিয়ে থাকা পাপ হবে।'

বলে যিয়াদ বিন তারিক উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল আব্দুল্লাহ। তারা গিরীপথের দূরত্বটুকু অতিক্রম করে চত্তরের উপর দিয়ে এগোয়। তাদের দু'জনেরই চোখে অশ্রু, অশ্রুতে গন্ড ভেজা।

আহমদ মুসা ওদের দেখতে পেল। দেখতে পেল তাদের চোখের অশ্রুও। বিস্মিত আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই যিয়াদ বিন তারিক সোজা এসে আহমদ মুসাকে বলল, 'কে আপনি বিদেশী ভাই?'

আহমদ মুসা তাকে নরম কন্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি কে ভাই।'

'আমি যিয়াদ বিন তারিক।' বলল আগন্তুক যুবকটি।

'তুমি যিয়াদ বিন তারিক।' বলে আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল যিয়াদকে। বলল, 'আমি তোমার খোঁজেই এখানে এসেছি।'

'আপনি কে তা কিন্তু বলেননি? আপনার পরিচয়ের জন্যেই আমরা আড়াল থেকে ছুটে এসেছি।' বলল যিয়াদ।

এগিয়ে এল রবার্তো। আহমদ মুসা ও যিয়াদ বিন তারিকের সামনে এসে যিয়াদকে বলল, 'যার পরিচয় লাভের জন্যে ছুটে এসেছেন, তিনি আহমদ মুসা।

'আহমদ মুসা!' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল যিয়াদ।

'হ্যাঁ, সেই বহু বিপ্লবের নেতা আহমদ মুসা।'

মুখ দিয়ে কোন কথা সরলো না যিয়াদ বিন বিন তারিকের। সে এবং আবদুল্লাহ বিস্ময়-বিস্ফারিত অপলক চোখে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। তারা মুর্তির মত স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তরে তাদের ঝড় বইছে। যাকে নিয়ে তাদের আকাশ স্পর্শী গর্ব, যাকে ঘিরে তাদের হাজারো স্বপ্ন, যিনি কিংবদন্তীর মত মুখে মুখে উচ্চারিত, সেই আহমদ মুসা তাদের সামনে!

আহমদ মুসা যিয়াদ বিন তারিকের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বিস্মিত হচ্ছ? কেন আমি আসতে পারি না? এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষ যায় না?'

যিয়াদ আহমদ মুসাকে গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, 'চোখকে যে বিশ্বাস হচ্ছে না! আল্লাহ আপনাকে স্পেনে আনবেন, এইভাবে আপনাকে পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে, এ যে আকাশ-কুসুম কল্পনা আমাদের জন্যে। বিশ্বের

মুসলমানরা যে আমাদের কথা ভুলেই গেছে, আমাদের তারা বাদ দিয়ে রেখেছে তাদের তালিকা থেকে।'

আহমদ মুসা যিয়াদের পিঠ চাপড়ে বলল, 'না বিশ্বের মুসলমানরা তোমাদের ভোলেনি। মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ কমপ্লেক্স- এর কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

এই দান এসেছে শত শত বছর পরে। বলল যিয়াদ।

তোমার কথা ঠিক যিয়াদ কিন্তু তোমাকে একটা বিষয় স্বীকার করতে হবে। ইসলামী বিশ্বের দূর্ভাগ্য শুরু হবার পর স্পেনের দূর্ভাগ্যের সূত্রপাত। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তখন খন্ড-বিখন্ড এবং পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত। সুতরাং সাহায্য যেখান থেকে সবচেয়ে সহজে আসতে পারতো, সেখান থেকে আসতে পারেনি। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে তখন তুর্কি সাম্রাজ্য শক্তিশালী, কিন্তু সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনে পৌছা তার সামর্থ্যের বাইরে ছিল।

জানি জনাব, আমি স্পেনের দূর্ভাগা মুসলমানদের একটা আবেগের কথা বলেছি। তাদের কেউ সাহায্য করতে না পারুক, তাদের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে যা ঘটে আসছে, তার কোন প্রতিবাদও মুসলিম বিশ্বের কোথাও থেকে উত্থিত হয়নি। কারও চোখ থেকে অশ্রুও ঝরেনি। বলল, যিয়াদ।

এই আবেগকে আমি শ্রদ্ধা করি যিয়াদ এবং মুসলিম শক্তিগুলোর ব্যর্থতাকেও আমি স্বীকার করি। তুর্কি সাম্রাজ্যে খৃষ্টান প্রাজারা মুসলমান প্রজাদের চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করছে, কিন্তু তারপরও তুর্কি সাম্রাজ্যের খৃষ্টান প্রজাদের কাল্পনিক দুঃখ-দুর্দশার শ্লোগান তুলে ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তিগুলো চিৎকার করেছে, কিন্তু মুসলিম শক্তিগুলো মুসলমানদের উপর জলজ্যান্ত খৃস্টান নির্যাতনের বিরুদ্ধে টু-শব্দটিও করেনি। এর জন্যে আফসোস করে কোন লাভ নেই। সে সময় প্রকৃত অর্থে অনেক জায়গায় মুসলমানরা ক্ষমতায় থাকলেও ইসলাম ক্ষমতায় ছিল না। আহমদ মুসা থামল।

ধন্যবাদ জনাব। অতীতের জন্য কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই এখন আর। আজ আপনাকে পেয়ে সব যেন শেষ হয়ে গেছে, সব ক্ষতির পূরণ হয়েছে।

একটু থামল যিয়াদ। রুমাল দিয়ে চোখটা ভালো করে মুছে নিয়ে বলল, এখনও আমার কাছে স্বপ্নই মনে হচ্ছে যে, আমি আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে। ভয় হচ্ছে স্বপ্ন না ভেঙ্গে যায়। কিভাবে আপনি হঠাৎ এখানে হাজির হলেন? যিয়াদের কথাগুলো শেষের দিকে আবেগে ভারি হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ নয় অনেক ঘটনা পাড়ি দিয়ে আমি তোমার এখানে পৌঁছেছি। ইতোমধ্যে দু'বার আমি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর হাতে পড়েছি, অনেক ঘটনা ঘটেছে।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর হাতে দু'বার বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল যিয়াদ।

তোমাদের মাদ্রিদ বিমান বন্দরে পা দিয়েই প্রথমবার।

তারপর?

বলব সব কাহিনী।

আমরা খুব খুশী হবো। আচ্ছা বলুন, আমার নাম জানলেন কি করে, আর আমাদের খোঁজে এই স্থানেই বা এলেন কি করে?

আহমদ মুসা কর্ডোভার গোয়াদেল কুইভার ব্রীজের সেই বৃদ্ধের সব কাহিনী শোনাল।

সব শুনে যিয়াদ বলল, হ্যাঁ, বৃদ্ধ আমার সব কথা জানে। ছাত্র জীবন থেকেই এই বৃদ্ধকে আমি দেখছি, তখন থেকেই তার সাথে আমার পরিচয়। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ আজ হতাশ বটে, কিন্তু তার ভেতরে আগুন আছে, সে আগুন আমার পথকেও অনেক খানি আলোকিত করেছে।

বৃদ্ধ আমার কাছে মুসলিম স্পেনের প্রতিকৃতি।

একটু ভেবে যিয়াদ বলল, ঠিক বলেছেন। স্পেনের মুসলমানরা সর্বস্ব হারিয়েছে, সেও। স্পেনের মুসলমানরা যেমন হতাশ, বৃদ্ধও তেমনি। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যেমন স্পেনের মুসলমানদের প্রতিদিনের সাথী, তেমনি তারও।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, নামাজ সেরে নিয়ে আমরা ফিরতে পারি। বলল, যিয়াদের সাথী আব্দুল্লাহ।

যিয়াদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বলেছ। নামাজের সময়ও হয়ে গেছে।

নামাজের জন্য সবাই প্রস্তুত হলো।

আহমদ মুসা ইমামের জায়গায় যিয়াদকে ঠেলে দিল। যিয়াদ দ্রুত পেছনে সরে এসে বলল, অসম্ভব, আমি ঐ জায়গায় দাঁড়াতে পারিনা। আপনি আমাদের ইমাম সব ক্ষেত্রের জন্যেই।

নামাজ শেষে আহমদ মুসা ফিরে বসল। যিয়াদ বলল, এখান থেকে দুই মাইল পূর্বে পাহাড়ের এক গুহায় আমাদের একটা আস্তানা। ওটা আমাদের একটা বিশ্রাম কেন্দ্র। কিন্তু আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে চাই সিয়েরা নিবেদার বনাঞ্চলে আমাদের আসল ঘাঁটিতে। এই ঐতিহাসিক বনাঞ্চলই ছিল ফ্যালকন অব স্পেন বশীর বিন মুগীরার কর্মক্ষেত্র।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, খুব আনন্দের হবে এই সফর, তোমাদের ব্যবস্থাদিও দেখতে পাব। কিন্তু যিয়াদ, খুব বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমি যে বড় কাজটি নিয়ে এখানে এসেছি তাতে এখনও হাত দেয়াই হয়নি।

কি সেটা? সাগ্রহে প্রশ্ন করল যিয়াদ।

বলব তোমাকে? ভয়াবহ ষড়যন্ত্র এঁটেছে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান।

চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল যিয়াদের এবং সকলের। যে ষড়যন্ত্রকে স্বয়ং আহমদ মুসা ভয়াবহ বলে এবং যার জন্যে সে নিজে স্পেনে এসেছে সেটা নিশ্চয় খুব বড় ব্যাপার তা সকলেই হৃদয় নিয়ে অনুভব করল। সকলেই গম্ভীর হয়ে গেল।

‘বন্দর নগরী মিত্রালীতেও আমাদের একটা ঘাঁটি আছে। ওখানেই আমরা আপাততঃ যেতে পারতাম, তারপর কোন সুযোগে না হয় নিবেদায় যেতাম। কিন্তু আমাদের এক কর্মীর সামান্য এক ভুলের কারণে ঘাঁটিটি সরকারের চোখে পড়ে গেছে। আজ সকালে খবর পেয়েছি ব্যাপারটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানও জেনে ফেলেছে। গত সন্ধ্যা থেকেই মাথা মুন্ডিত কে একজন বাড়িটার উপর চোখ রেখেছে। আমার আম্মা অসুস্থ। আমার আম্মা ও স্ত্রী ওখানেই আছেন। আমি সকালেই জানিয়ে দিয়েছি তাদেরকে সকালের মধ্যেই নিবেদায় নিয়ে যেতে। সুতরাং সেখানে আমাদের যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বলল, যিয়াদ।

আমি তোমাদের নিবেদায় যাব, তুমি নিষেধ করলেও আমাকে যেতেই হবে বদর বিন মুগীরা আর যিয়াদ বিন তারিকের স্বাধীন সাম্রাজ্যে। কিন্তু যিয়াদ আমি ভাবছি ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের নজরে যদি পড়েই থাকে তোমাদের ঘাঁটি, তাহলে কি তোমার পরিবার নিরাপদে সরতে পারবে?

দিনের বেলা, লোকজনও আমাদের আছে। অসুবিধা হবে না জনাব। বলল যিয়াদ।

আহমদ মুসার মন থেকে অস্বস্থি গেল না। উঠে দাঁড়াল সে। বলল, আমরা তাহলে এখন যাত্রা শুরু করতে পারি।

উঠে দাঁড়াল সকলে।

আহমদ মুসা যাবার আগে আরেকবার গ্রানাডার দিকে তাকাল। তার পাশে যিয়াদ।

আহমদ মুসা আনমনা হয়ে গিয়েছিল গ্রানাডার দিকে তাকিয়ে।

যিয়াদও তাকিয়েছিল গ্রানাডার দিকে। গ্রানাডা যিয়াদের আবাল্য পরিচিত। কিন্তু আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়ে গ্রানাডাকে তার আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম লাগছে। মনে হচ্ছে এ তার পরিচিত গ্রানাডা নয়, ইসলামের, মুসলমানদের, তাহলে কি তিনি এই সাম্রাজ্যের চাবী ঐভাবে ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দিতে পারতেন? পারতেন না। পেরেছেন কারণ, সাম্রাজ্যটা তার ব্যক্তিগত ছিল, ইসলামের নয়, মুসলমানদের নয়। অন্যদিকে ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা এই সাম্রাজ্য দখল করেছিল তাদের ধর্মের নামে, সৈন্যেরা যুদ্ধও করেছিল তাদের ধর্মের জন্য। গ্রানাডার দূর্গশীর্ষে প্রথম উঠেছিল ক্রস। এই ক্রস উত্তোলিত করেছিলেন তাদের দেশের ধর্মগুরু। ক্রসের পর উত্তোলিত হয়েছিল রাজার পতাকা। যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে গ্রানাডার নিকটে ভেগা প্রান্তরে রানী ইসাবেলার নির্দেশে একটি সুন্দর নগরী নির্মিত হয়। সকলে বলেছিল এ নগরীর নাম ইসাবেলা রাখা হোক। কিন্তু রানী তা করেননি। ঐতিহাসিক আন্টিনিও আগানিতা বলেছেন, ধর্মপ্রাণ দেশবাসী যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই নগরীর সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে নগরীর নাম সান্টা ফে অর্থাৎ পবিত্র ধর্মের নগরী রাখলেন। এই ধরনের গভীর ধর্মনিষ্ট মানসিকতা সুলতান আবু

আব্দুল্লাহর ছিল না, তার বাহিনীর ছিল না এবং তখনকার গ্রানাডাবাসীরও ছিল না। অর্থাৎ তুমি বলতে পার যিয়াদ, ৭১১ খৃস্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদ এবং মুসা বিন নুসায়ের ইসলামের যে পতাকা নিয়ে স্পেন জয় করেছিলেন, সেই পতাকা পরে ভূ-লন্ঠিত হয় এবং তার জায়গায় ওঠে ব্যক্তির পতাকা, গোষ্ঠীর পতাকা। তুমি হয়তো জান যিয়াদ, স্পেনে তৃতীয় আব্দুর রহমানের মত হুসিয়ারী লোকও তাঁর পাশে মহিষী জোহরার নাম অক্ষয় করে রাখার জন্য কর্ডোভার পাশে আজ-জোহরা নামক এক উপনগরী নির্মাণে এমনই মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, পরপর তিন শুক্রবার তিনি জুম্মার জামায়াতে হাজির হতে পারেননি, যার জন্য প্রচন্ড ধমক খেতে হয়েছিল তাকে ইমামের কাছে।'

শত শত বছর আগের আবু আব্দুল্লাহর গ্রানাডা যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যিয়াদের মুখ ফেটেই যেন একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল, 'গ্রানাডার কেন পতন হয়েছিল, আপনার উল্লেখিত সেই সেনাধ্যক্ষ মুসার আবেদন কেন কন কাজে আসেনি, কেন পরাজিত হয়েছিলো মুসলমানরা মুসা ভাই?'

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। পরে একটু ম্লান হাসল। তারপর ধীর কন্ঠে শুরু করল, 'এই চত্ত্বরে দাঁড়িয়ে গ্রানাডার দিকে তাকিয়ে সুলতান আবু আবদুল্লাহ যখন শিশুর মত কাঁদছিল, তখন সুলতানের মা বীর নারী আয়েশাতুল হুররা কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, 'যে রাজ্য পুরুষের মত তুমি রক্ষা করতে পারনি, তার জন্যে নারীর মত অশ্রু বিসর্জন তোমারই শোভা পায়।' অন্য দিকে আল হামরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে আবু আবদুল্লাহ খৃষ্টান সেনাপতিকে যখন প্রাসাদে ঢুকার পথ করে দিয়েছিলেন, দূর্গশীর্ষে পতাকা উত্তোলনের জন্যে, তখন তিনি অর্থাৎ আবু আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'সেনাপতি যান, দূর্গ আপনি হস্তগত করুন। এ বৈভব আল্লাহ আপনার শক্তিশালী প্রভূকে অর্পণ করেছেন মুরদের পাপের শাস্তির জন্যে।' এই দুই উক্তির মধ্যে তিনটি কারণ আমরা দেখি, এক, রাজ্য রক্ষাই তখন শাসকদের কাছে ছিল মুখ্য, মুসলিম কিংবা মুসলমানদের ধর্ম রক্ষা নয়। দুই, রাজ্য রক্ষার মত পৌরুষ শাসকদের ছিল না। তিন, পরাজয় ছিল শাসকদের পাপের শাস্তি। প্রথম কারণটিই মূল কারণ। মূল

কারণ থেকে শেষের দু'টি কারণ সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের রক্ষা ইসলাম রক্ষা যদি শাসকদের লক্ষ্য হতো, তাহলে তাদের মধ্যে বিভেদ ষড়যন্ত্রের জায়গায় ঐক্য এবং দুর্বলতার বদলে পৌরুষ সৃষ্টি হতো, ভোগ সর্বস্বতা ও পাপাচার দূরে সরে যেত এবং তাদের পরাজয় ঘটত না। ভেবে দেখ যিয়াদ, সুলতান আবু আবদুল্লাহ যদি মনে করতেন এই গ্রানাডা, এই কর্ডোভা, এই সাম্রাজ্য তার নয়।'

থামল আহমদ মুসা।

তারপর আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো চলতে পারি।

'আহমদ মুসা ভাই, সুলতান আবু আবদুল্লাহ তাহলে ঠিকই বলেছিল, খৃষ্টান ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার কাছে মুসলিম স্পেনের আত্মসমর্পণ মুরদের পাপেরই কথা।' বলল যিয়াদ।

বলতে বলতে সামনে পা বাড়াল যিয়াদ বিন তারিক। আহমদ মুসাও হাঁটতে শুরু করেছিল। বলল, 'অবশ্যই। তবে এই পাপ স্পেনের জনতার ছিল না, মুসা, বদর বিন মুগীরা, প্রমুখ ছিলেন এঁদেরই প্রতিনিধি। কিন্তু দায়ী তারা না হলেও পাপের মাশুল তাদেরকেই দিতে হয়েছে ষোল আনা।'

'কেন মুসা ভাই, এমনটি হলো কেন, শাসকদের পাপের জন্যে নিরপরাধ মুসলমানরা মার খেল কেন?' বলল জোয়ান।

'এটাই নিয়ম জোয়ান। পাইলটের দোষে প্লেন ক্রাশ হলে নিরপরাধ যাত্রীরাও বাঁচে না। স্পেনের মুসলিম প্রজাদের দায়িত্ব শুধু খাজনা দেয়া ছিল না, রাজাকে সংশোধন করা, ঠিক পথে চালনা করা, রাজার সমালোচনা করা, ইত্যাদি তাদেরই দায়িত্ব ছিল। তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি।'

'দুনিয়ার অনেক দেশের মুসলমানরা এমন দোষে দোষী, কিন্তু স্পেনের মুসলমানদের ভুলের মাশুল হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ।' ভারী কন্ঠে বলল রবার্তো।

'ঠিক বলেছ ভাই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আহমদ মুসা।

চত্ত্বর থেকে তারা নেমে এল পাহাড়ের গায়ে। তারা পাঁচজন পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগল ধীরে ধীরে।

পাঁচজনের এ মিছিলের সারিতে প্রথমে আহমদ মুসা, তারপর যিয়াদ বিন তারিক। পরে ওরা তিনজন- আবদুল্লাহ, জোয়ান ও রবার্তো।

আহমদ মুসার গাড়ী ছুটছে গ্রানাডা হাইওয়ে ধরে দক্ষিণে মিত্রালীর দিকে। ড্রাইভিং সিটে যিয়াদ বিন তারিক।

কিন্তু গন্তব্যস্থল তাদের মিত্রালী নয়।

গ্রানাডা হাইওয়ে যেখানে গোয়াদেলফো নদী অতিক্রম করে মিত্রালীর দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে গোয়াদেলা নামে ছোট শহর গড়ে উঠেছে। এখান থেকে যিয়াদ বিন তারিকদেরকে নদী পথে যেতে হবে তাদের প্রধান ঘাঁটিতে নিবেদার জংগলে যেতে হলে। এই শহরকে লক্ষ্য করেই ছুটছে মুসার গাড়ি।

ড্রাইভিং সিটে যিয়াদ বিন তারিক। আহমদ মুসা তার পাশের সিটে। আর ওরা তিনজন বসেছে পেছনের সিটে।

দু'পাশে পাহাড়, উঁচু-নিচু টিলা। এর মধ্যে দিয়েই এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেছে গ্রানাডা হাইওয়ে।

মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলছিল যিয়াদের গাড়ি।

কথা বলে উঠল যিয়াদ। বলল, 'মোটামুটি আপনার সব খবরই পত্রিকায় আসে। আপনি আর্মেনিয়ায় এসেছেন, আর্মেনিয়া থেকে বলকানে গেছেন তাও আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আপনার স্পেনে আসার খবর এখনও প্রকাশ হয়নি।'

'সরকার ও সাংবাদিকরা এখনও জানার কথা নয়। প্রথমবার যখন ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের হাতে পড়ি, ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বন্দী হবার পর ভাসকুয়েজ আমাকে চিনতে পারে। মনে হয় তারা সাংবাদিকদের জানায়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনাকে চেনার পর ওরা তো সাংঘাতিক ক্ষেপে যাবার কথা।' বলল যিয়াদ।

'আমি যে রাতে বেরিয়ে আসি, তারপর দিন সকালেই আমাকে হত্যা করা কিংবা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল।'

‘বিক্রি করা, কোথায়?’

‘ওরা এক মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আমাকে আমেরিকান ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের কাছে বিক্রি করেছিল। সেদিন সকালেই আমাকে আমেরিকার পথে আকাশে উড়তে হতো।’

‘আল্লাহর হাজার শোকরিয়ে যে তা হয়নি। আপনাকে কোথায় রেখেছিল? কিভাবে বেরুলেন? এটা প্রচলিত আছে যে, ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের হাতে পড়া মানে শেষ হয়ে যাওয়া।’

‘সে অনেক কাহিনী, পরে বলব।’

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া সরকার অনেক দূরে, ফিলিস্তিন সরকারের সাথে কোন সময় তোমরা যোগাযোগ করনি? তারা তো আনন্দের সাথেই তোমাদের সাহায্য করতো।’

‘দূতাবাসের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি। তারা আমাদের একটা ডেলিগেশনকে আমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু কিভাবে যাওয়া হবে এটা ঠিক হয়নি এখনও। তবে সৌদি দূতাবাস এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়েছে।’

‘মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যাপারে সৌদি আরব তো সাহায্য করে থাকে।’

‘আমরা যোগাযোগটা খুব সম্প্রতি করেছি। মানবিক সাহায্য আমরা পেয়েছি। মসজিদ ও মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার, নির্মাণ, ব্যবহার এখনও এখানে নিষিদ্ধ। সৌদি সরকার চেষ্টা করছে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়ে নেবার জন্যে। সেটা সম্ভব হলে একটা বড় কাজ হবে।’

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসা থেমে গেল, উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

সামনে দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। ঐ গাড়ি থেকেই হর্ন শোনা গেছে।

আহমদ মুসাকে উৎকর্ণ হতে দেখে যিয়াদও সতর্ক হয়ে উঠেছিল।

‘সামনের গাড়িটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের যিয়াদ।’ বলল আহমদ মুসা।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার তখন চারদিকে। সূর্য বেশ আগে ডুবেছে। কিন্তু উন্মুক্ত প্রান্তর বলেই

অন্ধকারটা গাঢ় হয়নি।

বলতে বলতেই গাড়িটা সামনে এসে গেল। গাড়িটা মাইক্রোবাস।

আহমদ মুসা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল। লক্ষ্য নাম্বারটা দেখে নেয়া।

ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের গাড়িটা চলে গেল।

'আপনি কি করে জানলেন ওটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের গাড়ি?' বলল যিয়াদ।

'ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যান কয়েকটা নির্দিষ্ট কোডে হর্ন বাজায়।'

সামনে আরেকটা হেড লাইট তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে। যিয়াদ সেদিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন

কন্ঠে বলল, 'মুসা ভাই, ওটা 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট'-এর গাড়ি। কিন্তু এ সময় এ দিকে কেন?'

ভ্রু কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। তার মনের সুপ্ত সন্দেহটা এবার শতকণ্ঠে কথা বলে উঠল। আহমদ মুসা দ্রুত কন্ঠে বলল, গাড়ি ঘুরিয়ে নাও যিয়াদ।

যিয়াদ একবার অবাক ও উদ্বিগ্ন চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার নির্দেশ পালন করল। এ সময় সামনের গাড়িটাও এসে পড়ল। আগেই সংকেত দিয়েছিল যিয়াদ। গাড়িটা এসে দাঁড়াল যিয়াদের পাশে।

গাড়ি থেকে নামল যিয়াদের ছোট ভাই জায়েদ। কেঁদে উঠল। বলল, আম্মা ও ভাবীকে কিডন্যাপ করেছে।

যিয়াদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে বলল, 'যিয়াদ আমি সব বুঝেছি, তুমি এ সিটে এস, আমাকে ড্রাইভিং সিট দাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে যিয়াদ সরে এল, আহমদ মুসা গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। আহমদ মুসা জানালা দিয়ে জায়েদকে লক্ষ্য করে বলল, আমাদেরকে যদি হারিয়ে ফেল, তাহলে গ্রানাডার দক্ষিন গেটে দাঁড়াবে।

বলে আহমদ মুসা স্টার্ট দিল গাড়িতে। দেখতে দেখতে গাড়ির গতি ১৩৯ কি.মি. তে গিয়ে উঠল। ঝড়ের বেগে চলছে গাড়ি। গতির চাপে গাড়ি থর থর করে কাঁপছে।

যিয়াদের উদ্বিগ্ন চোখ আহমদ মুসার দিকে। আঁকা-বাঁকা রাস্তায়, তার উপর রাতের বেলায় এই গতি বেগ। কিন্তু যিয়াদ দেখল, আহমদ মুসা খেলনার

মত ঘুরিয়ে নিচ্ছে গাড়ি প্রতিটি বাঁকে। গাড়ি যেন নিজেই প্রান পেয়েছে, নিজেই পথ দেখে নিখুঁত ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল যিয়াদের মন, চোখটাও তার ভারি হয়ে উঠল। আজ এই মুহূর্তে এমন গতিবেগই তো দরকার। আহমদ মুসা সন্দেহ করেছে ঐ মাইক্রোবাসকে। ওটা তো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যিয়াদের চোখের সামনে ভেসে উঠল অসুস্থ মা আর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী'র ছবি। হৃদয় তার বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করল সে, 'আল্লাহই যথেষ্ঠ, তিনিই অভিভাবক এবং তিনিই সাহায্যদাতা।' তারপর সে চোখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। দেখল, তার মুখ প্রশান্ত, সেখানে কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই। মনে অনেক সান্ত্বনা পেল যিয়াদ। আজ তার ভীষণ বিপদের দিনে আল্লাহর বান্দাহদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটি তার পাশে রয়েছে।

গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পর আহমদ মুসা একটি কথাও বলেনি। মাঝখানে সে একবার ঘড়ি দেখেছে। আরেকবার ঘড়ির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, এই গ্রনাডা হাইওয়ে ছাড়া গ্রানাডায় পৌঁছার বিকল্প কোন পথ আছে যিয়াদ?

'জি না, নেই।'

'হিসেব অনুযায়ী আমরা গাড়ি স্টার্ট দেয়ার সময় মাইক্রোবাস থেকে ১৬ মিনিট পেছনে ছিলাম। ১২ মিনিট এসেছি। মাইক্রোবাস যদি রাস্তা না বদলায়, কিংবা স্পিড যদি না বাড়িয়ে থাকে, তাহলে আর চার মিনিট পড় মাইক্রোবাসের পেছনের আলো আমরা দেখতে পাব।'

যিয়াদ, আবদুল্লাহ, জোয়ান, রবার্তো সকলেই আহমদ মুসার হিসেব শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'আমরা কোথায় এসেছি যিয়াদ?'

'ফেজ আল্লাহু আকবর পাহাড় আমরা পার হয়ে এসেছি মুসা ভাই।'

'তাহলে গ্রানাডা আর পাঁচ মাইল?'

'জি।'

'তাহলে মনে হচ্ছে গ্রানাডার গেটের মাইল খানেকের মধ্যে ওদের সাক্ষাৎ আমরা পাব।'

‘যায়েদদের গাড়ি দেখতে পাও আবদুল্লাহ?’ পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল যিয়াদ।

‘না, পাঁচ মিনিট পর থেকে ওদের আর দেখা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে অনেক পেছনে পড়েছে।’ বলল আবদুল্লাহ।

গ্রানাডার দক্ষিন গেট তখন আহমদ মুসার গাড়ি থেকে সিকি মাইলেরও কম। এই সময় একটি গাড়ির পেছনের পেছনের দু’টি লাল আলো আহমদ মুসাদের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল। আহমদ মুসা আরও কিছুটা এগুনোর পর বলল, এটাই সেই মাইক্রোবাস। যখন গ্রানাডার গেটে মাইক্রোবাসটি, তখন তার নাম্বার স্পষ্ট হয়ে উঠল। আহমদ মুসা বলল, এবার নিশ্চিত কন্ঠে, ‘নাম্বারও মিলে গেছে যিয়াদ। আমরা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের গাড়িটা পেয়ে গেছি।’

মাইক্রোবাসটি নগরীর ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি তাকে অনুসরণ করল।

সন্ধ্যা তখন ৭টা।

দু’পাশে ব্যস্ত বিপনী। মাঝখানে প্রশস্ত রাস্তা। গ্রানাডার নতুন অংশ এটা।

গাড়ির স্পিড অনেক কমে গেছে। গজ দশেক দূর থেকে মাইক্রোবাসটিকে অনুসরণ করছে আহমদ মুসা। রাস্তায় ভীড় কম।

নগরীতে ঢোকার পর একই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছিল তারা। যিয়াদ জানাল, এ রাস্তার নামের অর্থ ডি-টেন্ডেলা সার্কুলার রোড। ফার্ডিন্যান্ডের সেনাপতি অধিকৃত গ্রানাডার প্রথম গভর্নরের নাম অনুসারেই এ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। এ রাস্তাটি নগরীর সবচেয়ে বড় রাস্তা, গোটা গ্রানাডাকে চক্রাকারে বেষ্টন করে আছে।

রাস্তা নগরীর একদম পশ্চিম প্রান্তে। মাইক্রোবাসটি ডি-টেন্ডেলা সার্কুলার রোড থেকে নেমে প্রাচীর ঘেরা দু’তলা একটা বাড়ির গেটে গিয়ে তাঁগাল। দাঁড়িয়ে হর্ন দেয়ার কয়েক মুহূর্ত পরে গেটটি খুলে গেল। মাইক্রোবাসটি ভেতরে ঢুকে গেল। রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসারা দেখল এটা।

মাইক্রোবাসটি যখন ভেতরে ঢুকে গেল এবং গেটটি আবার বন্ধ হয়ে গেল বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল যিয়াদের। এক অশুভ আশংকায় গোটা গা কাঁটা দিয়ে উঠল তার।

আহমদ মুসা বোধ হয় টের পেল ব্যাপারটা। যিয়াদের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'ভেব না যিয়াদ, আল্লাহ আছেন।'

যিয়াদ মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ভেতর থেকে একটা উচ্ছ্বাস উঠে মুহূর্তের জন্যে তার কন্ঠকে রুদ্ধ করে দিল। তার ঠোঁট কাঁপল।

আহমদ মুসা যিয়াদের চিন্তার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলল, 'শহরের এই এলাকা তুমি চেন যিয়াদ?'

'জি হ্যাঁ।' গলা পরিষ্কার করে বলল যিয়াদ।

'কমার্শিয়াল এলাকা মনে হচ্ছে, তাই কি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু লোকজন কম কেন?'

'মাগরিবের পর থেকেই এখানে মার্কেটে লোক কমতে থাকে, এটাই গ্রানাডার নিয়ম।'

আহমদ মুসা মাইক্রোবাসটি যে বাড়িতে ঢুকল, সেদিকে চেয়ে বলল, বাড়িটিতে কোন সাইনবোর্ড

নেই, একে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের অফিস মনে কর?'

'অফিস এবং বাসা দুই-ই হতে পারে।'

আহমদ মুসা পেছন দিকে ফিরে জোয়ানকে বলল, 'তোমর পিস্তলটা আমাকে ধার দাও জোয়ান।'

বলে আহমদ মুসা নিজের পিস্তলটা বের করল। পরীক্ষা করল ছয়টি গুলিই আছে।

জোয়ান তার পিস্তলটি বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। আহমদ মুসা সে পিস্তলটি পরীক্ষা করে

হাঁটুর নীচে প্লাস্টিক টেপ দিয়ে বেঁধে রাখল।

তারপর যিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার কাছে পিস্তল আছে নিশ্চয়?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘আমরা, মানে আমি আর তুমি, এখন এ বাড়িতে প্রবেশ করব। তুমি রেডি?’

‘জি হ্যাঁ।’ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যিয়াদের। যিয়াদের দুর্বলতা কেটে গেছে দেখে খুশী হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা পেছন দিকে আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি এসে ড্রাইভিং সিটে বস। আমরা না ফেরা পর্যন্ত এ ক্ষুদ্র দলটির নেতা তুমি।’

আহমদ মুসা ‘বিসমিল্লাহ’ বলে নামল গাড়ি থেকে। ওদিকে যিয়াদও নেমে পড়ল।

শুকনো মুখে ড্রাইভিং সিটে এসে বসল আবদুল্লাহ। জোয়ান ও রবার্তোর মুখ উদ্বেগ-উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

মেইন রোড এবং ঐ বাড়িটির মাঝখানের এই জায়গায় কোন আলো নেই। বাড়িটির গেটের আলোও শেডে ঢাকা। সুতরাং মধ্যবর্তী স্থানটি বেশ অন্ধকার।

বাড়িটিও অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। গেটের শেডে ঢাকা আলোটি ছাড়া প্রাচীরের আর কোথাও আলো নেই।

বাড়ির চারদিক ঘুরে দেখলো আহমদ মুসা ও যিয়াদ। ছোট্ট একটা টিলার উপর বাড়িটা। পাচীরের ভেতর গাছ-গাছড়া আছে। প্রাচীরটাও ৭ ফুটের বেশী উঁচু হবে না। আহমদ মুসা লাফ দিয়ে উঠে প্রাচীরের মাথাটাও পরীক্ষা করলো, না বিদ্যুতায়িত করার মত কোন তারের ব্যবস্থাও নেই। অনেকটা বিস্ময়ের সাথেই আহমদ মুসা বলল, ‘অফিসের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব তো চিন্তা করেনি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান?’

‘ওদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারে এটা ওরা মনে করে না মুসা ভাই, অন্ততঃ কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল সহ আন্দালুসিয়া অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওদের এটা বদ্ধমুল ধারণা।’

‘শত্রুর অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস থাকাটা ভাল।’

বাড়ির পেছন দিকে প্রাচীরের অন্ধকার মত এক জায়গায় এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বাড়ির পেছনে প্রাচীরের ভেতর এলাকায় মাত্র দু’টি আলো।

দাঁড়ানোর পর আহমদ মুসা যিয়াদকে বলল, ‘তুমি আমার কাঁধে উঠে ভেতরটা দেখ।’

বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল।

যিয়াদ দ্বিধা করতে লাগল আহমদ মুসার কাঁধে পা রেখে উঠতে।

‘আমার নির্দেশ যিয়াদ, দেরী করো না।’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে যিয়াদ নির্দেশ পালন করল।

ভেতরটা দেখে আহমদ মুসার কাঁধে বসে ফিসফিস করে বলল, ঠিক আমাদের সোজা প্রাচীরের নিচে দু’জন প্রহরী একটা পাথরে বসে গল্প করছে। স্টেনগান তাদের পাশে রাখা।

‘তুমি প্রাচীরের মাথা ধরে ঝুলে থাক। আমি প্রাচীরে উঠার পর তুমি উঠবে।’ বলল আহমদ মুসা।

যিয়াদ আহমদ মুসার কাঁধ থেকে প্রাচীরে ঝুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা একটু দৌড় দিয়ে এসে প্রাচীরের গায়ে লাফ দিয়ে উঠে প্রাচীরের মাথা ধরে তাতে উঠে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীর থেকে গজ দু’য়েক দূরে পাথরের উপর বসে গল্পরত দু’জন প্রহরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শেষে মুহুর্তে প্রহরী দু’জন টের পেয়েছিল কি ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের সাবধান হবার সুযোগ দিল না।

আহমদ মুসা পাখির মত দু’হাত মেলে ঝাপটে ধরার মত করে ওদের ঘাড়ের উপর পড়ল। বসা অবস্থায়ই দু’জন প্রহরী মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

পড়েই আহমদ মুসা পিস্তল বের করে নিয়েছে হাতে। প্রহরী দু’জন ভূমি শয্যা থেকে উঠার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা উঠে বসে ওদের দিকে পিস্তল তুলে বলল, যেমন আছ তেমন থাক, উঠার চেষ্টা করলে মাথা গুড়িয়ে দেব।

প্রহরী দু’জন মিট মিট করে আহমদ মুসার দিকে চাইল, উঠার আর চেষ্টা করল না।

যিয়াদও লাফিয়ে পড়ল আহমদ মুসার পাশেই। আহমদ মুসা যিয়াদকে বলল, ওদের জামা ছিঁড়ে ওদের মুখে পুরে দাও, পিছমোড়া করে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেল।'

বলে সে পকেট থেকে সরু প্লাস্টিক কর্ড বের করে দিল।

বাঁধা হয়ে গেলে আহমদ মুসা ও যিয়াদ দু'জনে ওদেরকে টেনে নিয়ে পাশেই গাছের নিচে অন্ধকারে রেখে দিল।

বাড়িটির পেছনের এ অংশটায় অনেকগুলো গাছ।

আহমদ মুসা ও যিয়াদ গাছের ছায়া ধরে গুটি গুটি বাড়ির দিকে এগুলো।

বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। শেষ গাছটার যে অন্ধকার তারা অতিক্রম করেছে, তা পার হলেই তারা বিল্ডিং এর গোড়ায় পৌঁছে যাবে। এ সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে বিদ্যুৎ বেগে ফিরল আহমদ মুসা। তার চোখে পড়ল তাদের উপর দু'টি দেহ ঝাঁপিয়ে পড়ছে গাছ থেকে ফল পড়ার মত করে আহমদ মুসা টুপ করে বসে পড়ল।

ঝাঁপিয়ে পড়া লোকটি আহমদ মুসার মাথার উপর দিয়ে মাটির উপর আছড়ে পড়ল। লোকটির দুই উরু এসে আঘাত করেছিল আহমদ মুসার মাথায়। আহমদ মুসাও পড়ে গিয়েছিল। লোকটির দুই পা আহমদ মুসা তার দুই কাঁধের উপর পেল।

আহমদ মুসা পা দু'টি শক্ত হাতে ধরে মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মোচড়ের ফলে লোকটি উপুড় হওয়া থেকে চিৎ হতে পারল। লোকটি তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া পিস্তল তুলে নেবার জন্যে মাটি হাতড়াচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে সে সুযোগ না দিয়ে দুই পা ধরে জোরে ঘুরাতে শুরু করল। কয়েকটা ঘুরান দিয়ে পাশের গাছের গুড়ির উপর আঁছড়ে ফেলে দিল। একটুও নড়লনা। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটি। তারপর আহমদ মুসা পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে মনোযোগ দিল যিয়াদের দিকে। দেখল, যিয়াদ ও অন্য লোকটি তখনও একে অপরকে কাবু করার চেষ্টা করছে। যিয়াদ শেষ পর্যন্ত লোকটি বুকে উঠে বসে তাঁর গলা টিপে ধরল , কিন্তু লোকটি পাশে পড়ে থাকা পিস্তলটি হাতে পেয়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে তার হাতের উপর পা চাপা দিয়ে পিস্তলটি কেড়ে নিল। তারপর বলল , যিয়াদ তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি স্প্রিং এর মত উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে একটা ছুরি বের করল।

আহমদ মুসা বিদ্যুৎ বেগে বাঁ হাত দিয়ে ছুরি সমেত তাঁর হাতটা ধরে ফেলে ডান হাতে বাঁট দিয়ে আঘাত করল তাঁর কানের পাশে নরম জায়গাটায়। লোকটি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

লোকটির হাত থেকে কেড়ে নেয়া পিস্তলটি যিয়াদের হাতে তুলে দিয়ে আহমদ মুসা বলল , আল্লাহর হাজার শোকর যে গোলাগুলি এখনও হয়নি , ভেতরে শত্রুরা তাহলে সতর্ক হয়ে যেত।

বিল্ডিংটির গোড়ায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা দেখল, নিচের সবগুলো জানালা বন্ধ। শুধু একটা জানালার ফোকর দিয়ে আলোর রেশ পাওয়া যাচ্ছে। আর উপরে দু'তলায় দু'টি জানালা খোলা। আলো জ্বলছে ঘরে। একাধিক মানুষের কন্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ঘর থেকে।

নিচের যে জানালা থেকে আলোর রেশ পাওয়া যাচ্ছে , ধীরে ধীরে এসে জানালার কাছে দাঁড়াল দু'জন। কাঠের জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। দু'জনে কান পাতল জানালায়। ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্না শুনতে পেল তারা, সেই সাথে ভারী কন্ঠস্বরঃ 'চল সুন্দরী, উপরে সবাই অপেক্ষা করছে , সেখানে তোমাকে নিয়ে মহোৎসব। চল ম্যাডাম সাহেবা, তুমি দেখবে চল'।

কথা বন্ধ হলো। ভেতর থেকে চিৎকার শুনা গেল।

আহমদ মুসা যিয়াদের কাঁধে হাত রেখে বলল, এ সময় তোমাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে যিয়াদ। ওদেরকে উপরে নিয়ে যাচ্ছে। চল, আর দেরী করা যায়না।

বাড়ির সামনেটা পশ্চিম দিকে। আহমদ মুসারা বাড়ির দক্ষিণ পাশ ঘুরে বাড়ির সামনের দক্ষিণ-উত্তর প্রসারিত বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফুলের বাগান। দক্ষিণ দিক থেকেও গ্রাউন্ড ফ্লোরের বারান্দায় উঠার সিঁড়ি আছে।

বারান্দার এ প্রান্ত থেকে দোতালায় উঠার সিঁড়ির দূরত্ব দশ গজের বেশী হবেনা। সিঁড়িতে উঠার মুখে স্টেনগানধারী প্রহরী।

আহমদ মুসা ও যিয়াদকে বারান্দায় দেখে ভ্রু কুঁচকালো প্রহরী।

আহমদ মুসা যেন বেড়াতে এসেছে। এমন ভঙ্গিতে তর তর করে বারান্দার সিড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা দিয়ে চলতে লাগল। তার ডান হাতটি প্যান্টের পকেটে। আহমদ মুসার পেছনে যিয়াদ।

আহমদ মুসাদের অগ্রসর হতে দেখে স্টেনগান তুলল প্রহরী। বলল, তোমরা যেই হও আর এক পা' এগুলে......

প্রহরীর কথা শেষ হতে পারলো না। আহমদ মুসার পকেট থেকে বেরিয়ে এল রিভিলবার চোখের পলকে। গুলী করল আহমদ মুসা। প্রহরীর কপাল গুড়ো করে দিল গুলিটা।

গুলী করেই ছুটল আহমদ মুসা। তুলে নিল প্রহরীর স্টেনগান। তারপর এক দৌড়ে লাফিয়ে উপরে উঠল সিঁড়ি দিয়ে। তিন লাফে সে দোতালার বারান্দায় উঠে গেল। যিয়াদও তার পেছনে পেছনে উঠে এসেছে।

দোতালার মাঝখানের ঘরে দু'টি জানালা দিয়ে আলো দেখেছে আহমদ মুসা। কথাও শোনা গেছে সেখান থেকে। আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখল- সিঁড়ির বাঁ পাশে একটা বদ্ধ দরজার পরেই একটা দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান বাগিয়ে ছুটল দরজার দিকে। অর্ধেক পথটা গেছে এমন সময় দু'জন লোক দরজায় বেরিয়ে এল। তাদের হাতেও স্টেনগান, কিন্তু ব্যারেল নামানো। আহমদ মুসাকে দেখেই ওরা ত্বড়িৎ গতিতে ভেতরে ঢুকে গেল।

দরজায় গিয়ে আহমদ মুসা একটু উঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তার সাথে যিয়াদও।

তারা ঘরে ঢুকতেই হো হো করে হেসে উঠল ছ'ফুট লম্বা একজন লোক। সে যিয়েদের মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে। তার রিভলবারের নলটা যিয়াদের মায়ের মাথায় ঠেসে আছে।

ঘরে আরও চারজন লোক, তারা ঐ লোকটির পেছনে দাঁড়িয়ে। যিয়াদের স্ত্রী জোহরা যিয়াদের মা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে সে। যিয়াদের মা'র মুখ ফ্যাকাশে।

লোকটি হাসি থামিয়ে বলল, জানতাম যিয়াদ তুমি আসবে। শুন তোমরা , আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি তোমরা হাত থেকে স্টেনগান ফেলে হাত তুলে না দাঁড়াও, তাহলে প্রথমে মরবে তোমার মা, পরে তোমার স্ত্রী। আর শুন যিয়াদ, গ্রানাডার ক্লু-ক্ল্যাক্স -ক্ল্যান চীফ আলফনসো এক কথা দুই বার বলে না।

গুনতে শুরু করল লোকটি। দুই পর্যন্ত যেতেই আহমদ মুসা স্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। তারপর যিয়াদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসা একটু বড় করেই বলল, 'ফেলে দাও যিয়াদ আমরা হেরে গেছি।'

যিয়াদের মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু আহমদ মুসার মুখে কোনই ভাবান্তর নেই, তার মুখ দেখে মনে হলো কিছুই ঘটেনি।

যিয়াদ স্টেনগান ফেলে দিয়ে দু'হাত উপরে তুলল।

এবার আলফনসো রিভলবার বাগিয়ে যিয়াদের মা'র আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার রিভলবারের নল যিয়াদ ও আহমদ মুসার দিকে। হো হো করে উৎকট শব্দে হেসে উঠল আলফনসো। বলল, এই গর্দভরা, এই কুকুর দু'টোর পকেটে কি আছে দেখে বের করে নে। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসারা। স্টেনগান বাগিয়ে দু'জন ছুটে এল। তারা পকেট সার্চ করে আহমদ মুসার পকেট থেকে দু'টো রিভলবার এবং যিয়াদের পকেট থেকে একটি পিস্তল বের করল।

'ওদের নিয়ে আয় ঘরের মাঝখানে। নাটক এখনি শুরু করব।' বলল আলফনসো।

আহমদ মুসাদের নিয়ে যেতে হল না। আহমদ মুসাই যিয়াদকে হাত ধরে নিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের চারদিক ঘিরেই সোফা সাজানো।

ঘরের পশ্চিম পাশে সোফা ও দেয়ালের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত প্যাসেজ। চারজন স্টেনগানধারী সেই প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াল। চারজনেরই স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে উদ্যত।

আবার আলফনসোর সেই হাসি। হাসির হো হো রবে গম গম করে উঠল ঘর। চিৎকার করেই সে বলল, যিয়াদ তুমি শুধু নও, তোমার মা শুধু নয়, তোমার স্ত্রীও আমার হাতের মুঠোয়। আজ আমাদের মহোৎসব। আর নিবেদায় তোমরা যে খেলা শুরু করেছ তার আজ ইতি। তুমি প্রথমে দু'চোখ মেলে দেখবে তোমার স্ত্রীর ভাগ্য। নব বধু, ভালই জমবে মহোৎসবটা। তারপর তোমাদের টুকরো টুকরো করে নিবেদার জংগলে ছড়িয়ে আসা হবে।

থামল আলফনসো। সে দাঁড়িয়ে আছে উত্তর পাশের বিশাল সোফাটার সামনে।

আহমদ মুসা ও যিয়াদ এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর মুখী হয়ে মেঝের ঠিক মাঝখানে। তাদের পুব পাশে মেঝের উপর বসেছিল যিয়াদের মা ও তার স্ত্রী।

যিয়াদরা ঘরের মাঝখানে আসার পর যিয়াদের মা ও যিয়াদের স্ত্রী এসে জড়িয়ে ধরেছে যিয়াদকে। এটা দেখেই আকাশ ফাটা হাসি হেসে আলফনসো ঐ কথাগুলো বলল।

আলফনসো থামার পর আহমদ মুসা বলল, দেখ আলফনসো তুমি নিরস্ত্র নারীর আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছ, বীরত্ব তোমার মুখে শোভা পায় না।

'কথা বলছ তুমি কে? আলফনসোকে বীরত্ব শেখাতে এসেছ ?'

'নারীকে যারা কিডন্যাপ করে, বীরত্ব তাদেরকে শেখাতেই হবে আলফনসো।' আহমদ মুসার মুখে বিদ্রুপের হাসি।

যিয়াদ, যিয়াদের মা এবং জোহরার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তার ভাবনাহীন মুখ, ঐ ধরনের কঠোর উক্তি এবং মুখে এক ধরনের হাসি দেখে তাদের মুখে ভয়, বিস্ময় দুই-ই ফুটে উঠল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই গর্জে উঠল আলফনসো। ছুটে এল সে আহমদ মুসার সামনে। রিভলবারের বাঁট দিয়ে সে আঘাত করল আহমদ মুসার মাথায়।

আহমদ মুসা প্রস্তুত ছিল এর জন্যে। সে মাথা দ্রুত সরিয়ে নিল একদিকে হেলে। তবু কপালের এক পাশে আঘাতের একটা অংশ এসে পড়লই। কেটে গেল কপালের বাঁ পাশটা। ঝরঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল। মুখের বাঁ পাশটা রক্তে ধুয়ে গেল।

রক্ত দেখে সম্ভবত খুশী হল আলফনসো। পশ্চিম দিকে দেয়াল বরাবর প্যাসেজে দাঁড়ানো স্টেনগানধারীদের কিছু নির্দেশ দেয়ার জন্যে ওদিকে ফিরল আলফনসো। সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা পশ্চিম দিকে এক ধাপ এগিয়ে বাঁ হাত দিয়ে গলা পেঁচিয়ে বুকের সাথে প্রচন্ড শক্তিতে চেপে ধরল আলফনসোকে , আর একই সময়ে ডান হাত দিয়ে আলফনসোর হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিল আহমদ মুসা। রিভলবার কেড়ে নিয়েই আহমদ মুসা পরপর চারটা গুলী করল। স্টেনগান ধারী চারজন পাকা ফলের মত পরপর টপ টপ করে ফ্লোরে পড়ে গেল।

গোটা ঘটনা ঘটতে পাঁচ সেকেন্ডের বেশী লাগল না। আলফনসো ও স্টেনগানধারীরা ব্যাপারটা বুঝে উঠার আগেই সব শেষ হয়ে গেল।

চারটি গুলী শেষ করার পর আহমদ মুসা ধাক্কা দিয়ে আলফনসোকে ফেলে দিল। পড়ে গিয়েই আলফনসো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তার হাতে রিভলবার। এর মধ্যেই সে পকেট থেকে একটি রিভলবার বের করে নিয়েছে। উপরে উঠছিল তার রিভলবার সমেত হাত।

আহমদ মুসা তাকে আর সুযোগ দিল না। রিভলবার তুলে গুলী করল তার উঠে দাঁড়ানো মাথা লক্ষ্য করে।

আলফনসো গোড়া কাটা গাছের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। লাল কার্পেট তার লাল রক্তে ডুবে গেল।

যিয়াদ, যিয়াদের মা ও তার স্ত্রী ঘটনা দেখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। চিন্তার চেয়ে দ্রুত ঘটে গেল ঘটনা। ঘটনা ঘটনার চেয়ে তা বুঝতেই তাদের দেরী হচ্ছে যেন।

আহমদ মুসা আলফনসো গুলী করার পর যিয়াদের দিকে ফিরল।

যিয়াদ বোবা বিস্ময় নিয়ে আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। আনন্দে কেঁদে ফেলল যিয়াদ। আনন্দের অশ্রু যিয়াদের মা এবং জোহরার চোখেও।

'সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিয়াদ। চল আমাদের দ্রুত বেরুতে হবে।' যিয়াদের পিঠ চাপড়ে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামল বারান্দায়। সিঁড়ির গোড়ায় প্রহরীটি পড়ে আছে, বারান্দা তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আহমদ মুসারা বারান্দা থেকে নেমে এল গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি বারান্দায় সেই মাইক্রোবাসটি তখনও দাঁড়িয়ে।

গাড়ির দরজা খোলা গাড়ির চাবীটি তার কি হোলে লাগানো।

আহমদ মুসা যিয়াদকে বলল, তুমি ওঁদের নিয়ে পেছনে উঠো , আমি ড্রাইভিং সিটে বসছি।

আহমদ মুসা গেট নিয়ে ভাবছিল। সেখান থেকে কোন প্রতিরোধ আসবে নাকি। স্টেনগানটা পাশে রেখেছে আহমদ মুসা। গাড়ি পৌঁছল গেটে, কিন্তু কেউ বেরুল না। গাড়ি দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসা নামল স্টেনগান নিয়ে। গেট রুমে গিয়ে দেখল, গেট রুম শুন্য। পালিয়েছে তাহলে গেটম্যান।

গেটরুমের দেয়ালে সুইচ বোর্ড দেখল আহমদ মুসা। 'OPEN' চিহ্নিত সুইচ টিপে দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল আহমদ মুসা।

খোলা দরজা পথে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। এসে দাঁড়াল অপেক্ষমান তাদের গাড়িটির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ও গাড়ি থেকে নেমে এল আবদুল্লাহ, জোয়ান এবং রবার্তো। নামল আহমদ মুসা এবং যিয়াদ।

আহমদ মুসার গোটা মুখমন্ডল, রক্তাক্ত দেখে আৎকে উঠল জোয়ান, রবার্তো এবং আবদুল্লাহ। জোয়ান উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, আপনি ভালো আছেন তো মুসা ভাই? ওরা ভাল আছেন ?

আহমদ মুসা হেসে বলল, 'চিন্তা করো না, আল্লাহর অপার সাহায্য আমরা পেয়েছি। সবাই আমরা ভালো আছি।'

একটা দম নিয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘রবার্তো তুমি ড্রাইভ করবে যিয়াদের গাড়িটা, উঠো। আর আবদুল্লাহ তুমি মাইক্রোবাস ড্রাইভ করবে। আমি ও জোয়ান তোমার সাথে মাইক্রোবাসে উঠছি।’

সবাই গাড়িতে উঠার পর দুই গাড়ি একসাথে যাত্রা করল। আগে যিয়াদের গাড়ি , পেছনে মাইক্রোবাসটি।

গাড়ি চলছে, আহমদ মুসা সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। পাশে জোয়ান , সে উশখুশ করছিল। শেষে সে জিজ্ঞেস করেই বসল, ‘কি ঘটল মুসা ভাই ?’

‘বুঝেছি, তোমার তর সইছে না, কিন্তু এখন নয়, চল ধীরে সুস্থে বলব। ছয় ছয়টা মানুষকে মারতে হয়েছে, বড় খারাপ লাগছে। কি করব, উপায় ছিল না।’

‘ছয়জন!’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল জোয়ান।

‘যিয়াদ ভাইয়ের মনটাও বড় নরম, প্রানহানী তিনিও সইতে পারে না।’ বলল আবদুল্লাহ।

‘তবু সইতে হয় ভাইয়া, অশান্তি, অন্যায়ের রাজত্ব-পিড়িত পৃথিবীতে এটাই এখন নিয়ম।’

ওদিকে যিয়াদের গাড়িতে যিয়াদের মা জোহরার উরুতে মাথা রেখে গাড়ির সিটে শুয়ে পড়েছে। আর জোহরা গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে মাথাটা যিয়াদের কাঁধে রেখে নিরবে অশ্রুপাত করছে, আনন্দের অশ্রু, ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন থেকে বাঁচার অশ্রু, নতুন জীবন লাভের অশ্রু।

ধীরে ধীরে মাথাটা একটু তুলে যিয়াদের মা বলল, ‘যিয়াদ, ও ছেলেটা কে? আল্লাহর ফেরেস্তার মত কোত্থেকে এল ও? এমন নির্ভয়, এমন দু:সাহসী, বাজের মত এমন ক্ষীপ্র, কুশলী আমাদের কেউ আছে যিয়াদ?’

‘আছে আম্মা, উনি গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের গর্ব, যেখানেই মুসলমানদের বিপদ সেখানেই তিনি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহই তাঁকে পাঠিয়েছেন। চলুন আম্মা, বলব সব।’‘

রাত মাত্র ৮টার মত তখন। কিন্তু গ্রানাডার পথ প্রায় জনশূন্য। বিপনী কেন্দ্রগুলোর দরজা বন্ধ।

ফাঁকা পথ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসাদের দু’টি গাড়ি পাশাপাশি।

২

মাদ্রিদের শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স এবং স্পেনের মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নগুলো ধীর তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে ধ্বংস করার যে জঘন্য ষড়যন্ত্র ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এঁটেছে, তার বিবরণ শেষ করে আহমদ মুসা থামল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও কেউ কোন কথা বলল না। যিয়াদ বিন তারিক, যিয়াদেও সহকারী আহমদ আব্দুল্লাহ, জোয়ান ও রবার্তো কারও মুখেই কোন কথা নেই। বিস্ময় ও উদ্বেগ তাদের সকলকেই আচ্ছন্ন করেছে।

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান সরকারের যোগ সাজসে এটা করছে বলে কি আপনি মনে করেন মুসা ভাই?' যিয়াদই প্রথম মুখ খুলল।

'এ প্রশ্ন নিয়ে আমি চিন্তা করেছি, কিন্তু সরকারের যোগসাজস থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়নি দু'টো কারণে। এক, নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে সরকার কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বৈরীতা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে, দুই, স্পেনের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটা প্রধান অবলম্বন হলো পর্যটন। আর পর্যটন খাতের আয়ের সিংহ ভাগ আসে মুসলিম ঐতিহাসিক স্থানগুলো থেকে। এগুলো নষ্ট হলে স্পেন প্রতিবছর কোটি কোটি ডলারের আয় থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং উভয় কারণেই আমার বিশ্বাস স্পেন সরকার এ ষড়যন্ত্রের সাথে থাকতে পারে না।' বলল আহমদ মুসা।

'তবে এ রকম একটা কিছু হলে ক্ষতি নেই, এ ধরনের লোকের সংখ্যাই প্রশাসনে বেশী। আর এই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সাথে সহযোগীতা করতে পারে, এমন লোকও প্রশাসনে কম নেই।' বলল রবার্তো।

'সুতরাং এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভের কোন আশা নেই। উপরন্তু যারা সরকারকে এ ব্যাপারে বলবে, তাদের কন্ঠরুদ্ধ হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।' বলল জোয়ান।

‘ঠিক বলেছ জোয়ান, সরকারকে বললে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমরা নিজেরাই এগুতে চাই। তার আগে জোয়ান তোমার কি মত, ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে, তুমি তো বিজ্ঞানী।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বিল্ডিং ধ্বংসের বিস্ফোরক তো বানানোই হয়েছে। তাত্বিকভাবে তেজস্ক্রিয় বানানোও সম্ভব যা নিরবে ধীরে ধীরে কোন বিল্ডিংকে ভেতর থেকে শেষ করে দেবে। নিশ্চয় রুশরা এমন অস্ত্র গোপনে তৈরী করেছে শ্যাবোটাজ কাজের জন্যে।’ বলল জোয়ান।

‘এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই কিভাবে করব? রিমেডী তোমার মতে কি আছে এর?’

‘প্রথমে তেজস্ক্রিয়কে চিহ্নিত করতে হবে, তারপর প্রয়োজন এর বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের পর এর এ্যান্টিডোট পাওয়া যাবে মুসা ভাই। যদি তেজস্ক্রিয় আণবিক হয়, যদি এর কোন আণবিক এ্যান্টিডোটের পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে এ্যান্টিম্যাটার এ্যান্টিডোটের প্রয়োজন হবে।’

‘শুনেছি, তোমার মৌলিক গবেষণা আছে এ্যান্টিম্যাটার বিজ্ঞানের উপর। তোমার ইউরোপীয় বিজ্ঞান একাডেমির পুরস্কারও এই গবেষণার উপর। বলত, এ্যান্টিম্যাটার গবেষণা কতটা এগিয়েছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘থিয়োরিটিক্যাল গবেষণার উল্লেখযোগ্য কিছু বাকি নেই। এখন গবেষণা চলছে এর বহুবিধ ব্যবহার নিয়ে। ছোট ছোট বিষয়ে এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ছিল আমার গবেষণার বিষয়।’

‘কি রেজাল্ট পেয়েছ জোয়ান আমি জানি না।।’

‘নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে পরমানুর মত সবক্ষেত্রেই একে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু ফল পাওয়া যাবে পরমানুর চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ বেশী।’

‘ষড়যন্ত্র যদি সত্যি হয়, তাহলে জোয়ান তোমার কাজ অনেক বেড়ে যাবে। তোমার মত বিজ্ঞানীকে পেয়ে আমরা খুশী জোয়ান।’

‘মুসা ভাই, আগের জোয়ানের সবকিছু আমি ত্যাগ করেছিলাম। বই-পুস্তক, সার্টিফিকেট নোট, সব আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। আমি ভেবেছিলাম, স্পেনে একজন মরিস্কোর জীবনে এ সবের কোনই মূল্য নেই, কোনই কাজে আসবে না।

এখন যেন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, জোয়ান তার অতীতকে কাজে লাগাতে পারে, তার অতীতের কিছু মূল্য আছে। আমার সব শক্তি সব মেধা আমি আমার জাতির জন্যে বিলিয়ে দেব মুসা ভাই।' জোয়ানের শেষের কথাগুলো আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল।

আহমদ মুসা জোয়ানের কাছে এগিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, আমরা তোমার প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেব না জোয়ান। এই স্পেন মুসলিম বিজ্ঞানীদের চারণ ক্ষেত্র ছিল। তারা অন্ধকার ইউরোপকে পথ দেখিয়েছে, শিক্ষিত করেছে, তাদের জীবনে রেনেসাঁ এনেছে। তারপর আমাদের হাতের সে আলো নিভে গিয়েছিল। আমরা চাই, তোমার হাতে সে আলো আবার জ্বলে উঠুক।

জোয়ান আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত কন্ঠে বলে উঠল, 'স্পেনে আমাদের সেদিন কি আসবে মুসা ভাই?'

আহমদ মুসা ঘরের জানালা দিয়ে আসা উদীয়মান সূর্যের সোনালী বর্ণচ্ছটার দিকে চেয়ে বলল, ইতিহাসের মোড় ঘুরছে জোয়ান। বহু শতাব্দী আমরা, ঔপনিবেশিক শাসনে নিস্পিষ্ট হয়েছি, মার খেয়েছি চূড়ান্ত। মার খেতে খেতে মৃত্যুভয় আমাদের চলে গেছে। সেই সাথে আমরা ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিচ্ছি যে, আমাদের শক্তির উৎস আমাদের আদর্শ- ইসলাম। সেখান থেকে আমাদের বিচ্যুতিই রাজনৈতিকভাবে আমাদের দুর্বল করেছিল, সাংস্কৃতিকভাবে অন্তঃসারশূণ্য করে তুলেছিল, যার ফলে স্বাধীনতা আমাদের হাত থেকে খসে পড়েছিল। এই দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাসের মোড় ঘুরছে আজ। তুমি জোয়ান, রবার্তো, যিয়াদ ও তার সাথীরা এবং তোমাদের মত বিশ্বের আরো লাখো তরুণ ইতিহাসের মোড় ঘুরানোর কাজে রত আজ। সকালের এই সূর্যের মতই আমি নিশ্চিত, ইতিহাস মানবতার জন্যে সুদিন নিয়ে আসছে।

এই সময় বাইরে একাধিক লোকের কন্ঠ শোনা গেল। যিয়াদ চট করে বাইরে চলে গেল।

মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বলল, আমাদের জংগল সীমান্তের দু'টি চৌকিতে দু'জন লোক ধরা পড়েছে। তাদের কাছে পিস্তল পাওয়া গেছে।

'এমন ঘটনা আগে ঘটেছে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘ঘটেনি।’

আহমদ মুসা ভ্রু কুঞ্চিত করল। বলল, ‘নিয়ে এস তো দু’জনকে।’

চোখ বাঁধা দু’জন লোককে ঘরে নিয়ে আসা হলো।

‘চোখ খুলে দেবে না?’ যিয়াদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘চোখ না খুলাই এখানকার নিয়ম মুসা ভাই, বন্দীখানায় ঢুকানোর পরই শুধু ওদের চোখ খুলে দেয়া হবে।’

‘ভাল ব্যবস্থা যিয়াদ।’

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথায় ধরা পড়েছে এরা?’

‘জংগল সীমান্তের দু’চৌকিতে দু’জন ধরা পড়েছে।’ বলল যিয়াদ।

‘দু’চৌকিতে দু’জন? এক চৌকিতে নয়?’

‘জি না।’

আহমদ মুসা পাশ থেকে ছড়ি তুলে নিয়ে চোখ বাধা লোক দু’টির গায়ে খোঁচা দিয়ে বলল, তোমাদের আর সাথীরা কোথায়?

‘আর কেউ নেই।’ তাদের দু’জনের একজন বলল।

আহমদ মুসা যিয়াদের কানে কানে কথা বলল। যিয়াদ উঠে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর একটা ম্যাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর জংগল সীমান্তে চৌকি দু’টির অবস্থান দেখিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ম্যাপটার দিকে একবার ভাল করে নজর করে মুখ ফেরাল লোক দু’টির দিকে। তাদের শরীরে সেই আগের মত ছড়ির খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মিথ্যা কথা বলছ তোমরা, তোমাদের আরও ছয়জন সাথী আছে। কোথায় তারা?

‘না কেউ আর নেই।’ আগের মত উত্তর দিল ওদের একজন।

‘দেখ মিথ্যা কথা আমরা পছন্দ করি না, ওদের পেলে কিন্তু তোমাদের প্রাণদন্ড হবে।’ কঠোর কণ্ঠে উচ্চারণ করলল আহমদ মুসা।

ওরা কোন জবাব দিল না।

‘শুধু মুখের কথায় ওদের কথা বের হবে না। ওদরে নিয়ে যেতে বল যিয়াদ। আপাদমস্তক ওদের সার্চ করতে বল, জুতা পর্যন্ত।’

চোখ বাধা দু’জনকে নিয়ে গেল যিয়াদের দু’জন লোক।

ওরা বেরিয়ে যেতেই আহমদ মুসা বলল, ‘যিয়াদ আমারদ অনুমান মিথ্যা না হলে আরও ছয়জন লোক জংগলে প্রবেশ করেছে, খুঁজে বের করার নির্দেশ দাও।’

‘মুসা ভাই, জংগলে এমনভাবে পাহারা বসানো যে, কেউ জংগলে ঢুকলে ধরা পড়বেই। তবু একবার তাগিদ দিয়ে আসছি ভাল ভাবে খোঁজ করার জন্য।’ বলে যিয়াদ বেরিয়ে গেল।

যিয়াদ যখন ফিরে এল, তখন তার সাথে ঘরে ঢুকল যারা চোখ বাঁধা দু’জনকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন। সে সার্চ করে পাওয়া জিনিসগুলো আহমদ মুসার সামনে রাখল। ওদের কাছ থেকে পাওয়া মানিব্যাগ, কলম, চাবীর রিং, লাইটার ইত্যাদির মধ্যে লাইটার আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

লাইটারটি হাতে তুলে নিতেই লাইটারের এক পাশে মাছের চোখের মত ছোট স্বচ্ছ, উজ্জ্বল একটা জ্বলজ্বলে চোখ আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভাল করে দেখার জন্যে কাছে নিয়ে আসতেই অস্পষ্ট ব্লিৎস ব্লিৎস শব্দ তার কানে গেল। আহমদ মুসা চমকে উঠল লাইটারটা কি তাহলে অটোমেটিক মুভি ক্যামেরা ও ট্রান্সমিটার দুই ভুমিকাতেই কাজ করছে।’ অন্য লাইটারটাও দেখল আহমদ মুসা। একই লাইটার একই ব্যবস্থা। আরও ভালভাবে উল্টে-পাল্টে দেখল আহমদ মুসা। অত্যন্ত পাওয়ারফুল ট্রান্সমিটার আহমদ মুসা তা দেখেই বুঝতে পেরেছে।

আহমদ মুসা ট্রান্সমিটার দু’টি জোয়ানের হাতে তুলে দিয়ে বলল, জোয়ান ক্যামেরা এবং ট্রান্সমিটার দেখ। এখনও মেসেজ রিলে করছে।

ঘরের সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিস্মিত চোখে জোয়ান হাতে তুলে নিল লাইটারটি।

আহমদ মুসা হেলান দিয়ে চোখ বুজল। চিন্তা করছে সে। ট্রান্সমিটারটা অন কেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কি মেসেজ সে রিলে করছে? দুই ট্রান্সমিটারের একই অবস্থা। তাহলে এই ট্রান্সমিটারের এটাই সিস্টেম। বাহকের কাছে এটা সব সময়

খোলা থাকবে কিন্তু কেন? কি মেসেজ এরা ট্রান্সমিট করে? হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এ সময় জোয়ান বলল, এর ব্লিৎস, এর সাইজ ও গ্লাভেটি থেকে বুঝা যাচ্ছে কমপক্ষে ১০০ বর্গমাইল সীমার পথে এ সংকেত পাঠাতে পারে।

এ সময় দ্রুত ঘরে ঢুকল আব্দুল্লাহ। বলল, অয়ারলেসে খবর এসেছে, আরও ছয়জন ধরা পড়েছে। ওদের নিয়ে আসছে।

সবাই স্তম্ভিত চোখে তাকাল- আব্দুল্লাহর দিকে নয়, আহমদ মুসার দিকে। মনে তাদের একটা প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে, ছয়জনের কথা আহমদ মুসা কি করে বলল।

'আহমদ মুসা ভাই, ওদের সাথী আরও থাকতে পারে অনুমান করলেন ঠিক আছে, কিন্তু সংখ্যাটা কি করে বললেন?' বলল যিয়াদ।

'মুসা তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। তার কপাল কুঞ্চিত। মুখটা শক্ত। যিয়াদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'গোয়াদেল ফো তীরের তোমাদের এ ঘাটিটা সরবরাহ ঘাটি তাই না? মূল ঘাটিটা এখান থেকে আরও কতদূরে?

'হ্যাঁ মুসা ভাই, এটা আমাদরে সরবরাহ ঘাটি। মূল ঘাটিটা আরও পুবে, বনের আরও গভীরে, ৪০ মাইল দূরে তো হবেই। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করছেন মুসা ভাই?' যিয়াদের কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, বলল আহমদ মুসা, 'তাহলে আটজন অনুপ্রবেশকারী চর এখানে একত্রিত হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে অথবা রাতের অন্ধকারে এই ঘাটি আক্রান্ত হবে। আকাশ পথে আসতে পারে, নদী পথে আসতে পারে, বোমা ফেলতে পারে, ছত্রীও নামতে পারে। এখানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বিমান আছে যিয়াদ?'

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নেই, চার্চের আছে বিমান এবং হেলিকপ্টার দুই-ই।'

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবং চার্চের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই না?'

'জি।' বলল যিয়াদ।

'তাহলে শুন, অনুপ্রবেশকারী ছয়জনকে এখানে নিয়ে এস। আর তোমাদের লোক-জন, মাল-সামান সব মূল ঘাটিতে স্থানান্তরিত কর এখনি।'

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু কলল, ঐ ছয়জন এলে, ওদের কাছেও ছয়টি ট্রান্সমিটার পাওয়া যাবে, মোট ৮টি ট্রান্সমিটার হবে। এই ৮টি ট্রান্সমিটার ঘাটিতে রেখ, ৮ জন অনুপ্রবেশকারীকেও অন্য কোথায় নিয়ে আটকে রাখতে পার।'

'৮টি ট্রান্সমিটার এখানে থাকবে কেন মুসা ভাই?' বলল যিয়াদ।

'ওরাই তো সংকেত দাতা, ওরাই পথ বাতলাচ্ছে। ওদের যদি সাথে নাও, তাহলে যেখানে, নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবে ওদের আক্রমণ।'

'৮টি ট্রান্সমিটার একত্র হওয়া আক্রমণের শর্ত কেন?' বলল জোয়অন।

'ওদের পরিকল্পনা হলো, ৮জন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে তোমাদের ঘাটিতে আসবে, অথবা ধরা না পড়লে ওরাই তোমার ঘাটি খুঁজে নেবে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা একত্রিত হচ্ছে। এক অবস্থান থেকে ৮টি ট্রান্সমিটারের সংকেত যখন ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্যানের কাছে যাবে, তখন ওরা বুঝবে এটাই যিয়াদের ঘাটি। যেখানে যিয়াদ ও তার লোকজন আছে এবং আছে আহমদ মুসা। এরপরেই তাদের আক্রমণ।'

যিয়াদ, জোয়ান, রবার্তো, আহমদ আব্দুল্লাহ সবার বিস্মিত দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তাদের সবার মুখ হা হয়ে গেছে। এতক্ষণে ব্যাপারটা তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। তাদের কারও মুখে কোন কথা নেই।'

কথা বলল প্রথম জোয়ান। বলল, বুঝেছি মুসা ভাই, ট্রান্সমিটারগুলো আসলে 'পথ ইন্ডিকটের' বা 'পথ নির্দেশক'। ওরা যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথটা অংকিত হয়ে যাবে রিসিভিং স্ক্রীনে। সব পথ অবস্থানে এসে একত্রি হবে, সেটাকেই ওরা ধরে নেবে ঘাটি। এ জন্যেই বিভিন্ন পথ দিয়ে ওরা পাঠিয়েছে ওদের এজেন্টদের। কিন্তু মুসা ভাই আপনি দয়া করে বলুন, দু'জন অনুচরকে দেখে আপনি কেমন করে বুঝলেন আরও আছে এবং তারা ছয়জন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'খুবই সোজা ব্যাপারটা। স্বাভাবিক নিয়মে অনুপ্রবেশকারীরা যে ক'জনই আসুক, এক সাথে আসার কথা। কিন্তু দু'জনকে পাওয়া গেল একটা ব্যবধানে। তখনই আমার মনে হলো, অনুরূপ ব্যবধানে আরও অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। ম্যাপে ঐ অঞ্চলের বন-প্রান্তের অবশিষ্ট অংশটা পরিমাপ

করে দেখলাম আরও ছয়জনের জায়গা আছে। এ থেকেই আমি ছয়জনের ব্যাপারটা অনুমান করেছি।'

'ধন্যবাদ মুসা ভাই, এই জন্যেই আপনি আহমদ মুসা। আল্লাহ তার অশেষ নেয়ামতকে আপনার উপর ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া।' বলে যিয়াদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশি কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। বলল, এক ঘন্টার মধ্যেই এ ঘাটি ভ্যাকেন্ট করা হবে মুসা ভাই, আর আপনারাও আধা ঘন্টার মধ্যেই রওনা হচ্ছেন। তবে মুসা ভাই, এই ঘাটিকে আমরা ওদের জন্যে, মরণ ফাঁদ বানাতে চাই, আপনার মত কি?'

আহমদ মুসা একটু ভেবে বলল, তোমার পরিকল্পনা কি?

'আমরা ঘাটি খালি করে ওদের আসার সুযোগ করে দিতে চাই, তারপর ওদের চারদিক থেকে আক্রমণ করব। কাউকে পালাতে দেব না।' বলল যিয়াদ।

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কথা বলল না। তার কপাল কুঞ্চিত। ভাবছে সে। বলল, 'যিয়াদ শত্রুর উপর আঘাত হানার এটা একটা লোভনীয় সুযোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধটা নিজের মাটিতে যতটা এড়ানো যায়, তত ভাল। এতবড় ঘটনা যদি এখানে ঘটে, তাহলে শুধু ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান নয় সরকারও গোটা জংগল এলাকাকে টার্গেট করবে। গোটা জংগল এলাকাকে বিধ্বস্ত করতে এগিয়ে আসবে। আর এখানকার হত্যাকান্ডকে গোটা দুনিয়ার কছে সে অজুহাত হিসেবে পেশ করবে। আমাদের এ আশ্রয়টা এ ধরণের বিপর্যয়ের স্বীকার হোক আমরা তা চাই না।

যিয়াদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আপনাকে ধন্যবাদ মুসা ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা এভাবে চিন্তা করিনি। এখন আমরা কি করব? অনুপ্রবেশকারীদের এখানে না আনলেই ভাল হতো না?

'দু'জন তো আগে এসেই গেছে। জায়গাটা ওদের কাছে ডিটেক্টেড হয়ে গেছে। এখন যদি ওদের মেরে ও ফেল, তাহলেও ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এখানে আসবে ওদের সন্ধানে। সুতরাং দু'জন যখন এসে গেছে, তখন সবাইকে এখানে আনাই ভাল। এতে ওরা বুঝবে গোটা জংগলে এটাই তোমাদের একমাত্র ঘাটি। আরেকটা

কথা, ওরা যখন ঐ ভাবে জংগলে সার্বিক অনুসন্ধান শুরু করেছে, তখন তোমাদের ঘাটির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ওরা সন্ধান চালাবেই। সুতরাং একটা ঘাটির পতন ঘটিয়ে যদি ওদের অনুসন্ধান বন্ধ করা যায় এবং অন্যসব ঘাটি রক্ষা করা যায় সেটাই ভাল।'

'তাহলে এখন আমাদের কি করণীয় মুসা ভাই?' বলল যিয়াদ।

'বন্দীরা কি জানতে পেরেছে, আমরা ঘাটি খালি করছি?'

'যেখানে ওদের রাখা হয়েছে, কিছুই জানা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে। তাহলে ওদের এটা বুঝতে দাও যে তোমাদের পরিবার-পরিজন তোমরা বন্দর-নগর মিত্রালীতে ট্রান্সফার করছ। আচ্ছা শত্রুরা কোন পথ দিয়ে কখন আসছে তা জানার কি ব্যবস্থা রেখেছ?'

'ওরা আকাশ, জল, স্থল, যেদিক দিয়েই আসুক, আমাদের এলাকার সীমান্ত অতিক্রম করলেই আমরা জানতে পারব।'

'তাহলে চিন্তা নেই, আমরা যখন দেখব ওরা ঘাটির দিকে এগুচ্ছে, তখন আমরা অবশিষ্টরা ঘাটি ছেড়ে চলে যাব। বন্দীদের আমরা বুঝতে দেব যে, ঘাটিতে আক্রমণ আসছে এ জন্যে আমরা সরে পড়ছি।'

'কেন বন্দীদের আমরা শেষ করে যাব না?' বলল আহমদ আব্দুল্লাহ, যিয়াদের সহকারী।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আত্মসমর্পণকারীদের মুসলমানরা হত্যা করে না এবং তাদের উপর নির্যাতনও করে না। ওদের সরিয়ে নিয়ে আমরা বন্দী করে রাখতে পারি। কিন্তু তার চেয়ে ওদের ঐভাবে চলে যাবার সুযোগ দেয়ার মধ্যেই কল্যাণ আছে। ওরা বুঝবে, বন্দীদের রাখার উপযুক্ত জায়গা আমাদের নেই।'

'শত্রুরা আমাদের কি দুর্বল ভাববে না?' বলল রবার্তো।

'আমরা যে পর্যায়ে আছে, সে সময় শত্রু আমাদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিতে থাকা ভাল। আমি চাই, এই জংগলে 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট' (বি এফ সি) এর শক্তি সম্পর্কে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান নিরুদ্বেগ বোধ করুক। তাতে তোমাদের আসল যে কাজ তাতে সুবিধা হবে। 'থামল আহমদ মুসা।

যিয়াদ, আহমদ আব্দুল্লাহ, জোয়ান, রবার্তো সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যিয়াদ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, মুসা ভাই, মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আজ আপনি আমাদের মাঝে না থাকলে শত শত বছর ধরে যে জংগল এলাকাকে আমরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গড়ে তুলেছি, তা এবং তার সাথে আমরাও বিপর্যয়ের মুখে পড়তাম।'

আহমদ মুসা যিয়াদের পিঠ চাপড়ে বলল, যখন যেখানে যা করার আল্লাহই করেন, শুধু প্রয়োজন তার বান্দারা যার যখন যেটা দায়িত্ব তা আন্তরিকতার সাথে পালন করা।

আহমদ মুসা, যিয়াদসহ সবাই উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল তারা ঘর থেকে। হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা বলল, 'আর কতক্ষণে ঐ ছয়জন এসে পৌছবে?'

'আরও কয়েক ঘন্টা লাগবে।' বলল যিয়াদ।

'সবদিক বিচারে রাত ছাড়া বোধ হয় ওরা আসছে না।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথাই ঠিক।

রাতে আসল ওরা। রাত বারটায়।

ঠিক রাত বারটায় কয়েকটা ক্ষুদ্রাকার শব্দহীন পরিবহন বিমানে করে ছত্রীসেনা নামানো হলো। ওরা তিন দিক থেকে ঘাটিটাকে ঘিরে ফেলল। সামনে থাকল নদী।

আরো আধা ঘন্টা পর ঠিক রাত সাড়ে বারটার দিকে তিনটা গানবোট নিঃশব্দে ভিড়ল ঘাটির ঘাটে এসে। গানবোটের কামানের নলগুলো ঘাটির দিকে তাক করা।

এমন শব্দহীন পরিবহন বিমান এবং গানবোট স্পেনীয় ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নেই। আমেরিকার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এসব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাদের স্বার্থ আহমদ মুসা কে হাতে পাওয়া, আর স্পেনীয় ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের স্বার্থ তাদের সহযোগীতার এই সুযোগ নিয়ে 'ব্রাদারস ফর ক্রিসেন্ট' এর ঘাটি ধ্বংস করা। এই

অপারেশন পরিচালনার জন্যে মাদ্রিদ থেকে স্বয়ং ভাসকুয়েজ এসেছে এবং তিনি পরিচালনা করছেন এই অভিযান।

গান বোটের অপারেশন কক্ষে বসে ভাস্কুয়েজ। তার হাতে ওয়াকিটকি। ঘাটির তিন দিক ঘিরে পূর্বেই মোতায়েন হওয়া ছত্রীসেনাদের সাথে কথা বলছে ভাসকুয়েজ। কথা শেষ করে ওয়াকিটকির এন্টেনা গুটিয়ে নিয়ে পাশে বসা সিনাত্রা সেন্ডোকে বলল, বুঝলে সেন্ডো, একটা কাকপক্ষিও পালাতে পারেনি। পালাবে কি করে! পরিকল্পনা দেখতে হবে তো! ওরা আমাদের আটজন লোককে ধরে নিশ্চয় আনন্দে বগল বাজাচ্ছে, কিন্তু ব্যাটারা জানেনা, ওরা তো টোপ, ধরা পড়ার জন্যেই পাঠানো হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা হান্ড্রেড পারসেন্ট সফল।'

'কিন্তু ওরা কেউ সাড়া দিচ্ছে না।পাহারা নিশ্চয় থাকার কথা। তারা কিছু বলছে না কেন? শিকার...।' কথা শেষ করতে পারলো না সেন্ডো। তার কথার মাঝখানেই ভাসকুয়েজ বলে উঠল, 'রাখ তোমার কথা। খবর দিয়েছে, এক নম্বর, দুই নম্বরসহ সবাই ঘাটিতে আছে।'

মিঃ ভাসকুয়েজ থামল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আবার শুরু করল, আমার সৈন্যেরা তিন দিক দিয়ে ক্লোজ হয়ে ঘাটির দিকে আসছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা ঘাটিতে ঢুকে পড়বে। সব ব্যাটাকে মরতে হবে, নয় তো ধরা দিতে হবে। এবার আহমদ মুসাকে হাতে পাওয়ার পর আর দেরী নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ আমেরিকায়।'

'আহমদ মুসা ভীষণ ধড়িবাজ স্যার, কার্ডিনাল হাউজের মরণপুরী থেকে কি করে পালাল দেখেছেন তো স্যার?' বলল সেন্ডো।

কার্ডিনাল হাউজ থেকে আহমদ মুসার পালাতে পারার ঘটনা ভাসকুয়েজের কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মত বেদনাদায়ক। এই অপমান ও পরাজয় সহ্য করতে পারে না সে। সেন্ডোর কথায় ভাসকুয়েজ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, 'তোমার মত গর্দভের চিন্তা সব সময় নিচের দিকে, কোন বড় চিন্তা তো তোমার নেই।'

'ইয়েস স্যার, ঘাটিটা এত চুপচাপ কিনা তাই বলছিলাম ওরা ভীষণ ধড়িবাজ...।' কথা শেষ না করেই থামল সেন্ডো।

‘তুমি কোন খবরই রাখ না সেন্ডো, ওরা সকলে শেষ রাতে উঠে নামায পড়ে, তাই ওরা একটু আগেই ঘুমায়।’

ভাসকুয়েজের ওয়াকিটকি কথা বলে উঠল, স্যার, ঘাটি খালি, কাউকেই দেখছি না। একটা ঘরে বন্দী অবস্থায় আমাদের আটজনকে পাওয়া গেছে।’

ভাসকুয়েজের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

‘স্যার আমি একটু দেখি, বলে উঠে দাঁড়াল সেন্ডো। সে গান বোট থেকে ঘাটিতে নেমে গেল। তার দু’পাশে দু’জন প্রহরী উদ্যত স্টেনগান হাতে।

আধা ঘন্টা পরে সেন্ডো তাদের বন্দী আটজন লোক সহ ফিরে এল। ভাসকুয়েয এক দৃষ্টিতে তাকাল তাদের সেই আটজনের দিকে। হুংকার দিয়ে বলল, তোমরা কি খবর পাওনি যে, আহমদ মুসা, যিয়াদ সহ সবাই আছে?’

আটজনের একজন বলল, ’জি স্যার আমি খবর দিয়েছিলাম সন্ধ্যায়। তখন ওরা ছিল। সন্ধ্যার পর ওরা বেরিয়ে গেছে। সে খবর আমরা জানিয়েছি গ্রানাডা অফিসে।’

‘কোথায় গেছে ওরা?’ বলল ভাসকুয়েজ।

‘ওদের কথাবার্তায় শুনেছিলাম, সকালের দিকে ওরা পরিবার পরিজন মিত্রালীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যার পর ওরাও মিত্রালীর দিকে গেছে বলেই আমাদের মনে হয়েছে।’ বলল সেই লোকটি।

এদের কথা ঠিক। এদেরকে এই ইম্প্রেশন দেবার জন্যেই আহমদ মুসারা মটর বোট চালিয়ে প্রথমে পশ্চিম দিকে চলে যায়।পরে ইঞ্জিন বন্ধ করে বৈঠা টেনে তারা ফিরে আসে এবং পুব দিকে ৪০ মেইল দুরের গভীর জংলের ঘাটির দিকে চলে যায়।

‘তোমাদের নিয়ে গেল না?’ বলল সেন্ডো।

‘চলে যাবার সময় আমাদের এসে বলেছে, আরও কয়েক ঘন্টা তোমরা থাক, তোমাদের বন্ধুরা আসছে, তোমাদের নিয়ে যাবে।’ আটজনের অন্য একজন জানাল।

‘ওরা জানলো কি করে যে আমরা আসছি ?’ হুংকার দিয়ে উঠল ভাসকুয়েজর গলা।

‘আমরা কেউই জানতামনা যে আপনারা আসছেন।’ বলল আটজনের একজন।

ভাসকুয়েজ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো সেন্ডোর দিকে। সেন্ডো বলল, ‘স্যার আমারও একই প্রশ্ন ওরা এই তথ্য জানলো কি করে ?’

‘আমাদের গ্রানাডা অফিসটা অপদার্থ। ওখানেই কোন মরিসকো লুকিয়ে আছে মনে হয়। চল ফিরে চলো গ্রানাডা। জাহান্নামে পাঠাবো সবাইকে।’

ভাসকুয়েজ অন্য কক্ষে চলে যাবার জন্য পা বড়াতে বাড়াতে বলল, গোটা ঘাটি ভাল করে সার্চ করো সেন্ডো। কিছু পাও কিনা দেখ তারপর জ্বালিয়ে দাও শয়তানের আড্ডাটা।

ভাসকুয়েজ ঢুকে গেল তার বিশ্রাম কক্ষে। বন্ধ হয়ে গেল তার কক্ষের দরজা।

সেন্ডো উঠে দাঁড়াল। সবাইকে নিয়ে এগুলো গানবোট থেকে ঘাটিতে নামার জন্যে।

পরদিন সকাল।

বিধ্বস্ত ঘাটি থেকে ৪০ মাইল পূবে সিয়েরা নিবেদার পাদদেশে একটি পুরানো গ্রাম, পুরানো জনপদ। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সিয়েরা নিবেদার একটি ঝরনা। ঝরনাটা মাইল খানেক গিয়েই পড়েছে গোয়াদালেজ নদীতে।

এই পুরানো গ্রামের মাঝখানে একটা টিলার উপর কাঠের দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটা যিয়াদ বিন তারিকের। এটাই ‘ব্রাদারস ফর ক্রিসেন্টে’ এর প্রধান দফতর। বাড়িটা ঘিরেই গড়ে উঠেছে সুন্দর জনবহুল একটা গ্রাম।

যিয়াদের বাড়িটা সবুজ জলপাই কুঞ্জে ঢাকা। টিলার গা বেয়ে দ্রাক্ষার বাগান।

বাড়িটার সামনে টিলায় এক প্রান্তে মসজিদ। মসজিদে কোন মিনার নেই। উড়োজাহাজের নজর থেকে গোপন রাখার জন্যই এই ব্যাবস্থা। মিনারের বদলে ছাদে উঠে আজান দেয়া হয়।

ভোরের নামাজ শেষে আহমদ মুসা মসজিদের ছাদে উঠেছিল। তার সাথে যিয়াদও।

চারদিকের নৈস্বর্গিক দৃশ্যে অভিভূত হয়েছিল আহমদ মুসা। তার পাশে দাঁড়িয়ে যিয়াদ। তাদের সামনে ঝরনা। ঝরনার ওপারে পাহাড়, পাহাড়ের ওপারে একটা দুর্গম উপত্যকা।

যিয়াদ ওদিকে তাকিয়ে বলেছিল, ওই পাহাড়ের পারে ঐ যে উপত্যকা ওটাই ফ্যালকন অব স্পেন বশির বিন মুগীরার শেষ রণক্ষেত্র। গ্রানাডা পতনের পর বিদ্রহী মুসলমানরা এই পাহাড়, এই বনাঞ্চলেই সংঘবদ্ধ হয়েছিল বশির বিন মুগীরার নেতৃত্বে। বেশ কয়েকটা যুদ্ধে ফার্ডিল্যান্ডের বাহিনী পরাজিত হয়েছিল বশির বিন মুগীরার কাছে। বশীর বিন মুগীরার শেষ রণাঙ্গন ছিল এই উপত্যকা। এই যুদ্ধে মারাত্নকভাবে আহত হন বশির বিন মুগীরা। তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আনা হয়েছিল ঐ পাহাড়ের পাদদেশের একটা গ্রামে। মুসলিম স্পেনের শেষ মুজাহিদকে ওই গ্রামেই সমাহিত করা হয়। তাঁর আকাঙ্খা ছিলো, তাঁর শেষ শয্যা যেন রণক্ষেত্রেই হয়। আজও স্পেনের সব মুসলমানের গৌরবের তীর্থ ক্ষেত্র তাঁর কবর গাহ। যাবেন না মুসা ভাই আপনি সেখানে?

আহমদ মুসার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। বলল সে, ওখানে আহমদ মুসা যাবে না তো কে যাবে যিয়াদ। তিনি শুধু আমার প্রেরণা নন, তিনি আমার কাছে গৌরবজনক দৃষ্টান্ত।

যিয়াদ তারপর দক্ষিণ মুখি হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। দূরবীনটা আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলেছিল, দেখুন গোয়াদেলেজ নদী যেখানে সাগরে পড়েছে, সেখানে দেখুন ছোট্ট একটা নগরী, আদ্রা। সে সময় এখানে কোন নগরী ছিলো না। ছিল জংগল ঘেরা একটা ঘাটি। বশির বিন মুগীরার পরিবারের অসহায় কয়েকজন নারী অশ্রু জলে ভেসে নৌকায় উঠে স্পেন ত্যাগ করেছিল। জাবালুত তারিক আমাদের গৌরবের, কিন্তু এই সাগরতীর আমাদের কাছে কান্নার। ওখানে

দাঁড়ালে উপকূলে আছড়ে পড়া স্বচ্ছজলকে মনে হয় সেই অসহায়া নারীদের উপছে পড়া চোখের জল। বিষাদের ঐ তীরটায় আমরা কেউই যায় না মুসা ভাই। ঐ তীর আমাদের লাঞ্ছনার প্রতীক, অযোগ্যতার প্রতীক, সব হারানোর প্রতীক।

কাঁদছিল যিয়াদ।

চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল আহমদ মুসারও। মসজিদের ছাদ থেকে নেমে আহমদ মুসা এবং যিয়াদ, পেছনে পেছনে জোয়ান এবং রবার্তো, সেই ঝরনা পাড়ি দিয়ে সেই পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়েছিল সেই উপত্যকায় এবং সেই গ্রামে।

বশির বিন মুগীরার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রান্তরের দিকে চোখ তুলে আহমদ মুসার মনে হয়েছিল, সে যেন দেখতে পাচ্ছে বশির বিন মুগীরাকে। পরাজয় যখন আসন্ন, নিশ্চিত, সাথীরা যখন বিধ্বস্ত- বিশৃঙ্খল, যখন ঘোড়ার লাগাম টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে পেছনের দিকে ছোটার কথা, তখন বশির বিন মুগীরার ঘোড়া শত্রু ব্যূহ ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে শত্রুর ভেতরে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত বশীর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে।

বশীর বিন মুগীরার কবরটি সাধারণ। সবুজ মাটির উপর কবর। চারদিকে পাথর পুতে একটা সীমারেখা দাঁড় করানো হয়েছে মাত্র। কবরের শিয়রে একটা মিনার তুলেছিল মুসলমানেরা। স্পেনের খৃষ্টান বাদশাহ দ্বিতীয় ফিলিপ সেটা ভেঙে দেয়। এখনও সে মিনার ভাঙা ভিতটি দাঁড়িয়ে। ভিতের পাথরটির গায়ে একটা খোদাই করে লেখা এখনও জ্বল জ্বল করছে, ‘মুসলিম স্পেনের আশার শেষ প্রদীপটি এখানে ঘুমিয়ে।’

আহমদ মুসার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। সত্যিই শেষ প্রদীপটি এখানে শান্তিতে ঘুমিয়ে। বশীর বিন মুগীরার কবরটি ঘন ঝোপে ঢাকা। প্রকৃতির নিবিড় স্নিগ্ধ পরশে ঘুমিয়ে আছে শহীদ।

হাত তুলেছিল আহমদ মসা। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিল আল্লাহর কাছে, ’একদিন এই প্রান্তরে যে পতাকা ভূ-লুন্ঠিত হয়েছিল, তা কি আবার বীরদর্পে উড়বে না স্পেনের আকাশে? আল্লাহ সে সুদিন দাও স্পেনের জন্যে।’

যিয়াদ, জোয়ান ও রবার্তো পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমিন।

ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই ওরা ফিরে এসেছিল যিয়াদের বাড়িতে।

আজ ওরা মাদ্রিদ যাচ্ছে।

এবার জোয়ান ও রবার্তোর মত যিয়াদও আহমদ মুসার সাথী হচ্ছে।

যেহেতু যিয়াদরা বিপদে তাই আহমদ মুসা তাকে সাথে নিতে চায়নি। কিন্তু যিয়াদ তা মানতে রাজী হয়নি, এমনকি যিয়াদের মা চেয়েছে যিয়াদ আহমদ মুসার সাথী হোক।

আহমদ মুসা এবং জোয়ান ও রবার্তো প্রস্তুত হয়ে বসে আছে যিয়াদের পারিবারিক ড্রয়িং রুমে, বাড়ির ভেতরের অংশে।

যিয়াদ ড্রয়িং রুমে ঢুকে বলল, আম্মা এসেছেন মুসা ভাই।

ড্রয়িং রুম ও ভেতরের ঘরের মধ্যে তখন ভারী পর্দা। পর্দার ওপারে চেয়ারে এসে বসেছে যিয়াদের মা ফাতিমা এবং যিয়াদের স্ত্রী জোহরা। যিয়াদের মা'র দীর্ঘাঙ্গী আরবীয় লাল চেহারা, জোহরাও তাই।

'আম্মা, আমরা বিদায় চাচ্ছি, আমরা এখনি মাদ্রিদ যাত্রা করছি।'

পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

যিয়াদের মা বলল, 'যিয়াদের কাছে সব শুনেছি বাবা। আমি তোমাকে নিষেধ করতে পারবো না। কিন্তু খুব খুশি হতাম যদি তুমি আরও কটা দিন আমাদের মাঝে থাকতে।'

'আমিও খুশি হতাম আম্মা, মহান স্মৃতি বিজড়িত এখানকার বন ও পাহাড়ের এলাকা আমাকে যেমনটা আকর্ষণ করেছে, তেমনটা স্পেনের আর কিছুই আমাকে করেনি।' বলল আহমদ মুসা।

'বাবা, ফিরে আসবে না তুমি আবার ?' বলল যিয়াদের মা।

'বলতে পারবো না আম্মা, ঘটনা আমাকে কোথায় নিয়ে যায় বলতে পারি না।'

'কোরআন শরীফে আছে, ঈমানের উপর মানুষ যখন অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যের জন্যে ফেরেশতা পাঠান। তুমি ফেরেশতার মতই আমাদের মাঝে এসেছ। তুমি আমার ছেলের মত। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বে তুমি আমাদের নেতা। তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি

না, আমাদের অন্ধকার রাতের অবসান কবে হবে ? আমাদের পলাতক জিন্দেগীর ইতি কবে ঘটবে ?' বলল যিয়াদের মা আবেগ জড়িত কন্ঠে।

'এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, স্পেনের মুসলমানদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসছে। আগের জায়গা পৌঁছাতে হলে আমাদের আবার শূন্য থেকে কাজ শুরু করতে হবে।'

'এই কাজে তুমি থাকবে না বাবা?

'এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না আম্মা। কোন ডাকে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে বলতে পারি না।'

'আমি যিয়াদের কাছে সব শুনেছি। এমন অনিশ্চিত জীবন তো হতে পারে না বাছা, কোন ঠিকানায় তো তোমাকে দাঁড়াতে হবে।'

'গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা এখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছে। চারিদিকে তাদের হাহাকার, আর্তনাদ, আর মুক্তির আকুলতা। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়াবার অবকাশ কোথায় আম্মা?'

যিয়াদের আম্মা কেঁদে উঠল। বলল, 'আচ্ছা ! দুনিয়ার সব মুসলমান যদি এভাবে ভাবতো ! আল্লাহ তোমাকে, শতায়ু করুন বাবা।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, সব মুসলিম মা যদি আপনার মত হত , তাহলে ঘরে ঘরে জন্ম হতো তারিক বিন যিয়াদদের, ঘুচে যেত আমাদের দুঃখের অমানিশা।'

থামল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার বলল, 'আমাদের এবার যেতে দিন আম্মা।'

'সম্মানিত ভাইজান , আপনার কাছে আমাদের ঋণ শোধ হবার মত নয়। দোয়া ছাড়া আমাদের দেবার কিছু নেই।' ' কথা বলল জোহরা , যিয়াদ এর স্ত্রী।

'বোন , মুসলমানরা কাজ করে আল্লাহর জন্য, ঋণ যদি দেয় সেটা তাকেই দেয়। মুসলমানদের মধ্যে কোন ঋণের বাঁধন নেই। আসি বোন, আসি আম্মা।' ' বলে আহমদ মুসা সামনে বা বাড়াল।

তার সাথে জোয়ান ও রবার্টও।

পরে বের হয়ে এল যিয়াদ। চারজন বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বাড়ির সামনে চত্বরে দাঁড়িয়ে চারটি ঘোড়া। ওরা এগুলো ঘোড়ার দিকে। জোয়ান হাঁটছিল আহমদ মুসার পাশাপাশি।

'মুসা ভাই , আপনি যে বললেন স্পেনে শূন্য থেকে কাজ শুরু করতে ববে, সত্যিই কি ?' বলল জোয়ান।

'কেন হতাশ হচ্ছ ?'

'হতাশ নয় , ভাবছি দীর্ঘ পথের কথা।' '

'ইসলামে বিজয়ের কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই জোয়ান। ইসলাম প্রথমে বিপ্লব আনে মানুষের মনে। ব্যক্তির মানসিক বিপ্লব , মনের পরিবর্তন ছাড়িয়ে পড়ে তার কাজ -কর্মে , পাল্টে দেয় তার জীবন পদ্ধতি। ব্যক্তির এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ইসলাম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সংঘটিত করে। এই বিপ্লবের পথটা অবশ্যই দীর্ঘ হতে বাধ্য। '

'স্পেনের জন্য এই পথটা হবে কষ্টের।' ' বলল যিয়াদ।

'মহানবী (সঃ) - এর পথ -পরিক্রমার চেয়ে কষ্টের নয় নিশ্চয় যিয়াদ।' '

'ঠিক বলেছেন মুসা ভাই, আমার ভুল বুঝতে পারছি।' '

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল সবাই।

চলতে শুরু করল চারটি ঘোড়া।

তাদের গন্তব্য পশ্চিমে গ্রানাডা -মিত্রালি হাইওয়ের পাশে অলিভা শহর। ওখানে আছে রবার্তোর গাড়ি।

পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য।

সন্ধ্যার মধ্যে ৬০ মাইল দূরে অলিভায় তাদের পৌছতে হবে। দুর্গম পাহাড়ি পথ।

চার ঘোড়া সওয়ার তাদের চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা গাড়ি শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স-এর বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়াতেই গেট রুম থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিল।

বিরাট লোহার গেট , এ গেটের পাশ দিয়ে ছোট একটি দরজা। পায়ে চলা লোকেরা ও পথে যাতায়াত করে। গেট এর মাথাটা মিনারাকৃতি, পাথরের তৈরি। মিনারাকৃতির মাঝখানে পাথরের প্লেটে খোদায় করে আরবি ভাষায় , লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লেখা। গেটের ষ্টীলের নীল পাল্লায় অর্ধ চন্দ্র আঁকা।

উত্তর মাদ্রিদে ছোট একটা সবুজ টিলার উপর তৈরি শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সটি উঁচু প্রাচীর ঘেরা। একটাই গেট। গেট দিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ি প্রবেশ করল মসজিদ কমপ্লেক্সে।

লাল ইটের সুন্দর রাস্তা এগিয়ে গেছে কমপ্লেক্সর গাড়ি বারান্দার দিকে। রাস্তার দু'পাশে ফুলের বাগান। মসজিদ কমপ্লেক্স -বিল্ডিং এর চারিদিকে ঘিরে টিলা জুড়েই ফুলের বাগান। চারিদিকে বাগানের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট বাংলো সাইজের বাড়ি। ও গুলোতে প্রধান ইমাম, সহকারী ইমামগণ , মুয়াজ্জিনগণ এবং কমপ্লেক্সের কর্মচারীরা থাকেন।

টিলার শীর্ষ দেশে মূল্যবান সফেদ পাথরে তৈরি বাগান ঘেরা মসজিদ কমপ্লেক্সটির দৃশ্য অপরুপ। সৌদি সরকার স্পেন সরকারের অনুমতি নিয়ে টিলাটি কিনে মসজিদ কমপ্লেক্সটি নির্মাণ করেছেন। খরচ হয়েছে ৫০ মিলিয়ন ডলার। সর্ব প্রথম বাদশাহ ফয়সল আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে এ ধরনের একটি মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের। কিন্তু তিনি তার জীবদ্দশায় এ অনুমতি পাননি। পরবর্তীকালে তার স্বপ্ন সফল হয় এবং সৌদি সরকার বাদশাহ ফয়সলের নামেই এ মসজিদ কমপ্লেক্স এর নামকরণ করেন।

লাল ইটের রাস্তা ধরে আহমদ মুসাদের গাড়ি দিয়ে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দায়। মসজিদের বিশাল প্রশস্ত সিঁড়ির নিচে গাড়ি বারান্দা। সিঁড়ি উঠে গেছে দু'তলার লাইব্রারিতে এবং তিনতলায় অবস্থিত মসজিদে। গ্রাউন্ড ফ্লোর জুড়ে বিশাল হল ঘর। দু'হাজার আসন বিশিষ্ট এই হল ঘর শুধু মাদ্রিদ নয়, স্পেনের মধ্যে সর্ববৃহৎ। হলের সামনে এবং দু'পাশে কমপ্লেক্সের অফিস কক্ষ সমূহ। এখানেই প্রধান ইমাম, সহকারী ইমামগণ, মুয়াজ্জিনদেরও অফিস। দু'তলার

একপাশে লাইব্রারি এবং অন্য পাশে ইসলামিক স্কুল। এই স্কুলে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি কোরান , হাদিস, এবং ফেকাহ-এর উপর উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার শিক্ষকদের মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারসীজ এডুকেশন ফান্ড থেকে বেতন দেয়া হয়। লক্ষাধিক গ্রন্থ সম্বলিত লাইব্রেরীটিও স্পেনের একটি শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত। অঢেল পয়সা খরচ করে স্পেনসহ গোটা দুনিয়া থেকে দুর্লভ ও মূল্যবান বই জোগাড় করে এই লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়েছে। তৃতীয় তলা জুড়ে বিশাল মসজিদ , ৫ হাজার লোক এক সাথে এখানে নামায পড়তে পারে। তবে দুর্ভাগ্য , কয়েক শ'র বেশি লোক জুম্মার দিনেও এখানে হয় না। একে তো মুসলমান নেই বললেই চলে, অপরদিকে যাও আছে তারাও চিহ্নিত হবার ভয়ে মসজিদে আসে না। মসজিদকে কেন্দ্র করে যে ছোট মুসলিম কম্যুনিটি গড়ে উঠেছে তারাই এখানে নামায পড়ে। মসজিদের মুসল্লিদের মধ্যে বিদেশিদের সংখ্যাই বেশি। শুক্রবারের জামায়াতে মুসলিম দেশের কূটনীতিকরা আসেন। আর সব দিনই বিদেশী মুসলিম পর্যটকরা কিছু কিছু থাকেন। মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রাচীরের বাইরে দিয়ে মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে। এই মার্কেট মসজিদের স্থায়ী আয়ের উৎসই শুধু নয়, শ'খানেক মুসলিম পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থাও হয়েছে এর মাধ্যমে।

গাড়ি দাঁড়ালে প্রথমে নামল আহমদ মুসা। তারপর একে একে নামল যিয়াদ, জোয়ান এবং রবার্টও।

গাড়ি বারান্দার পরেই একটি করিডোর। করিডোরের বাঁ পাশে কাঁচের দেয়াল ঘেরা রিসেপশন কক্ষ। কক্ষে অনেকগুলো সোফা পাতা। একপাশে একজন লোক একটা ছোট টেবিলের পাশে বসে।

আহমদ মুসারা ঘরে প্রবেশ করতেই টেবিলে বসা লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

আহমদ মুসা সালাম গ্রহন করে তার দিকে এগুলো। রিসেপশনিস্ট দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, কি খেদমত করতে পারি আপনাদের?

'শাইখুল ইসলামের সাথে আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ৫ টায়।' বলল আহমদ মুসা।

'অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কে নিয়েছিলেন ?'

'যিয়াদ।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার একটু বসুন , আমি দেখছি।' ' ঘড়ির দিকে চেয়ে টেলিফোন হাতে তুলে নিতে নিতে বলল রিসেপশনিস্ট। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

টেলিফোনে কথা শেষ করে রিসেপশনিস্ট বলল, 'স্যার শাইখুল ইসলাম স্যার তার অফিসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তার পি, এস ছুটিতে আছেন, চলুন আমি পৌঁছে দেব।'

বলে রিসেপশনিস্ট ছেলেটি উঠে দাঁড়াল।

রিসেপশনিস্ট ছেলেটি আগে আগে চলল, পেছনে আহমদ মুসা, যিয়াদ , জোয়ান এবং রাবার্তো।

আঁকা-বাঁকা করিডোর ধরে আহমদ মুসারা এগিয়ে চলছিল। দু'পাশেই অফিস ঘর। গোটা কমপ্লেক্সে অফিস এই এক স্থানে। কিন্তু কোন অফিসে কোন লোক নেই। রিসেপশনিস্ট জানাল, অফিস সময় সকাল ৭টা থেকে ১ টা পর্যন্ত। '

আহমদ মুসা দেখল, সামনে একটা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে সে দাঁড়িয়ে যেন তাদেরই অপেক্ষা করছে।

রিসেপশনিস্ট বলল, 'একজন মুয়াজ্জিন।' '

'কয়জন মুয়াজ্জিন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'তিনজন।'

রিসেপশনিস্ট ছেলেটা সামনে ছিল।

সেই সালাম দিল মুয়াজ্জিন সাহেবকে।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, সালামের জবাব সুস্পষ্ট ভাবে শোনা যায় এমনভাবে উচ্চারিত হল না, মুয়াজ্জিন সাহেবের সব মনোযোগ যেন মেহমানদের দেখার কাজেই ব্যস্ত ছিল। আহমদ মুসা মনে মনে ভাবল, বেচারা এরা, বাইরের লোকের দেখা খুব কম পায় কিনা!

শাইখুল ইসলামের অফিসে তারা পৌঁছল।

আহমদ মুসারা বাইরে দাঁড়াল।

রিসেপশনিষ্ট দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে খোদ শাইখুল ইসলাম উঠে এসে দরজায় আহমদ মুসাদের স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

শাইখুল ইসলাম দীর্ঘদেহী মানুষ। মাথায় সাদা পাগড়ী। গায়ে সাদা জামার উপর সোনালী রঙয়ের আরবীয় আলখেল্লা জড়ানো। লাল গায়ের রং। বয়স ৪০ থেকে ৫০ এর মাঝখানে হবে। সুন্দর বিন্যস্ত কালো দাঁড়ি। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। চোখে-মুখে তারুণ্যের একটা তেজ।

নাম শাইখুল ইসলাম ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী। সেভিলের এক অখ্যাত শহরতলীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাদের পরিবারটি বাস করত উত্তরে পিরেনিজের পার্বত্য এলাকায়। উত্তর আফ্রিকায় হিজরতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের পরিবার ক্রমে দক্ষিণে এগুতে থাকে। পরিবারটি সেভিলে এসে যখন বাস করছিল সেই সময় আবদুর রহমানের জন্ম হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ হওয়ায় এবং জীবন-যাত্রা অনেকটা নিরাপদ দেখায় অবশেষে পরিবারটি সেভিলেই থেকে যায়। কিন্তু ছেলের মেধা দেখে আবদুর রহমানের পিতা আবদুর রহমানকে ১২ বছর বয়সে গোপনে মরক্কো পাঠিয়ে দেয়। প্রাথমিক শিক্ষা আবদুর রহমান মরক্কোয় লাভ করে। অত্যন্ত মেধাবী প্রমাণিত হওয়ায় মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে সেখানে পড়ার তার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আল-আজহার থেকে তিনি তাফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্রে এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হাদীস শাস্ত্র ও দাওয়া বিষয়ে অধ্যায়ন করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে তিনি অক্সফোর্ড থেকে ‘কনটেমপোরারী মিশনারী এ্যাকটিভিটিজ’ এর উপর ডক্টরেট লাভ করেন। মাদ্রিদে শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স তৈরী হবার পর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্সটি পরিচালনার সর্বময় দায়িত্ব দিয়ে তাকে মাদ্রিদে পাঠায়।

শাইখুল ইসলাম ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী মেহমানদের বসিয়ে নিজে আসন গ্রহণ করে বললেন, ‘আগে পরিচয়টা হয়ে যাওয়া দরকার। যিয়াদ কে?’

‘আমি যিয়াদ বিন তারিক।’ বলল যিয়াদ।

‘সান অব দি গ্রেট তারিক বিন যিয়াদ।’ হেসে বলল শাইখুল ইসলাম।

সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল যিয়াদের মুখে।

‘এক অর্থে সবাই তো আমরা পূর্বসুরীদের সন্তান।’ বলল আহমদ মুসা।

শাইখুল ইসলাম তাকাল আহমদ মুসার দিকে। পবিত্রতা ও অসাধারণ প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল তার মুখে শাইখুল ইসলামের চোখ দু’টি যেন আটকে গেল মুহূর্তের জন্যে। বলল শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসার মুখে চোখ রেখেই, ‘সন্তান বটে, যোগ্য সন্তান নই।’

‘যোগ্য সন্তানের জন্যে যোগ্য পিতাও চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক ইয়ংম্যান, কিন্তু সন্তানের কি কোন দোষ নেই?’

‘আছে, সেটা কর্তব্য না করার। কিন্তু সর্বব্যাপি যে দুর্ভাগ্য তাদের ঘিরে ধরেছে এর জন্যে তারা দায়ী নয়।’

শাইখুল ইসলামের চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ ইয়ংম্যান, আসুন আমরা পরিচিত হই, তারপর আপনাদের কথা শুনব।’

যিয়াদ টেবিলের এক প্রান্তে বসেছিল। সেই-ই প্রথম পরিচয় দিতে এল। বলল, ‘আমি যিয়াদ বিন তারিক, আগেই জেনেছেন। আমি থাকি সিয়েরা নিবেদার পাহাড়ে। আমরা.........’

যিয়াদকে থামিয়ে দিয়ে শাইখুল ইসলাম বললেন, ‘আপনি সেই যিয়াদ? ‘ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট’ এর যিয়াদ?’

‘জি, হ্যাঁ।’ বলল যিয়াদ।

শাইখুল ইসলামের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়াল যিয়াদের দিকে। আবার উষ্ণ হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, তিনি আমার এক আশা আজ পূর্ণ করলেন। আমি আপনাকে কত যে খুঁজেছি। দুইবার লোক পাঠিয়েছি গ্রানাডায়, কিন্তু কোন সন্ধান তারা পায়নি।’

থামল শাইখুল ইসলাম। থেমেই আবার বলল, ‘জানেন, আপনাকে ‘ফ্যালকন’ বলে ডাকা হয়?’

‘জানি, তারা আমার উপর অনেক আশা করে, কিন্তু উপযুক্ত আমি নই।’

'বশীর বিন মুগীরার পর আপনিই মানুষের মনে আশার আলো জ্বেলেছেন। কিছু করা যায়, এ চিন্তাও মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল। আপনি হতাশার এই অন্ধকারে সাহসের একটা আলো প্রজ্বলিত করেছেন, যত ক্ষুদ্রই তা হোক।'

'ধন্যবাদ শাইখ' বলে যিয়াদের পাশে উপবিষ্ট জোয়ানের দিকে ইংগিত করে বলল, 'ইনি জোয়ান ফার্ডিন্যান্ড। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বিজ্ঞানী। মুসলিম নাম 'মুসা আবদুল্লাহ'।'

'না, পরিচয় সম্পূর্ণ হলো না, ইউরোপীয় বিজ্ঞান পদক লাভ করেছে, এবার অনার্সে প্রথম না হয়ে দ্বিতীয় হয়েছে, মরিস্ক বলে' বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছে, বসত বাটিও হারাতে হয়েছে, সেই জোয়ান তো?' গম্ভীর কন্ঠে বলল শাইখুল ইসলাম।

'শাইখ দেখছি সবই জানেন।' বলল যিয়াদ।

'কোন সাহায্য কাউকে না করতে পারি, এটুকু খোঁজ না রাখলে আল্লাহর কাছে জি জবাব দেব?' বলে উঠে দাঁড়িয়ে শাইখুল ইসলাম হাত বাড়িয়ে দিল জোয়ানের দিকে। জোয়ানের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, 'তোমার আমি সন্ধান করেছি বৎস, কিন্তু নতুন ঠিকানা জানতে পারিনি। সন্ধান এখনও চলছে। খুব খুশী হলাম তোমার দেখা পেয়ে।'

'ধন্যবাদ স্যার, আমাদের মত হতভাগ্যের কেউ এভাবে খোঁজ করতে পারে ভাবিনি। খুশী হলাম স্যার।' বলল জোয়ান।

জোয়ানের পরেই বসে ছিল আহমদ মুসা।

যিয়াদ বলল, 'শাইখুল ইসলাম স্যার, এবার আপনার সাথে এমন ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেব যে, আপনি খুশী হবেন, খুব খুশী হবেন।'

'কেন আপনাদের সাথে পরিচয়ে খুশী হইনি বুঝি!' হেসে বলল শাইখুল ইসলাম।

'জি না, শাইখ, এ খুশী ভিন্ন স্বাদের। এমন খুশীর মুহূর্ত কচিত কারো ভাগ্যে জোটে।'

'আলহামদুলিল্লাহ, বলুন মিঃ যিয়াদ।' আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল শাইখুল ইসলাম।

'ইনি আমাদের সম্মানিত ভাই, বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের মহান বন্ধু, মহান নেতা আহমদ মুসা।'

শাইখুল ইসলামের চোখে-মুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিস্ময়ের একটা প্রচন্ড জোয়ার গিয়ে তার চোখে-মুখে আছড়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত সে কথা বলতে পারলো না। রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে সে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপরেই সে লাফিয়ে উঠল আসন থেকে। বলল, 'আহমদ মুসা! আহমদ মুসা!!

মিলে যাচ্ছে, আমি ফটোতে দেখেছি, থিক মিলে যাচ্ছে।' বলে আসন থেকে ছুটে এল শাইখুল ইসলাম।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

শাইখুল ইসলাম এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আমার কি সৌভাগ্য! যাঁকে মদীনায় কাছে পেয়েও দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তাঁকে এভাবে এখানে দেখতে পাব, তা অসম্ভব একটা আশা। আল্লাহর অশেষ করুণা।'

আনন্দে আবেগে শাইখুল ইসলামের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে লাগল।

শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসাকে অনেক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখলেন। তার এই আবেগের কাছে আহমদ মুসা বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কি বলবে বুঝতে পারছিল না।

তারপর আহমদ মুসাকে বসিয়ে আসনে ফিরে গেল শাইখুল ইসলাম। বসে রুমালে চোখ মুছে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'জনাব, আপনি ফিলিস্তিন থেকে মিন্দানাওয়ের দিকে যাবার পথে মদিনা শরিফ গিয়েছিলেন। আমরা আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, একটা সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলাম, কিন্তু সময় কম হওয়ায় সেটা বাতিল হয়ে যায়। আপনার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আর হয়নি।'

'আপনি বয়সে বড়, শিক্ষক তুল্য। এভাবে কথা বললে আমি বিব্রত বোধ করি জনাব।' নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'বয়স এবং পেটভরা নিস্ক্রিয় বিদ্যার কোন মূল্য আল্লাহর কাছে নেই জনাব আহমদ মুসা। মুজাহিদ হওয়া মুমিনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এই মুমিনরা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী।'

‘কলম দিয়েও জিহাদ হয়, জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমেও জিহাদ হয়। আপনি সে জিহাদ করছেন।’

‘যখন চারদিক থেকে মজলুমের কান্না ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, তখন সেটা কলমের জিহাদ আর জ্ঞান বিতরণের জিহাদের সময় নয় জনাব।’

‘ঠিক, তবে সুযোগ একটা বড় শর্ত। সুযোগ এলে আমি মনে করি কলমের যুদ্ধ যারা করছেন, তারা কলম নিয়ে বসে থাকবেন না অবশ্যই।’

‘এটাই আমাদের সান্ত্বনা জনাব, কিন্তু ভয় হয় এই সান্ত্বনায় থেকে আমরা পরকালীন মুক্তি পাব কিনা। থাক, আপনি বলুন, আপনি স্পেনে কিভাবে, কবে এসেছেন? গোটা বিষয়টা আমার কাছে এখনও স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।’

প্রশ্নের উত্তর দিল জোয়ান।

সে সংক্ষেপে আহমদ মুসার মাদ্রিদ বিমান বন্দরে নামার পর মারিয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে যিঅদের মা ও স্ত্রীকে উদ্ধার পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

শাইখুল ইসলাম ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী মুর্তির মত বসে গোগ্রাসে গিলছিল কথাগুলো।

জোয়ানের কথঅ শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষন কথা বলল না শাইখুল ইসলাম। যেন কথাগুলো হজম করা এখনও তার শেষ হয়নি।

অবশেষে ধীরে ধীরে মুখ খুলল। বলল, ‘ইতিমধ্যেই এত কিছূ ঘটে গেছে! ইতিমধ্যেই দু’দুবার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বন্দীখানায় গেছেন তিনি?’

একটু থামল। গলাটা একটু পরিষ্কার করল শাইখুল ইসলাম। তারপর আবার শুরু করল, ‘জনাব আহমদ মুসা, দেখুন আপনি ক’দিন হলো এসেছেন, এর মধ্যেই পুরো সংঘাত শুরু হয়েছে শত্রুদের সাথে আপনার। কিন্তু আমি আজ দশ বছর এখানে, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি। এর অর্থ কি? সত্যিই কি আমি পুরোপুরি ইসলামের উপর আছি?’

‘আপনার এই আবেগকে’, বলল আহমদ মুসা, ‘আমি শ্রদ্ধা করি জনাব। কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে দেখতে হবে, আপনি যা করছেন সেই দায়িত্ব নিয়েই আপনি মাদ্রিদে এসেছেন আর আমি যে ধরনের কাজ নিয়ে এসেছি, সেই ধরনের কাজেই আমি জড়িয়ে পড়েছি।’

‘আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে একজন মানুষ বা একটি সংস্থা। কিন্তু মুমিন হিসেবে আল্লাহর দেয়া কোন দায়িত্ব কি আমার উপর নেই?’

‘আছে।’ বলল আহমদ মুসা।, ‘কিন্তু সে দায়িত্ব বলে না খালি হাতে একা শত্রুর ব্যুহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, বরং বলে শত্রুর উপর বিজয়ী হবার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে।’

শাইখুল ইসলাম হাসল। বলল, ‘আপনার সাথে পারবো না আমি, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে রহম করুন, আল্লাহ আপনাকে আরও বরকত দিন। এখন বলুন, আপনি কি কাজ নিয়ে স্পেনে এসছেন, যে কাজের কথা আপনি বললেন।’

‘জনাব সেটা বলার জন্যেই এসেছি।’ বলে আহমদ মুসা একটু থামল। তারপর যুগোশ্লাভিয়ায় পাওয়া ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের দলিলে তেজষ্ক্রিয়ের মাধ্যমে শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্সসহ স্পেনের সকল মুসলিম পূরাকৃর্তী ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা রয়েছে তার বিবরণ দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আমি এখানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় তাদের সাথে কথায় নিশ্চিত হয়েছি, এ ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে।’

শুনতে শুনতে শাইখুল ইসলামের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। কপাল কুঞ্চিত হলো, তার সজীব ঠোঁট শুকিয়ে উঠল।

‘অর্থাৎ তারা স্পেন থেকে মুসলমানদের সকল স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলতে চায়।’ শুকনো কন্ঠে বলল শাইখুল ইসলাম।

‘জি হ্যাঁ, তাই। স্পেন থেকে সকল মুসলিম স্মৃতিচিহ্ন তারা মুছে ফেলতে চায়, সেই সাথে মুসলমানরো যেন স্পেনে আর কিছু না করতে এগিয়ে আসে, সে কথাও বলে দিতে চায়।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামল। আর কেউ কিছু বলল না। সবাই নিরব।

‘ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন’, উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলতে শুরু করল শাইখুল ইসলাম, ‘যদি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে এই শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্সসহ সবগুলো মুসলিম স্মৃতি সৌধে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের কাজ শুরু হেয় গেছে। আইম তো মনে করি মানুষও এখানে নিরাপদ নয়।’

‘জি হ্যাঁ, আমি যে কথা বলিনি। এই তেজষ্ক্রিয়ের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এবং আশে-পাশের লোকদের বংশ-বৃদ্ধি লেআপ পেয়ে যাবে এবং কালক্রমে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মুসলিম কম্যুনিটি।’

বিস্ফোরিত হয়ে উঠল শাইখুল ইসলামের চোখ। বলল, ‘এত গভীর, এত জঘন্য ষড়যন্ত্র?’

একটু থামল। ঢোক গিলল। তারপর আবার বলল, ‘এখন এই অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা কিভাবে সম্ভব?’

‘এই পরামর্শের জন্যেই এসেছি জনাব। আমাদের জোয়ান পদার্থ বিজ্ঞানী। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের উপরই তার গবেষণা। সে বলছে, এই বিশেষ ধরনের তেজষ্ক্রিয় ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না। এই ডিটেকশনের জন্যে দরকার ‘ম্যাটেরিয়াল এ্যানালঅইসিস’। কিন্তু স্পেনে এটা পারা যাবে না। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা কিছু আছে, কিন্তু ওখান থেকে কোন সহযোগিতা নেয়া নিরাপদ নয়। তাই ঠিক করেছি জোয়ানকে ইটালীয় ট্রিয়েষ্টে ডঃ আবদুস সালামের প্রতিষ্ঠিত গবেষনাগারে পাঠাব। আমি ফিলিস্তিনের মাহমুদ কে বলে দিলে সে ট্রিয়েষ্টে যোগাযোগ করে সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমরা গ্রানাডা, কর্ডোভা, মালাগা থেকে স্যাম্পল পেলেই জোয়ানকে ট্রিয়েষ্টে পাঠাতে পারি।’

থামল আহমদ মুসা।

‘ডিটেকশন হওয়ার পর কি হবে?’ জিজ্ঞাসা করল শাইখুল ইসলাম।

‘তেজষ্ক্রিয়ের প্রকার-প্রকৃতি চিহ্নিত হবার পর এর প্রতিষেধক যোগাড় করতে হবে। এ ব্যাপারেও আমরা ট্রিয়েষ্টের সাহায্য পাব আশা করছি।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। কোত্থেকে স্যাম্পল আপনারা নেবেন, নেবার ব্যবস্থা করুন।’

‘ভিত্তি অংশ থেকে একটুকরো এবং বিল্ডিং এর উপরের অংশ থেকে এক টুকরো কংক্রিট হলেই চলবে। বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে শাইখুল ইসলাম ইন্টারকমে একজনকে নির্দেশ দিল আশফাক আমিনকে পাঠাও, সেই সাথে বলল, নাস্তা রেডী কিনা। ‘শুকরান’ বলে

টেলিফোন রেখে দিল। 'আশফাক আমিন কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি অফিসার। তাকে বলে দিচ্ছি, এখনি দুই খন্ড কংক্রিট যোগাড় করে দেবে।'

'ষড়যন্ত্রের বিষয়টা এবং আমাদের পরিচয় অন্য কাউকে এই মুহূর্তে আমরা জানতে দিতে চাই না জনাব।' বলল আহমদ মুসা

'এটাই ঠিক।'

ঘরে প্রবেশ করল সুঠাম দেহী এক যুবক।

'আশফাক এস, কেমন আছ তুমি?' স্নেহের স্বরে বলল শাইখুল ইসলাম।

'ভাল আছি স্যার।' বিনীত কন্ঠ আশফাকের।

'তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে আশফাক। আমাদের বিল্ডিং এর ভিতের অংশ এবং বিল্ডিং এর উপরের কোন জায়গা থেকে এক খন্ড করে কংক্রিটের টুকরো যোগাড় করে দিতে হবে। পারবে না?'

'পারব স্যার।'

'ঠিক আছে আমরা নাস্তায় যাচ্ছি, তুমি ইতিমধ্যে চেষ্টা কর।

'ঠিক আছে স্যার।' বলে আশফাক পা বাড়াল যাবার জন্যে।

'জনাব, আমি আশফাকের সাথে যেতে চাই।' বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

'কিন্তু নাস্তা..।'

'ওঁদের নিয়ে আপনি যান, আমি এসে নাস্তা করব।'

শাইখুল ইসলাম ভাবল, আহমদ মুসার মত লোক বিনা প্রয়োজনে, বিনা কারনে কিছু করে না। বলল আশফাককে উদ্দেশ্য করে, 'ইনি আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত মেহমান, তুমি নিয়ে যাও সাথে। তোমাকে সাহায্য করবেন।'

আহমদ মুসা ও আশফাক শাইখুল ইসলামের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আগে চলছিল আশফাক, পেছনে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা দেখল, যে পথ দিয়ে এ কক্ষে তারা এসেছিল সে কক্ষ দিয়েই তারা এগুচ্ছে।

সেই মুয়াজ্জিন সাহেবের দরজার সামনে দিয়ে এগুচ্ছিল আহমদ মুসারা। আহমদ মুসা দেখল, এবারও মুয়াজ্জিন সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে। দরজা বরাবর আসতেই মুয়াজ্জিন সাহেবই এবার সালাম দিল মনে হল, তাদেরই জন্যে সে

দরজায় অপেক্ষা করছিল। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, আহমদ মুসারা আসছে তা সে জানল কি করে!

দুই টুকরো কংক্রিট যোগাড় করে ফিরছিল আহমদ মুসা এবং আশফাক আমিন রিসেপশন রুমের সামনে দিয়ে।

রিসেপশনিস্ট কান থেকে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, একটা ফোন স্যার, আপনাদের, খুব জরুরী।

'টেলিফোন' আমাদের নামে এখানে! মনে মনে চমকে উঠল আহমদ মুসা তবু ছুটল টেলিফোন ধরার জন্যে।

'হ্যালো' রিসিভার তুলে নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'আমি জোয়ানের বন্ধু'।' ওপার থেকে ইংরেজী ভাষায় উত্তর এল। কন্ঠ শুনেই চিনতে পারলো জেনের গলা। বুঝতে পারল নাম গোপন রাখতে চাচ্ছে। আহমদ মুসাও বলল, আমিও জোয়ানের বন্ধু, তোমাকে চিনতে পেরেছি। জরুরী কিছু?

'খুবই জরুরী', ওখান থেকে আপনাদের কথা ওদেরকে কেউ জানিয়েছে, ওরা যাচ্ছে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ বোন, চিন্তা করোনা। রাখি।' বলে টেলিফোন রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। তার মুখ গম্ভীর, চিন্তা করছে। এখান থেকে আমাদের কথা কে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে জানাল! এই কথা শোনার সময় থেকেই বার বার তার সামনে ভেসে উঠছে ঐ মুয়াজ্জিনের মুখ।

'কোন খারাপ খবর স্যার?' বলল আশফাক আমিন।

আহমদ মুসা হেসে আশফাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি তোমাকে একটা হুকুম দেই পালন করবে?'

'জি স্যার।'

'চল, বলে আগে চলল আহমদ মুসা। পেছনে আশফাক।

সেই মুয়াজ্জিনের ঘরের সামনে দাঁড়াল আহমদ মুসা। আশফাকও তার পাশে এসে দাঁড়াল। 'মুয়াজ্জিন সাহেব কি এখনো ঘরে?' আশফাকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘দেখতে হবে।’ বলে আশফাক দরজায় নক করতে গেল।

আহমদ মুসা হাত তুলে তাকে নিষেধ করে বলল, ‘কি করতে হবে আগে শুন।’

‘কি করতে হবে, বলুন।’

‘মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘর সার্চ করতে হবে।’

‘সার্চ করতে হবে, কেন?’ চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল আশফাক।

এই সময় নাস্তা সেরে ফিরছিল শাইখুল ইসলাম এবং যিয়াদরা।

আশফাক ছুটে গেল শায়খুল ইসলামের কাছে। তাকে জানাল আহমদ মুসার কথা। শুনে শায়খুল ইসলামের চোখও বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। ইশারায় ডাকল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা গেল।

‘কিছু ঘটেছে?’ জিজ্ঞাসা করল শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসাকে।

‘ঘটেছে। বলব। মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরে কোন টেলিফোন আছে?’

‘না, নেই।’ বলল শাইখুল ইসলাম।

‘রিসেপশান ছাড়া নিচের তলায় আর কোথায় টেলিফোন আছে?’

‘আমার পি, এস, এর রুমে আছে এবং আমার রুমে আছে।’

‘আমার মনে হয়, মুয়াজ্জিন সাহেবের রুমে ওয়্যারলেস সেট আছে।’ এখনই সার্চ হওয়া দরকার।’

মুহুর্ত কয়েক আহমদ মুসার দিকে বিস্ময়ের সাথে চেয়ে থেকে আশফাককে বলল, ‘যাও উনি যা বলেছেন তা কর।’

আশফাক মুয়াজ্জিনের ঘরের দিকে চলে গেল।

সবাই ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। ওখান থেকে মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরের দরজা দেখা যায়।

আশফাক মুয়াজ্জিনের ঘরে ঢুকার কয়েক মুহূর্ত পরেই কথা কাটাকাটির শব্দ পাওয়া গেল। তার পরেই দেখা গেল আশফাককে হাত উপরে তুলে পিছু হটে বাইরে আসতে। মুয়াজ্জিনের হাতে পিস্তল, উদ্যত আশফাকের বুক বরাবর।

মুয়াজ্জিন সাহেব বাইরে বেরিয়েই দেখতে পেল শায়খুল ইসলাম এবং আহমদ মুসাদের। দেখতে পেয়েই ডান হাতের পিস্তলটা আশফাকের দিকে উদ্যত রেখেই বাম হাতটা সে চোখের পলকে পকেটে ঢুকাল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল, মুয়াজ্জিন নিশ্চয় দ্বিতীয় রিভলবার বের করতে যাচ্ছে, অথবা গ্রেনেড, নয়তো আরও বড় কিছু।

আহমদ মুসা আগেই রিভলবার বের করে নিয়েছিল। রিভলবার মুয়াজ্জিনের দিকে তুলে ধরে বলল, পকেট থেকে হাত বের করবেন না। মাথাগুড়ো হয়ে ...

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই মুয়াজ্জিনের পিস্তল আশফাকের দিক থেকে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাও তার কথা মুখে রেখেই রিভলবারের ট্রিগারে রাখা আঙুলে চাপ দিল। ছুটে যাওয়া গুলি গিয়ে মুয়াজ্জিনের ডান হাতটা বিদ্ধ করল, তার বিধ্বস্ত হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল। কিন্তু তার বাম হাত তবু পকেট থেকে বেরোলই। আশফাক তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুয়াজ্জিন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে পাশে দু'ধাপ সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই বাম হাতটি উপরে তুলল। তার হাতে গ্রেনেড। কিন্তু হাত নিচে নেমে আসার আগেই আহমদ মুসার দ্বিতীয় গুলি তার বাম বাহু ভেদ করল। গ্রেনেডটি তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু বিস্ফোরিত হল না। সম্ভবতঃ পিন তখনও খোলা হয়নি।

মুয়াজ্জিন বসে পড়েছে।

বসে পড়েই সে তার বাম বাজুতে কাপড়ে ঢাকা কি একটা কামড়ে ধরেছে।

আঁতকে উঠল আহমদ মুসা। ছুটে গেল তার কাছে, কিন্তু ততক্ষনে ঢলে পড়েছে মুয়াজ্জিনের দেহ।'

আহমদ মুসা দেখল, প্রান নেই মুয়াজ্জিন সাহেবের দেহে। বাম বাহুর যে জিনিসটি সে কামড়ে ধরেছিল, সেটা পরীক্ষা করে দেখল, সায়নাইড ক্যাপসুল।

শায়খুল ইসলাম এবং অন্যান্যরাও এসে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার পেছনে।

'ধরা পড়তে না হয় এ জন্যে পটাসিয়াম সাইনাইডের ব্যবস্থাও রেখেছিল? তাহলে সে 'সুইসাইড স্কোয়াডের' লোক!' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল শায়খুল ইসলাম। একটা আতংক এসে তার মুখ ছেয়ে ফেলেছে।

'জি জনাব, এ নিশ্চিতভাবেই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্লানের সুইসাড স্কোয়াডের এজেন্ট।' উঠে দাঁড়িয়ে বলল আহমদ মুসা।

শায়খুল ইসলাম কিছুই বলল না। তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে চোখে রাজ্যের আতংক ও উদ্বেগ নিয়ে।

'আসুন জনাব মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরে আরও কিছু পাওয়া যাবে, বলে আহমদ মুসা পা বাড়াল মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরের দিকে।

পেছনে পেছনে শায়খুল ইসলাম সহ সবাই।

ঘরে বালিশের তলায় পাওয়া গেল ক্ষুদ্র অয়্যারলেস সেট। দেখেই বুঝল আহমদ মুসা, অয়্যারলেস সেট ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পাওয়ারফুল। হাতে নিয়ে সেটটির এ্যান্টেনা টেনে লম্বা করে বলল , শাইখুল ইসলাম এই ওয়্যারলেসটির মাধ্যমেই সে আমাদের আগমনের খবর বাইরে পাঠিয়েছে।'

মুয়াজ্জিন সাহেবের খাটিয়ার নিচে পাওয়া গেল একটি রেডিও রেকর্ডার। রেকর্ডার টি বিশেষ ধরনের। ২৪ ঘন্টা রেকর্ডার চললেও ভেতরের একটা ক্যাসেটই তা কভার করতে পারে।

আহমদ মুসা রেকর্ডার হাতে নিয়ে বিস্মিত হলো, রেকর্ডারটি তখনও চলছে।

'কি রেকর্ড করছে রেকর্ডার?' নিজের মনকে নিজেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'রেকর্ডার চলছে, কিছু রেকর্ড করছে জনাব।' শাইখুল ইসলামের দিকে কথা কয়টি বলে আহমদ মুসা রেকর্ডারটির 'রিভার্স' বোতামটি টিপে দিল। কিছুদূর ব্যাকে নিয়ে প্লেয়ার স্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

কিছুটা ফাঁকা, তারপরই শুরু হলো কথা। প্রথমেই কন্ঠস্বর শাইখুল ইসলামের। তিনি বলছেন, 'আগে পরিচয়টা হয়ে যাওয়া দরকার, যিয়াদকে?' তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলতে লাগল শাইখুল ইসলাম ও আহমদ

মুসাদের মধ্যেকার কথোপকথনের রেকর্ড। মাঝখানে প্লেয়ার বন্ধ করে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'চলুন আপনার টেবিলে কোথাও রেডিও ট্রান্সমিটার পাতা আছে।'

শাইখুল ইসলামের টেবিলে পরীক্ষা করে দেখা গেল টেবিলের পেন স্ট্যান্ডের পেন হোল্ডারের মেটালিক বোর্ডটাই একটি রেডিও ট্রান্সমিটার। আহমদ মুসা কলম স্ট্যান্ডটি ভেঙে ট্রান্সমিটারটি বের করে আনল। বলল, এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে শাইখুল ইসলামের অফিসের যাবতীয় কথা মুয়াজ্জিন রুপী ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের এজেন্টটি রেকর্ড করতো এবং প্রয়োজনীয় সব তথ্য সে পাঠিয়ে দিত ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কাছে। আজকে আমাদের পরিচয়টা সে ওদের কাছে পাঠিয়েছে, জানিনা আমাদের সব কথা সে পাঠিয়েছে কিনা।

হতবুদ্ধি ও বিহব্বল হয়ে পড়েছিল শাইখুল ইসলাম। তার ভাবনা, এত বড় শত্রুকে পাশে নিয়ে সে চলেছে। তার সব কথা শত্রুরা জেনে ফেলেছে। এই মুয়াজ্জিন স্পেনের মিসরীয় দুতাবাসে আরবী অনুবাদকের কাজ করত তার আরবী জ্ঞান, কেরায়াত দেখে এবং মিসরীয় দুতাবাসের সুপারিশে তাকে মুয়াজ্জিন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। শাইখুল ইসলামের মন বেদনায় ভরে গেল, কমপ্লেক্সের এতগুলো লোক এত দিনেও তার ষড়যন্ত্রের কিছুই ধরতে পারেনি, সামান্য সন্দেহও কারও মনে জাগেনি। সেই সাথে শ্রদ্ধায় নুয়ে গেল তার মন, আহমদ মুসা কমপ্লেক্সে পা দেবার সংগে সংগেই সে ধরা পড়ে গেল। মুখ একটু উপরে তুলে বলল শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসার দিকে চেয়ে, আল্লাহর হাজার শুকরিয়া, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আল্লাহ আপনাকে বিস্ময়কর চোখ আর বিস্ময়কর বুদ্ধি দিয়েছেন। যাকে আমরা এক দশকেও ধরতে পারিনি, তাকে আপনি একবার দেখেই ধরে ফেললেন!' বলবেন কি দয়া করে, কি দেখে আপনার সন্দেহ হয়েছিল?'

'এখানে আসার পর ওর সাথে দু'বার ওর সাথে দেখা হয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য ওর অপেক্ষা করা এবং তার দৃষ্টিকে আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। তার সম্পর্কে মনে একটা সন্দেহর সৃষ্টি হয়েছিল। তার উপর আশফাকের সাথে ফেরার পথে রিসিপশনে জোয়ানের সহপাঠি জেনের কাছ

থেকে টেলিফোন পেলাম যে, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আমাদের এখানে আসার খবর জানতে পেরেছে এবং এখানে ওরা আসছে, তখন আমি নিশ্চিত হলাম, ঐ মুয়াজ্জিনই খবর দিয়েছে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে।

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কি কমপ্লেক্সে আসছে?' মুখ কালো করে জিজ্ঞাসা করল শাইখুল ইসলাম।

'আমি নিশ্চিত ওরা আসছে।'

'পুলিশকে কি খবর দেব?' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল শাইখুল ইসলাম।

'জানিনা, পুলিশ কি আপনাকে সাহায্য করবে, না ওদের সাহায্য করবে? তাছাড়া মুয়াজ্জিন আহত হওয়া, মারা যাওয়ার কি ব্যাখ্যা দেবেন পুলিশকে। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এই ঘটনা থেকে ফায়দা উঠানোর সুযোগ গ্রহন করবে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে?' অসহায় কন্ঠ শাইখুল ইসলামের।

'কমপ্লেক্সের ভিতরে কিছু ঘটুক আমরা চাইনা জনাব, আমরা চলে যাচ্ছি।'

একটু ম্লান হাসল শাইখুল ইসলাম। বলল, জনাব, আমি কমপ্লেক্স নিয়ে ভাবছি না, আপনাদের নিরাপত্তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় এখন।'

একটু থামল শাইখুল ইসলাম। আবার বলল, 'আপনারা চলে যাবেন কেমন করে, ওরা নিশ্চয় এতক্ষণে বে্রুবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।'

'পথে পা দিলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আল্লাহর সাহায্য আসবে।'

'একটা পথ আছে, মুখ উজ্জল করে বলল শাইখুল ইসলাম, 'আমাদের পশ্চিম প্রচীরের মার্কেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের যে ষ্টোর আছে, তার সাথের প্রাচীরের ওপারের মার্কেট অফিসের যোগাযোগের জন্যে প্রচীরে একটা দরজা আছে। বাইরের থেকে সে দরজা দেখা যায় না। ঐ পথ দিয়ে গেলে কাকপক্ষিও টের পাবে না।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে, যিয়াদ, জোয়ন এবং রবার্তো তোমরা ঐ পথে চলে যাও।'

'আপনি?' বলল জোয়ান।

‘আমাকে সদর দরজা দিয়েই বের হতে হবে ?’

‘কেন ?’ বলল শাইখুল ইসলাম।

‘আমি ওদের টার্গেট, আমাকে বের হতে না দেখলে ওরা ভেতরে ঢুকে আমাকে খোঁজার জন্যে গোটা কমপ্লেক্স তছনছ করবে এবং আমার সাথে কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের যোগসাজস আছে বলে ধরে নেবে। এতে কমপ্লেক্সের ক্ষতি হবে।’

‘তাহলে আমরা সবাই একসাথে সদর গেট দিয়ে বেরোব।, বলল যিয়াদ।

‘যখন পথ আছে, তখন সবাই এক সাথে বিপদগ্রস্থ হয়ে লাভ নেই। তাছড়া এখানে কারা আমার সাথী, এটা আমি তাদের জানতে দিতে চাই না। কাজের এতে সুবিধা হবে।’

‘আপনার যুক্তি ঠিক, ’ বলল শাইখুল ইসলাম, ‘কিন্তু শত্রুর শক্তি সম্পর্কে না জেনে একা তাদের মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে ?’

‘বেশী পরিমাণ লোক দেখলে ওরা বেশী পরিমাণ সতর্ক ও আক্রমনাত্মক হবে। আর একা একজনকে দেখলে ওদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা ‘অতি আত্মবিশ্বাসের’ ভাব সৃষ্টি হবে যা আমাকে সাহায্য করবে।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। শাইখুল ইসলামকে লক্ষ করে বলল, ‘জনাব ওদের যাবার ব্যবস্থা করুন। আমি এখুনি এখান থেকে বেরুতে চাই।’

শাইখুল ইসলাম সহ যিয়াদ, জোয়ান, রবার্তো সবাই উঠে দাঁড়াল। যিয়াদ, জোয়ান, রবার্তোর মুখ ভার। বুঝাই যাচ্ছে, আহমদ মুসার সিদ্ধান্তে ওরা সন্তুষ্ট হয়নি।

আহমদ মুসা তার দু’হাত যিয়াদ ও জোয়ানের কাঁধে রেখে বলল ‘তোমরা মন খারাপ করো না। আমার কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ। আর চিন্তার কিছু নেই। ওরা জানে যে, ওদের ওঁৎ পেতে থাকার ব্যাপারটা আমরা জানি না, সুতরাং অপ্রস্তুত অবস্থায় ফাঁদে পা দেব কিন্তু আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় যাচ্ছি না। অতএব ঘটনার নিয়ন্ত্রণটা আমার হাতে থাকবে।

শাইখুল ইসলাম আনন্দ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। তার মনে বিস্ময়, প্রতিটি বিষয়ের দিকে আহমদ মুসার এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। সাথীদের

প্রতি তার এত দরদ এবং তাদের নিরাপত্তার প্রতি তাঁর এত সতর্কতা। পরিস্থিতির এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ সে করে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলে শাইখুল ইসলাম বলল, 'আল্লাহ আপনার সহায় হোন। এঁদের আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি বলুন, 'আপনার সাথে আবার কবে দেখা হবে কিংবা কিভাবে যোগাযোগ হবে। আমাদেরকে চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে হবে।'

'সমানভাবে আমরাও উদ্বিগ্ন জনাব, আমরাই যোগাযোগ করব।'

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই আবার ফিরল সে। শাইখুল ইসলামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের লোকেরা অবশ্যই আসবে, আপনাদের বিরক্ত করতে চাইবে। তাদের বলে দেবেন, আমরা এসেছিলাম, চলে গেছি, আমাদের কোন খোঁজ আপনারা জানেন না। বহু পর্যটক এমন আসে। তাদের খোঁজ রাখা আপনাদের দায়িত্ব নয়। আর ওরা ঐ মুয়াজ্জিনের খোঁজ অবশ্যই করবে। আপনি ওদের বলে দেবেন, আমি মুয়াজ্জিন সাহেবের সাথে একান্তে কি বলেছি, তারপর থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব আর নেই। বলবেন, আমার সাথের লোকেরা দেয়াল টপকে পালিয়েছে, তারাই সম্ভবতঃ মুয়াজ্জিন সাহেবকে সাথে নিয়ে গেছে। ওরা বেশী ঝামেলা করলে, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে বিষয়টা জানাবেন। আপনাদের নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব সরকারের।'

শাইখুল ইসলামের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। মনে হয় নিরাপত্তার এদিকটার কথা এতক্ষণে মাথায় আসেনি।

আহমদ মুসা আবার সালাম দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

শাইখুল ইসলাম আশফাক আমিনকে বলল, 'তুমি ওঁর সাথে অন্ততঃ গেট পর্যন্ত যাও। কিছুর প্রয়োজন হলে তুমি দেখ।'

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার সাথে আশফাক আমিনও।

সাথে চলতে চলতে আশফাক আমিন বলল, 'জনাব জীবনে কখনও কোন বড় কাজ করিনি, আমি কি আপনার সাথী হতে পারি না?

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তোমার কাঁধে যে দায়িত্ব সেটা তো ছোট কোন কাজের দায়িত্ব নয়।’ তারপর একটু থেমে গম্ভীর কন্ঠে বলল, ‘ওদের সাথে যত কম লোককে জড়িয়ে পারা যায়, যত কম লোককে ওদের সামনে হাজির করা যায়, ততই মংগল। এ ছাড়া তোমাকে সাথে নেয়ার ক্ষেত্রে আর কোন আপত্তি নেই।’

আশফাক আমিনের মুখ ম্লান হলো। তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে ক্ষুণ্ন হয়েছে বুঝা গেল।

আহমদ মুসা আশফাক আমিনের পিঠ চাপড়ে বলল, ‘দেখ আমার মত তোমরা বিদেশী নও। তোমাদেরকে স্পেনে থাকতে হবে সুতরাং অপরিহার্য কোন প্রয়োজন ছাড়া ওদের কাছে চিহ্নিত হওয়া বোকামী বুঝলে। এই বোকামী আমি এড়াতে চাই।’

আশফাক আমিনের মুখ এবার উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, ‘বুঝেছি জনাব। কিন্তু আপনি এতটা সামনে দেখে সিদ্ধান্ত নেন।’

গাড়িতে ওঠার আগে আশফাক আমিনের সাথে হ্যান্ডশেক করল আহমদ মুসা। আশফাক আমিনের মুখ শুকনো। সে আহমদ মুসার হাত না ছেড়ে বলল ‘জনাব এভাবে ভয়ংকর এবং শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে আপনার ভয় করে না?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘মৃত্যুর সেই সময় না এলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না, আর মৃত্যুর সময় না এলে কেউ কাউকে মারতে পারে বলে কি তুমি মনে কর?’

‘না, জনাব।’

‘তাহলে আর ভয় কিসের?’

বলে, আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল।

আহমদ মুসার গাড়ি গেটের কাছে পৌঁছতেই গেট খুলে গেল।

খোলা গেট পেরিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি একবার লাফিয়ে উঠে তীব্র বেগে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা হিসাব আগেই কষেছিল। গেট থেকে সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুর দূরত্ব প্রায় দু'শ গজ। সবটা বিচার-বিবেচনা করে আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছে, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এই দু'শ গজকেই তাদের অভিযানের জায়গা হিসাবে বেছে নিবে। তাদের ফাঁদটা কেমন হবে, সে কথাও ভেবেছে আহমদ মুসা। সে লা-গ্রীনজা থেকে মাদ্রিদে ফেরার পথে তাকে যেভাবে বন্দী করা হয়েছিল, আহমদ মুসার তা মনে পড়েছিল। সেই কৌশল ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবারও গ্রহন করতে পারে বলে আহমদ মুসার মনে হয়েছে। গেট পেরিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি যখন নিশ্চিন্তে সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুর দিকে এগুবে, তখন হঠাৎ তারা চারদিক থেকে আহমদ মুসাকে ঘিরে ফেলবে।

আহমদ মুসার গাড়ি এগুচ্ছিল ঝড়ের বেগে।

সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুতে পৌঁছার দুই-তৃতীয়াংশ পথ যখন এগিয়েছে, তখন আহমদ মুসা দেখতে পেল তার ডান, বাম ও সামনের দিক থেকে তিনটে গাড়ি তার দিকে ছুটে আসছে। ডান ও বাম দিকের গাড়ি দু'টো একটু পিছিয়ে পড়ার কারণে ওগুলো পেছন থেকে কোনাকুনি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সম্ভবতঃ আহমদ মুসা এমন দ্রুত এগিয়ে আসার কারণেই তারা পিছিয়ে পড়েছে। আহমদ মুসার গাড়ি এমন পাগলা গতিতে তীব্র বেগে ছুটবে গেট থেকে বের হয়েই তা তারা ভাবতে পারেনি।

আহমদ মুসা বাম হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে পিং পং বলের মত দু'টা বস্তু বের করে ছুড়ে মারল তার গাড়ির পাশেই।

তারপর টেনিস বলের মত আরেকটা গোলাকার বস্তু পকেট থেকে বের করে একবার পেছনে তাকাল। দেখল. পেছনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘন কালো ধোয়ার দেয়াল পেছনে অমাবস্যার রাত ডেকে এনেছে।

আহমদ মুসা সামনে তাকিয়ে দেখল গজ বিশেক দূরে সামনের গাড়িটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। আহমদ মুসা গাড়ির গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে, আরও কয়েক গজ এগিয়ে ডান হাতের টেনিস সাইজের বলটা সামনের মাইক্রোবাসটার লক্ষ্যে ছুঁড়ে মেরেই বাম হাতে স্টিয়ারিং ঘুড়িয়ে গাড়ি রাস্তা থেকে ডান' দিকে নামিয়ে নিল এবং উঁচু-নিচু মাটির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তীব্র বেগে সামনে এগিয়ে

চলল। পাশ দিয়ে মাইক্রোবাসটি যখন অতিক্রম করছিল, দেখল বিশেষ ধরনের পাওয়ারফুল গ্রেনেডের বিস্ফোরণ মাইক্রোবাসটিকে টুকরো টুকরো করে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে। শিউরে উঠল আহমদ মুসা। এই গ্রেনেডটাই মুয়াজ্জিন সাহেব ছুড়তে যাচ্ছিল শাইখুল ইসলাম ও আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে। তার ইচ্ছা পূরণ হলে শুধু তারাই নয়, আশে-পাশের ঘরগুলোও উড়ে যেত।

আহমদ মুসার গাড়ি এসে সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুতে উঠল। আহমদ মুসা চোখ ফিরিয়ে দেখল, স্মোক বোম্বের কাল ধোয়া গাড়ি বিস্ফোরণের জায়গা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। গোটা এলাকাটাই কাল অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। মসজিদ কমপ্লেক্সের গেট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ মুসার গাড়ি সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনু ধরে চলতে লাগল উত্তরে। তার লক্ষ্য সারিয়ার ভাই ফিডেল ফিলিপের বাড়ি।

আহমদ মুসারা মাদ্রিদে এসে এবার উঠেছিল রাবার্তোর ছোট বাড়িটাতে। কিন্তু জায়গাটা নিরাপদ মনে না করায় তারা গিয়ে ওঠে জোয়ানের বাড়িতে। ইচ্ছা করেই তারা গিয়ে ওঠে জোয়ানের বাড়িতে। ইচ্ছা করেই তারা এবার হোটেলে ওঠেনি। প্রত্যেক আবাসিক হোটেলেই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবং সরকারের লোকরা ঘুর ঘুর করে। পরে ফিডেল ফিলিপ জানতে পেরে আহমদ মুসাকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছে। বাড়িটা বড় নিরাপদ। তার উপর টেলিফোন থাকায় আহমদ মুসা খুব আপত্তি না করেই চলে এসেছে। কিন্তু জোয়ান যিয়াদকে আসতে দেয়নি। কিন্তু তারা চারজন তিন জায়গায় থাকলেও প্রতিদিন সকালে ফিডেল ফিলিপের বাসায় এসে তারা সকলে নাস্তা করে। তারপর শলা-পরামর্শ করে দিনের কাজ ঠিক করে।

কিছুদূর এগোনোর পর আহমদ মুসা পেছন ফিরে দেখল কেউ অনুসরণ করছে কিনা। না, পেছনে কোন গাড়ি নেই নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা। ভাবল, গাড়ি দু'টা নিশ্চয় বিস্ফোরিত গাড়িটা নিয়ে ব্যস্ত। কয়জন লোক ছিল গাড়িটাতে? নিশ্চয় কেউ বেঁচে নেই। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। ষড়যন্ত্রকারীদের জিঘাংসা আগুনে পুড়ে কত লোক এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সামনে প্রসারিত চোখ দু'টি আহমদ মুসার বেদনায় ভারি হয়ে উঠল।

গাড়িটি তখন সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনু পেছনে ফেলে ফিলিপ স্কোয়ার ধরে ছুটে চলছিল।

৩

ইটালীর ক্ষুদ্র নগরী ট্রিয়েষ্টে পৌঁছে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালামের পৃথিবী খ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগার 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স' খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না জোয়ানের। গবেষণাগারটি দাঁড়িয়ে আছে আড্রিয়াটিক সাগরের শান্ত কূলে। দক্ষিণ মুখী গবেষণাগারটির সর্ব্ দক্ষিনে বহিঃপ্রাচীর ঘেষে দাঁড়ানো ছোট্ট মসজিদটির জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত আড্রিয়াটিকের অবারিত বুক।

ট্রিয়েষ্ট শহরটাই অদ্ভুত সুন্দর লেগেছে জোয়ানের। যুগোশ্লাভ সীমান্তের গা ঘেষে দাঁড়ানো ট্রিয়েষ্টের তিন পাশই সাগরে ঘেরা। আড্রিয়াটিকের নীল জ্বলে ভাসমান ট্রিয়েস্টের তিন পাশই সাগরে ঘেরা। আড্রিয়াটিকের নীল জ্বলে ভাসমান ট্রিয়েষ্ট যেন একটা সফেদ রাজ হংস। জোয়ান ভাবল, বিজ্ঞানী আবদুস সালাম শুধু জটিল পদার্থ্ বিজ্ঞান নিয়েই চর্চা করতেন না, তিনি মনে মনে কবিও ছিলেন। না হলে ইটালির সব বাদ দিয়ে প্রায় যুগোশ্লাভ সীমান্তে এসে সাগর-বাসী ট্রিয়েষ্টকে তিনি বাছাই করলেন কেন।

জোয়ান 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স' এর মসজিদের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। দুনিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ্ বিজ্ঞান গবেষণাগারের সাথে মসজিদ দেখে জোয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। জোয়ান এর আগে ট্রিয়েষ্টে আসেনি, ইউরোপের অন্যান্য জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞান-গবেষনাগারে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও গীর্জা দেখেনি, মসজিদ দেখেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তার বিস্ময় কেটে গেছে। তাঁর মনে হয়েছে, নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালাম শুধু তো দুনিয়ার একজন শীর্ষ্ বিজ্ঞানী নন, তিনি মুসলমানও। এবং নামে মাত্র মুসলমান তিনি নন। তিনি ইসলামের বিধান সমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং ভালোবাসেন তিনি ইসলামকে, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে। তিনি চান ইসলাম ও মুসলামদের গৌরবময়

যুগ আবার ফিরে আসুক। পশ্চিমের বিজ্ঞানের যে দান, সে দান মুসলামনরা ভিক্ষুকের মত হাত পেতে গ্রহণ করায় বিজ্ঞানী আবদুস সালাম দারুণভাবে বেদনা বোধ করেন, অপমান বোধ করেন। জোয়ানের মনে পড়ল ডঃ আবদুস সালামের একটা বিখ্যাত বক্তৃতার কথা সে বক্তৃতার উপসংহারে বিজ্ঞানী আবদুস সালাম বলেছেন-

'জ্ঞান সৃষ্টির এই অভিযানে আমাদের অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমি যে এই আবেগ পূর্ণভাবে সুপারিশ করছি তার কারণ কি? এটা কেবল এ জন্য নয় যে, জানবার আগ্রহ দিয়ে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এটা এ জন্যও নয় যে আজকের অবস্থায় জ্ঞানই শক্তি এবং প্রয়োগিক বিজ্ঞানে তা বস্তুগত উন্নতির প্রধান অস্ত্র; বরং এটা এজন্যে যে, আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হিসাবে যারা জ্ঞান সৃষ্টি করেন তারা আমাদের জন্যে- অব্যক্ত কিন্তু তবু অস্তিত্বশীল- যে ঘৃণার চাবুক রেখে দেন তা আমি অনুভব করি।

আমার এখনো মনে আছে কয়েক বছর আগে কোনো ইউরোপীয় দেশের পদার্থ্ বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী একজন বিজ্ঞানী আমাকে বলেছিলেন, 'সালাম, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, ঐ সব জাতিকে রক্ষা করা, সাহায্য করা এবং বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য, সে দেশ যারা মানুষের জ্ঞান ভান্ডারে বিন্দুমাত্র কিছু সৃষ্টি করেনি বা দেয়নি?' এবং যদিও সে বিজ্ঞানী এ কথা বলেননি তবু যখনই আমি কোন হাসপাতালে প্রবেশ করি তখনই আমার আত্মমর্যাদা বিরাটভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। এটা দেখে যে, আজকের প্রায় প্রতিটি শক্তিশালী জীবনরক্ষাকারী ওষুধ সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের অথবা আরব দেশের অথবা ইসলামী দেশের আমাদের কারো কোন অবদান ছাড়াই।.................. আমরা সংখ্যায় কম, পৃথকভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু, আমরা সকলে উম্মত উল ইলমে একত্রিত হলে তা আর হবে না। চুড়ান্ত বিচারে এ ধরণের একটি সত্যিকারের ইসলামী কমনওয়েলথ তৈরি করা এবং সেখানে বিজ্ঞানের পূনর্জাগরণ সম্ভব করা আমাদের উপরেই নির্ভর করে। আমি আপনাদের কাছে জামাল আব্দুন নাসের যা বলেছিলেন তার পূনরাবৃত্তি করছি, 'অহংকারের সঙ্গে এবং আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। ১৯৪৬ সালে কেম্ব্রিজে আমি যখন এক

ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম, তখন আমার সমসাময়িক বৃটিশ ছাত্রদের চেয়ে আমার বয়স বেশী ছিল, তাদের চেয়ে আমি বেশী বিজ্ঞান জানতাম। কিন্তু, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, ডারউইন, ডিরাকের জাতির অংশ হওয়ায় তাদের এক ধরণের অহংকার ছিল। আপনারা মনে করুন যে আপনাদের অতীতে ইবনে হাইথাম, ইবনে সীনার মত কতো মানুষ ছিল। .... আপনারা যৌথ ইসলামী বিজ্ঞান কমনওয়েলথের জন্য আপনাদের প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প ও কর্মসুচীর সাহসিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন......।

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এমন দরদ যে বিজ্ঞানীর, তার বিজ্ঞান-গবেষণাগারে মসজিদ থাকবেই, উপসংহার টানল জোয়ান।

মসজিদের ছায়ায় বসে জোয়ান অপেক্ষা করছিল আব্দুল্লাহ জুবায়েরের। ডঃ আব্দুল্লাহ জুবায়ের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী। তিনি ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিক্যাল ফিজিক্স (আই সি টি পি)- এর উপদেষ্টা পরিষদের একজন প্রভাবশালী সদস্য। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র তার বিজ্ঞান বাজেটের প্রায় এক চতুর্থাংশ চাদা হিসেবে দেয় ডঃ সালামের এই বিজ্ঞান কেন্দ্র আই সিটিপি'কে। আই সিটিপি'র এখন সবচেয়ে বড় ডোনার দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। জোয়ান যাতে আই সিটিপি থেকে তার কাজ ভালভাবে করে নিতে পারে এ জন্য ফিলিস্তিন সরকার খোদ আব্দুল্লাহ জুবায়েরকে পাঠিয়েছে ট্রিয়েস্টে।

আহমদ মুসা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মাহমুদকে বলে আগেই এসব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রেখেছেন।

সেদিন শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে ফিরেই আহমদ মুসা যিয়াদ ও জোয়ানকে নিয়ে মাদ্রিদস্থ ফিলিস্তিন দূতাবাসে গিয়েছিল।

স্পেনের মাদ্রিদে যে ফিলিস্তিন দূতাবাস আছে, আহমদ মুসার সে কথাটা মনে হয়নি। শাহ ফয়সাল কমপ্লেক্স থেকে ফিডেল ফিলিপের বাসায় ফিরে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের সাথে জরুরী যোগাযোগের কথা ভাবছিল। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। টেলিফোনে কথা বলতে গেলে সব কথা স্পেন সরকার শুধু নয়, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কানেও কথাটা পৌঁছে যাবে। সমস্যার সমাধান হিসেবে ফিডেল

ফিলিপই কথাটা প্রথম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আপনার এ্যামবেসী মানে ফিলিস্তিন এ্যামবেসী মাদ্রিদে থাকতে আপনি এত চিন্তা করছেন।

সংগে সংগেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। গাইড থেকে টেলিফোন নাম্বার খুঁজে নিয়েছিল ফিলিপ।

টেলিফোনে রাষ্ট্রদূতকে পেয়ে তার কাছে আহমদ মুসা নিজের পরিচয় দিতেই সে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর সে কিছুক্ষণ আবেগের আতিশয্যে কথা বলতে পারেনি। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, জনাব, আমি আবু সাবের, আপনার একজন নগন্য কর্মী।

আহমদ মুসা আবু সাবেরকে চিনতে পেরেছিল। সংগ্রামকালে প্রচার বিভাগের কর্মী ছিল সে।

কোন কথা শুনেনি, সংগে সংগেই গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল আবু সাবের। সে গাড়িতে চড়েই আহমদ মুসা, যিয়াদ ও জোয়ান ফিলিস্তিন এ্যামবেসিতে গিয়েছিল।

এ্যামবেসীর অয়্যারলেসে আহমদ মুসা কথা বলেছিল ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট তার প্রিয় সহকর্মী মাহমুদের সাথে। মাহমুদও আবু সাবেরের সঙ্গী আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল এবং সেই সাথে তুলেছিল একরাশ অভিযোগ। বলেছিল, আপনি কোনই যোগাযোগ রাখছেন না। আমরা শুধুই আপনার পিছনে ছুটছি, ধরতে পারছি না। আমরা খোজ পাওয়ার পর ককেশাসে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম আপনি বলকানে। বলকানে আপনার খোঁজ যখন পেলাম, তখন আপনি পাড়ি জমিয়েছেন স্পেনে, স্পেনের দূতাবাসকে নির্দেশ দিলাম আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য। অবশেষে আজ পেলাম আপনাকে। আপনার কাছে কোন অপরাধ করেছি মুসা ভাই যে, আপনার সাথে সম্পর্ক রাখার অধিকার আমাদের থাকবে না?

মাহমুদের শেষ কথাগুলো অভিমানে ভারী হয়ে উঠেছিল।

আহমদ মুসার ঠোঁটে স্নেহের হাসি ফুটে উঠেছিল। উত্তরে বলেছিল, ভাইটি, আজ কিন্তু আমি নিজে খোজ করে তোমার দূতাবাসে এসেছি। প্রয়োজন হলে এক মুহুর্তও যে দেরী করব না তোমাদের কাছে আসতে সে পরিচয় তো তুমি

পেলে। আর শোন ঘটনার শ্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছা করলেও পারি না তোমাদের খোজ নিতে। তোমার এমিলিয়া কেমন আছে?

'তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, মুসা ভাই'। বলে মাহমুদ টেলিফোন দিয়েছিল এমিলিয়াকে।

এমিলিয়া কেঁদে ফেলেছিল। কথা বলতে পারেনি অনেকক্ষণ। শেষে বলেছিল, আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারেন, এমন করে বোনদের ভুলে থাকতে পারেন ভাবিনি। তাই কষ্ট লাগে। আয়েশা আলিয়েভার কাছে সব শুনেছি। বড় কষ্ট লাগে ভাবীর জন্য। আপনি শুধু মানুষকে কষ্ট দিতে পারেন। দায়িত্বের কাছে হৃদয় বৃত্তির কি কোনই মুল্য নেই?

আহমদ মুসা এমিলিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল, 'এমিলিয়া, আমি অব্যাহত এক যুদ্ধে জড়িয়ে আছি। যুদ্ধক্ষেত্রের ধর্ম অনুসারে অনেক স্বাভাবিক দাবী এখানে অস্বাভাবিকভাবে পদদলিত হয়।'

এমিলিয়াকে সান্তনা দিয়ে আহমদ মুসা কথা বলেছিল মাহমুদের সাথে। বলেছিল স্পেনে মুসলমানদের নতুন বিপদের কথা, বলেছিল ডঃ সালামের বিজ্ঞান গবেষণাগারের সাহায্যের প্রয়োজনের কথা। মাহমুদ বলেছিল, স্পেনের ভাইদের এই প্রয়োজন পূরণকে আমি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। আব্দুল্লাহ জুবায়েরকে আপনি জানেন। ওকেই আমি পাঠাচ্ছি ট্রিয়েস্টে যাতে কোন সমস্যা না হয়। তারপর খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে মাহমুদের সাথে আহমদ মুসার আরো অনেক আলাপ হয়েছিল। একঘন্টা আলোচনার পর কথা শেষ করতে গিয়ে মাহমুদ কেঁদে ফেলেছিল। দু'টি কথা শেষে বলেছিল, ' এক; আপনার একটু বিশ্রামের জন্য আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি, দুই; ফিলিস্তিন রাষ্ট্র আপনার, আপনার কোন কাজে যদি এ রাষ্ট্র না লাগে তাহলে কষ্ট পাই।'

মাহমুদের কথার জবাব দিতে গিয়ে আহমদ মুসা গম্ভীর কন্ঠে বলেছিল, বিশ্রামের কথা বলছ মাহমুদ! তুমি জান মুসলমানরা একটা মিশনারী জাতি এবং তারা একটা বিপ্লবী কর্মী দল। গোটা দুনিয়ার মানুষকে পথ দেখানো দূরে থাক, আমরা নিজেরাই আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এই যখন অবস্থা,

তখন বিশ্রামের চিন্তা তুমি আমি করতে পারি কি করে মাহমুদ। কথা সেদিন শেষ হয়েছিল এভাবেই।

জোয়ান ট্রিয়েস্টে গিয়ে কিভাবে আব্দুল্লাহ জাবেরের দেখা পাবে তার দিন, ক্ষণ, স্থান সব ঠিক করে দিয়েছিল ফিলিস্তিন এ্যামবেসীই।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই জোয়ান মসজিদের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল।

জোয়ান তার রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। দেখল, বেলা ১১টা বাজতে যাচ্ছে।

চঞ্চল হয়ে উঠল জোয়ান। ঠিক ১১ টায় তার আসার কথা।

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল জোয়ান।

ঠিক এগারটা বাজে।

উৎসুক চোখ জোয়ান মেলে ধরল সামনে। চোখ তুলতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল এগিয়ে আসা দীর্ঘকায়, সুঠামদেহী লোকের উপর। ধোপদুরস্ত ইউরোপীয় পোশাক, কিন্তু লাল আরবী চেহারা। সেই যে আব্দুল্লাহ জাবের কিছু মাত্র সন্দেহ রইল না জোয়ানের।

বেশ দূরে থাকতেই হাসিমুখে সালাম দিল লোকটি।

জোয়ান সালাম গ্রহণ করেই বলল, নিশ্চয় জনাব আব্দুল্লাহ জাবের।

'হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয় ভাই জোয়ান ওরফে মুসা আব্দুল্লাহ।'

হ্যান্ডশেক করে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

'মুসা ভাই কেমন আছেন?' বলল জোয়ান।

'কতদিন তাঁর কথা শুনিনি। আপনার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনব।'

'আহমদ মুসা ভাইকে আপনারা এত ভালবাসেন?' সেদিন দেখলাম, দূতাবাসের সবাই তাঁর জন্যে পাগল। কেন এত ভালবাসা?'

'আপনার সাথে তার পরিচয় কতদিন?'

'মাস হয়নি।'

'আপনি তাকে ভালবাসেন না?'

'অবশ্যই।'

'কেন তাকে ভালবাসেন?'

জোয়ান একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, ‘মানুষের প্রতি তার অপূর্ব ভালবাসা, সাথীদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস্য মমতা দেখে।’

‘তাঁর সাথে যারা মিশেছেন, সবাই এই একই জবাব দেবেন। তিনি এমন এক নেতা, যাঁর সাথে কেউ দু’দিন কাটালে সারাজীবন তাঁর সাথে থাকতে চাইবে। সাথীদের সুখ-সুবিধা, নিরাপত্তার দিকে তাঁর যত নজর, তার একাংশও নিজের জন্যে তিনি করেন না। সাথীদের তিনি নিরাপদ পক্ষপুটে রেখে সব বিপদ, সব ঝুঁকি তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। এমন নেতার জন্যেই তো জীবন দেয়া যায়। তাই তো পাগল সবাই তাঁর জন্যে।’

‘এমন বিস্ময়কর চরিত্র কি করে সৃষ্টি হলো?’

‘ইসলামে নেতার চরিত্র এটাই। ইসলামের স্বর্ণযুগে এটাই ছিল নেতার চরিত্র। শুধু স্বর্ণযুগে কেন, চরিত্র, মানুষের প্রতি ভালবাসা দিয়েই তো ইসলাম জগত জয় করেছে।’

‘মাফ করবেন হিংস্রতার ইতিহাসও তো আছে।’

‘আপনি পরবর্তীকালের কিছু নাম মাত্র খলীফা, রাজা-বাদশাহদের কথা বলছেন। কিন্তু তাঁদের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস নয়। এ কথা ঠিক মুসলিম সাম্রাজ্য তারা সংহত করেছেন, সংরক্ষণ করেছেন, শাসন করেছেন, কিন্তু তাঁদের দেখে মানুষ ইসলাম গ্রহন করেনি। মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, শাহ মখদুম, শাহ জালালের মত মুজাহিদ মিশনারীদের দেখে। যাঁরা ছিলেন মানুষের কাছে মোমের মত কোমল, আর অত্যাচারের মূলোতপাটনে ছিলেন সিংহের মত সংগ্রামী।’ থামল আব্দুল্লাহ জাবের। থেমেই বলল, ‘চলুন ওঁরা অপেক্ষা করছেন।’ তারা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল।

চলল তারা গবেষণা প্রতিষ্ঠান আই, সি, টি, পি’র গেটের দিকে।

আই সি টি পি’র (ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স)-এর পরিচালক ডঃ নূর আব্দুল্লাহর অফিস।

রাত তখন নয়টা। ডঃ নূর আবদুল্লাহ তার টেবিলে তার রিভলভিং চেয়ারে বসে। তার চোখ-মুখ লাল, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।

ডঃ নূর আবদুল্লাহ আফগান বংশোদ্ভুত। দুই পুরুষ ধরে ইতালীর নাগরিক। একজন কৃতি পদার্থ বিজ্ঞানী সে। যত নিষ্ঠা ও মমতা দিয়ে ডঃ আবদুস সালাম এই পদার্থ বিজ্ঞান গবেষনাগার গড়ে তুলেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের অবহেলিত বিজ্ঞানীদের জন্যে, ডঃ নূর আবদুল্লাহ আজ ততটা মমতা ও নিষ্ঠা দিয়েই কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন। তার পরিচালনায় কেন্দ্রটি আজ তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানী বিশেষ করে মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্যে এক 'স্বর্গভূমি' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের ধীর পায়ে ডঃ নূর আবদুল্লাহর অফিসে প্রবেশ করল।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবেরকে দেখেই ডঃ নূর আবদুল্লাহ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল এবং উত্তেজিত কন্ঠে বলল, ডঃ জাবের সর্বনাশ হয়ে গেছে, স্যাম্পুলগুলোর তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণের রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল ল্যাবরেটরী থেকে হারিয়ে গেছে।

'হারিয়ে গেছে?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

'হারিয়ে গেছে মানে টেবিল থেকে উধাও হয়েছে। মাগরিব নামাযের ব্রেকে বিজ্ঞানী তৌফিক আল বিশারা বাইরে এসেছে। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল কিছুই পায়নি।'

'অবিশ্বাস্য ঘটনা।'

'তুমি অবিশ্বাস্য বলছ, আমি তো আতংক বোধ করছি।' মুখ কালো করে বলল ডঃ নূর আবদুল্লাহ।

'রিপোর্ট ও স্যাম্পুল উধাও হয়েছে, কিন্তু কম্পিউটারে তো সবই আছে। অন্ততঃ এই ক্ষতিটা থেকে বাঁচা যাবে।'

শুকনো হাসি ফুটে উঠল ডঃ নূর আবদুল্লাহর ঠোঁটে। বলল, 'বিজ্ঞ চোর সে দরজাও বন্ধ করে গেছে। কম্পিউটারের সে ডিস্ক একদম সাদা, সব মুছে দিয়ে গেছে। অথবা ডিক্স বদলে আসলটা নিয়ে গেছে।'

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। তার চোখে নেমে এলো অন্ধকার। তার চোখে ভেসে উঠল আহমদ মুসার মুখ। আহমদ মুসা তাকে

একটা দায়িত্ব দিয়েছিল, সে দায়িত্ব সে পালন করতে পারলো না। মানসিক দিক দিয়ে মুষড়ে পড়ল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

ডঃ নূর আবদুল্লাহও তার চেয়ারে বসে পড়ল। মলিন এবং বিস্ময় তার চেহারা। বলল সে, দুঃখিত ডঃ জাবের, এ ধরনের ঘটনা আমাদের গবেষণা কেন্দ্রে এই প্রথম। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

'কাউকে সন্দেহ করেন, যে এই কাজ করতে পারে?'

'কাকে সন্দেহ করব, সবাই তো আমরা এখানে এক।'

'ঘটনা যখন ঘটেছে, কেউ অবশ্যই তা ঘটিয়েছে। অনুসন্ধানে তা বেরোবেই। দরকার হলে গোয়েন্দা ফার্মের সাহায্য নিতে হবে। সেটা পরে হবে। কিন্তু রিপোর্ট যে জরুরী, এর জন্যে তো অপেক্ষা করা যাবে না।'

'মিঃ জোয়ানের কাছে কি বাড়তি কোন স্যাম্পুল আছে?'

'জানি না। ওর কাছে তাহলে যেতে হয়, তাছাড়া ঘটনাও তার জানা দরকার।'

দু'জনেই উঠল।

বেরুল অফিস থেকে।

চলল দু'জন জোয়ান যেখানে থাকে সেদিকে। জোয়ান থাকছে আই সি টি পি'র রেস্ট হাউজে, গবেষণা কমপ্লেক্সের বাইরে সাগরের তীরে।

রেস্ট হাউজ এক তলা সাগর থেকে উঠে আসা উঁচু এক টিলার উপর নির্মিত। চারদিকে ফুলের বাগান। মাঝখানে সুন্দর ছবির মত রেস্ট হাউজটি।

রাত তখন ৮টা ৩০ মিনিট।

জোয়ানের সাথে কথা বলছিল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের এবং ডঃ নূর আবদুল্লাহ।

রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল হারানোর কথা শুনে জোয়ানের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। বলল, বাড়তি কোন স্যাম্পুল আমার কাছে নেই।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের এবং ডঃ নুর আবদুল্লাহর তখন বিব্রতকর অবস্থা। তাদের কারও মুখে কোন কথা নেই।

কথা বলল জোয়ানই আবার। বলল, মাদ্রিদের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে একদল ছাত্র-শিক্ষক এসেছে স্টাডি ট্যুরে। ওরাই এটা ঘটিয়েছে।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, ওরা? কেন করবে? জানবে কি করে ওরা?

‘ওরা এসেই জানতে পেরেছে আমি এসেছি। ওদের কেউ একজন এখানে আছে। সেই সব জানিয়েছে।’ বলল জোয়ান।

‘এসব কথা আপনি কি করে জানলেন মিঃ জোয়ান?’ বলল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

‘সন্ধ্যায় এসে আমার ঘরে একটা চিঠি পেয়েছি। ঐ স্টাডি টিমে আমার এক বান্ধবী আছেন, তিনিই আমাকে জানিয়েছেন।’

বলে জোয়ানের বালিশের তলা থেকে চিঠি বের করল। পড়ল চিঠিটিঃ

জোয়ান,

‘মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টাডি ট্যুরে এসেছে একদল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক। সব ওরা জানতে পেরেছে। তোমাদের পরিকল্পনা ওরা ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র এঁটেছে। তুমিও ওদের টার্গেট। আমি চিন্তিত। সাবধানে থেকো, রাতে কোথাও সরে থাকতে চেষ্টা কর। তোমার সাথে দেখা করা নিরাপদ নয়। কিছু জানলে এইভাবে চিঠি দিয়ে জানাব। গবেষনা কেন্দ্রে এবং বাইরেও ওদের লোক আছে। খুব শক্তিশালী এরা। আবার বলছি, সাবধানে থেকো।

তোমার – ‘জেন’

চিঠি শুনতে শুনতে ডঃ নুর আবদুল্লাহর চোখে-মুখে উদ্বেগ-আতংক ফুটে উঠল। চিঠি পড়া শেষ হলে সে বলল, ‘গবেষণা কেন্দ্রের কেউ তাদের সাথে থাকবে কেন? কি সম্পর্ক তাদের সাথে? বিদেশী ওরা, দু’একদিনের স্ট্যাডি ট্যুরে এসেছে মাত্র।’

‘স্ট্যাডি ট্যুরে কোন শিক্ষক এসেছে, তা জেন লিখেনি। লিখলে বুঝতে পারতাম। তবে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কেউ অবশ্যই আছে এবং তিনি সব কলকাঠি নাড়ছেন। ইটালিতে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আছে।

ট্রিয়েষ্টেও অবশ্যই থাকবে এবং তাদের কাউকে তারা আই সি টি পি'তে রাখবে সেটাও স্বাভাবিক।' বলল জোয়ান।

চোখ বুজে আছে ডঃ নুর আব্দুল্লাহ। ভাবছে সে।

জোয়ান থামলেও কিছুক্ষন কথা বলল না ডঃ নুর আবদুল্লাহ। পরে ধীরে ধীরে চোখ খুলে বলল, 'ভেবে পাচ্ছি না, আমার গবেষণা কেন্দ্রে এমন কে আছে যে গবেষণা কেন্দ্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?'

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের কিছু বলার জন্যে মুখ খুলছিল। এই সময় দরজার ওপর শব্দ হলো।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবেরের আর কথা বলা হলো না প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল জোয়ানের দিকে। জোয়ানের পড়া চিঠির কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল।

জোয়ানের মুখ শুকনো। সে কোন কথা বলতে পারছে না।

আবার নক হলো দরজায়।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ উঠল। বলল, জোয়ান তুমি একটু আড়ালে দাঁড়াও। আমি দেখছি কে ওখানে।

ডঃ নুর আবদুল্লাহকে আর এগুতে হলো না। দরজায় এসে দাঁড়ালো কালো ফেল্ট হ্যাট ও কালো ওভার কোটে আবৃত একজন আগন্তুক।

'কে আপনি?' জিজ্ঞাসা করল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

দরজা দিয়ে এক ঝলক আলো গিয়ে পড়েছিল আগন্তুকের উপর।

আগন্তুক ডঃ নুর আবদুল্লাহর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাঁর মাথার ফেল্ট হ্যাটটি খুলে ফেলল।

এবার আগন্তুকের পুরো মুখটার উপর নজর পড়ার সাথে সাথে ডঃ আবদুল্লাহ জাবের 'মুসা ভাই' বলে চিৎকার করে উঠে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আগন্তুককে।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরেই ঘরে নিয়ে এল এবং ডঃ নুর আবদুল্লাহকে দেখিয়ে বলল, ইনি ডঃ নুর আবদুল্লাহ আই সি টি পি'র পরিচালক।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল ডঃ নুর আবদুল্লাহর সাথে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে জোয়ান আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাকে এইভাবে আবির্ভুত হতে দেখে বিস্ময়ে তার নির্বাক অবস্থা।

জোয়ানের দিকে চোখ পড়তেই আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, খুব অবাক হয়েছ না?

'শুধু অবাক নয়, আমার চোখকে এখনও বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।' বলল জোয়ান।

সবাই বসল।

আহমদ মুসা ও জোয়ান পাশাপাশি।

তাদের মুখ দরজার দিকে

তাদের পাশের সোফায় বসল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের এবং ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

'তোমার এখানে যাত্রা করার একদিন পর', বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, 'জেনের কাছ থেকে একটা চিরকুট পেলাম। চিরকুটটিতে লেখা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাডি-ট্যুর ট্রিয়েস্টে যাচ্ছে। বাধ্য হয়েই আমাকে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত বলে আগে কাউকে জানাতে পারিনি। বাসায় জোয়ানকেও পাইনি, খালাম্মাকেও পাইনি। শুনলাম জোয়ান মাদ্রিদের বাইরে। তাকে কিছুই বলা হলো না। আপনি দয়া করে তাকে জানাবেন।' জেনের চিরকুটটি পড়েই আমার মনে হলো ট্রিয়েস্টে কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভাবলাম, সব ক্রোধের শিকার হবে তুমি। সংগে সংগেই আমি ফিলিপকে বললাম আমি ট্রিয়েস্টে যাব। কিন্তু সোজা পথে তো আমার আসার উপায় ছিল না। ফিডেল ফিলিপের সাথে পিরেনিজ পার হলাম তারপর বাসক এলাকার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের পোর্ট ভেন্ড্রেস হয়ে ট্রিয়েস্ট এলাম।'

একটু থামল আহমদ মুসা।

সোফায় একটু নড়ে-চড়ে বসে আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

এই সময় দু'টি ছায়া মুর্তি বিড়ালের মত নিঃশব্দে এসে খোলা দরজায় দাঁড়াল। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান। একটি স্টেনগানের নল জোয়ানের বুক বরাবর উদ্যত। অন্যটি ঘুরছে অন্যান্যদের উপর দিয়ে।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো না। শুধু ভাবল, ঘটনা তার চিন্তার চেয়েও দ্রুত ঘটল।

আগন্তুক দু'জনের টার্গেটের ধরন দেখে আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, সে তাদের টার্গেট নয়। জোয়ানের উদ্দেশ্যেই এসেছে।

আপনারা কে? কি চান এখানে? ওদের উদ্দেশ্যে বলল আহমদ মুসা।

কোন উত্তর দিল না ওরা। ওদের পাথরের মত মুখে কোন পরিবর্তন হলো না। জোয়ানকে লক্ষ্য করে উদ্যত স্টেনগানের ট্রিগারে আঙুলের চাপটা আরও বাড়তে লাগল।

শংকিত আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, এরা পেশাদার খুনি, খুন করার জন্যেই এরা এসেছে।

ওদের মনোযোগটা কিভাবে অন্যদিকে আকৃষ্ট করা যায়, কিভাবে কিছুটা সময় নেয়া যায় এ চিন্তায় আহমদ মুসা যখন ব্যস্ত, তখন পর পর দু'টি গুলীর শব্দ হলো। আর তার সংগে সংগেই দরজায় দাঁড়ানো স্টেনগানধারী দু'জন দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গেল দরজায়। বাইরে আলো-অন্ধকারে ঘেরা বাগান কিছুই দেখা গেল না। আহমদ মুসা দৃষ্টি ফেরাল লোক দু'টির দিকে। ওদের দু'জনেরই মাথায় গুলী লেগেছে।

আহমদ মুসা ঘরের মধ্যে ফিরে এল।

জোয়ান এবং ডঃ আবদুল্লাহ জাবের বিমুঢ়। ডঃ নুর আবদুল্লাহর মুখ কাগজের মত সাদা। ভয় ও আতংকে সে আড়ষ্ট।

আহমদ মুসা ডঃ আবদুল্লাহ জাবেরকে বলল, এদিকে ঘটনা এতদুর গড়িয়েছে?

তারপর জোয়ানের দিকে ফিরে বলল, সব কি প্রকাশ হয়ে গেছে? অবস্থা সম্পর্কে কতটা জান?

জোয়ান কোন জবাব দিল না। জেনের চিঠিটা আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা চিঠি পড়ে মুখ তুলতেই ডঃ আবদুল্লাহ জাবের বলল, আজ সন্ধ্যায় ল্যাবরেটরী থেকে তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণের রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল দুইই হারিয়ে গেছে। এমনকি কম্পিউটার ডিস্কের রেকর্ডও মুছে ফেলা হয়েছে অথবা সেটাও চুরি হয়ে গেছে।'

'ওরা জানতে পারার পর এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করে।'

বলে আহমদ মুসা বসল। তারপর ডঃ নুর আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, জনাব রেস্ট হাউজে কি আপনাদের গার্ড আছে।

'আছে, গেটে একজন। কিন্তু তার কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র থাকে না।'

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল চোখ বন্ধ করে। তারপর বলল, জোয়ান, জেন গুলী ছুড়তে জানে?'

'জানে। সে খুব ভাল পিস্তল শুটার। এ্যামেচার রিভলবার শুটিং–এ গত তিন বার ধরে সে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে।'

'তাহলে জেনই আজ আমাদের বাঁচাল। তার গুলীতেই এ দু'জন মরেছে।'

'জেনের গুলীতে?' লাফিয়ে উঠল যেন জোয়ান। বলল, 'কেমন করে বুঝলেন? জেন হলে তো এখানে আসতো।'

'উত্তর খুবই সহজ। ডঃ নুর আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ জাবের দু'জনই এখানে। বাইরে জেন ছাড়া তো আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। আর জেন এখানে এল না কেন? জেন সময় নষ্ট না করে ফিরে গেছে তার আবাসস্থলে। যাতে সে সন্দেহের শিকার না হয় এ জন্যে এটাই তার করণীয় ছিল।'

জোয়ানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা ডঃ নুর আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ডক্টর আপনাকে কি কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'যে কোন সাহায্য, যে কোন সহযোগীতার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। আমাদের এই দুর্দিনে আল্লাহ আপনাকে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার আজ মনে হচ্ছে, যারা আজকের ডকুমেন্টটি চুরির মত বিশ্বাস ঘাতকতা

করল, সে আরও সর্বনাশ করেছে আরও মূল্যবান তথ্য পাচার করেছে নিশ্চয়।' বলল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

ধন্যবাদ, বলল আহমদ মুসা,' এখন বলুন আপনার বিজ্ঞানীদের দেশ ও ধর্মীয় পরিচয় কি?'

'থিয়োরিক্যাল রিসার্চে আমাদের বিজ্ঞানীদের সংখ্যা একচল্লিশ, আর ল্যাবরেটরীতে আমাদের পরীক্ষণ বিজ্ঞানীর সংখ্যা দশ'। থিয়োরিক্যাল রিসার্চের বিজ্ঞানীদের জন্যে ল্যাবরেটরীতে ঢোকা নিষিদ্ধ। তাদের জন্যে অবশ্য আলাদা ল্যাবরেটরী আছে। পরীক্ষণ বিজ্ঞানীদের একজন ভারতীয়, ৭ জন বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে এসেছে, আর অবশিষ্ট দু'জনের একজন ইতালীয়, একজন নরওয়ের।'

'আমাদের পরীক্ষণটি কার টেবিলে ছিল'?

'গবেষণা কেন্দ্রের সিডিউল অনুসারে এই দায়িত্বটা লেবানিজ ও ভারতীয় বিজ্ঞানীর গ্রুপে পড়েছিল। তারা এটা গ্রহনও করেছিল। কিন্তু একদিন পরে তারা জানায়, লেবানিজ বিজ্ঞানী ছুটিতে যাচ্ছেন তাই সময়ের মধ্যে এ পরীক্ষণ তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এরপর এ দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একজন পাকিস্থান ও একজন সৌদি বিজ্ঞানী গ্রুপের উপর। এদের টেবিল থেকেই খোয়া গেছে রিপোর্ট, স্যাম্পুল এবং কম্পিউটার রেকর্ড।'

'দয়া করে কি বলবেন কারও প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ আপনার হয়?'

'সবাই আমার কাছে সমান।'

'ঠিক 'কোন সময় ডকুমেন্টগুলো হারায়?'

'যখন পাকিস্থানী ও সৌদি বিজ্ঞানী দু'জন মাগরিবের নামাজ পড়তে যায়'।

'অন্য সবাই কি নামাজ পড়তে গিয়েছিল?'

'নামাজের বিরতি হলে, মুসলিমরা প্রায় সকলেই নামাজে যায়, দু'একজন ব্যাতিক্রম আছে'।

'আপনি কি খোঁজ নিয়েছেন, নামাজের সময় কোন গ্রুপ কাজ করছিল কিনা?'

‘লেবানিজ ও ভারতীয় বিজ্ঞানী দু’জন কাজ করছিল’।

‘কেন ভারতীয় বিজ্ঞানী ছুটিতে যায়নি?’ বিস্ময়ের সাথে বলল আহমদ মুসা।

‘ছুটি নিয়েছিল কিন্তু একদিন পরেই বাতিল করে’।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল ‘বিরতির সময় ল্যাবরেটরী কি বন্ধ হয়?’

‘না’।

‘কাজ শেষে ফেরার সময় বিজ্ঞানীদের কাগজপত্র তল্লাশি হয়? তারা হাতে করে কোন কাগজ-পত্র নিয়ে যেতে পারে?’

‘বিধি-নিষেধ আছে। ল্যাবরেটরী থেকে খালি হাত ও খালি পকেটে বেরুতে হবে। চোখ রাখা হয় চেক করা হয় না।’

‘লেবানিজ বিজ্ঞানীর নাম কি?’

‘দাউদ ইমরান।’

‘সে মুসলমান?’

‘মুসলমান।’

‘সে মুসলমান এটা তার বায়োডাটা থেকে জানেন, না তার ফ্যামিলি ব্যাক-গ্রাউন্ড আপনাদের জানা আছে?’

‘বায়োডাটা থেকে জানি।’

‘সে কি নিয়মিত নামাজ পড়ে?’

‘জামায়াতে সে নিয়মিত নয়, তবে একা পড়ে নেয় বলে জানি।’

‘মাফ করবেন, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, আজ বিজ্ঞানীদের যাবার সময় তাদের উপর চোখ রাখার দায়িত্ব কার ছিল?’

‘সিকুরিটি অফিসার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় থাকতে পারেননি। আর হারানোর বিষয়টা নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম।’

‘এমন অসুস্থ হয়ে হঠাৎ না আসার রেকর্ড তার আছে?’

‘মনে পড়ে না।’

‘দাউদ ইমরান কোথায় থাকেন?’

‘খুব কাছেই একটা রেসিডেন্সিয়াল কলোনি আছে, সেখানে তিনি থাকেন।’

‘তিনি বাইরে থাকেন কেন?’

‘তিনি লেবানিজ নাগরিক, কিন্তু অনেক দিন বাস করছেন ইটালিতে। ঐ কলোনিতে তিনি একটি বাড়িও কিনেছেন।’

‘আপনাদের আর কোন বিজ্ঞানী বাইরে থাকেন?’

‘না।’

‘জনাব আমি দাউদ ইমরানের বাড়িতে যেতে চায়।’

‘কেন?’ ডঃ নুর আবদুল্লাহর কন্ঠে বিস্ময়।

‘এসব ঘটনার মূলে কে বা কারা আছে সেটা জোয়ানের বান্ধবি জেন জানে। কিন্তু তার কাছে যাওয়া তার জন্যে নিরাপদ নয়। আমার মনে হচ্ছে দাউদ ইমরান দ্বিতীয় ব্যক্তি যার কাছে কিছু জানা যেতে পারে।’

‘আপনি নিশ্চিত?’

সন্দেহটাকে কখনও নিশ্চিত বলা যায় না।’

আমি গবেষণা কেন্দ্রের শৃঙ্খলা, শান্তি ও সুনাম নিয়ে চিন্তিত।’ উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

‘আমিও এটা নিয়ে চিন্তিত জনাব। আমি এমন কিছু করব না যা আপনাকে এবং আমাদের এই প্রিয় গবেষণা কেন্দ্রকে বিপদে ফেলবে।’

ডঃ নুর আবদুল্লাহ কিছু বলল না। তার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। সে দৃষ্টিতে আস্থার আলো আছে। আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল সে, লাশ দুটোকে আমি মনে করি সাগরে ডুবিয়ে দেয়া দরকার। পুলিশের ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবেনা।’

ডঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডঃ আবদুল্লাহ জাবের দু’জনেই আহমদ মুসার কথায় সায় দিল। এবং ‘ডঃ নুর আবদুল্লাহ বলল, সব ব্যবস্থা আমি করছি।

‘ধন্যবাদ’, ‘দয়া করে দাউদ ইমরানের বাড়ির লোকেশানটার বিবরন দিন যাতে আমি চিনতে পারি।’ ডঃ নুর আবদুল্লাহকে বলল আহমদ মুসা।

‘কাউকে সাথে দেব?’

আমরা চারজন ছাড়া এ খবর কেউ জানবে না।'

'তাহলে আমি সাথে যেতে পারি। কিন্তু আপনি ওখানে গিয়ে কি করতে চান?'

'ওখানে কি ঘটবে আমি বলতে পারি না। তবে আমি একজন আগন্তুক হিসাবে যাব। বলব, সে লেবানিজ। আমি ফিলিস্তিনি। বেকার। তার খোজ পেয়ে আসলাম তার সাথে দেখা করতে।'

একটু থামলো আহমদ মুসা। থেমেই আবার শুরু করলো, 'আমি আপনাকে সাথে নেব না। আপনি মানে আই সি টি পি। আই সি টি পি'কে যতটা সম্ভব অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে দুরে রাখা দরকার।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ডঃ আবদুল্লাহ জাবের বলল, আমি আপনার পুরানো কর্মী। আমি সাথে যাব।'

'তুমি আমার পুরানো সাথী বটে, কিন্তু এখন তুমি ফিলিস্তিন রাষ্টের একজন দায়িত্বশীল। তুমি ধরা পড়লে কেলেংকারী হবে। আরেকটা কথা আমি ইচ্ছা করলে তো জোয়ানকেও সাথে নিতে পারি। তা নিতে পারছি না। আমার পরিকল্পনায় দ্বিতীয় জনের স্থান নেয়।'

ডঃ নুর আবদুল্লাহ দাউদ ইমরানের বাড়ির লোকেশানের একটা স্কেচ একে ফেলেছিল। ওটা তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা স্কেচটাতে ভালভাবে নজর বুলিয়ে পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'আমি তাহলে চলি, খোদা হাফেজ।'

আহমদ মুসা খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

দাউদ ইমরানের কলোনিটি সহজেই খুজে পেল আহমদ মুসা। বাড়িটি খুজে পেতে খুব কষ্ট হলো না। বাড়ির গেটে বাড়ির নম্বর প্লেট জ্বলজ্বল করছে লিওন সাইনে। তবে গেটে মালিকের নাম লেখা নেয়।

গেটে তালা দেওয়া নেয় আহমদ মুসা দেখলো। একটা হুক দিয়ে গেট এটে দেয়া আছে।

বাড়ির দিকে তাকালো আহমদ মুসা। নিচের তলা অন্ধকার। উপর তলায় একটা ঘরের জানালা দিয়ে আলোর রেশ পাওয়া যাচ্ছে।

আহমদ মুসা হুক খুলে গেট দিয়ে প্রবেশ করলো। গেট থেকে কংক্রিটের একটা রাস্তা আহমদ মুসাকে একটা খোলা দরজায় নিয়ে গেল। দরজার পরেই একটা হলঘর।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল ঘরে। অন্ধকার ঘর। অন্ধকারে যতটুকু বুঝল তাতে ঘরটাকে ড্রইং রুম বলেই মনে হলো। ড্রইং রুম থেকে দোতলায় উঠার সিড়ি।

আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে এগুলো। দোতলায় আলো দেখা গেছে, দোতলায় উঠবে সে।

সিঁড়িতে এক পা তুলতেই ঠান্ডা শক্ত কিছু এসে মাথার পেছনটা স্পর্শ করল। আহমদ মুসা মাথা ঘুরাতে যাচ্ছিল। সংগে সংগেই পেছন থেকে একটা ভারী কন্ঠ বলে উঠল মাথা গুড়ো হয়ে যাবে, চল উপরে। আহমদ মুসা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। পেছনে লোকটিও। তার রিভলবারের নলটি মাথা থেকে একটুও নড়ল না।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উঠে এল দোতালার ড্রইং রুমে। সেখানে আরও দু'জন বসেছিল।

তাদেরকে ঐভাবে ঢুকতে দেখে বসা দু জনের একজন বলে উঠল, কি সাঙাত? এ চিড়িয়া কে, কোথায় পেলে একে?

বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল, যেন ওর বাড়ি। এখন চিড়িয়াকে দেখতে হবে।

বলে রিভলবারধারী লোকটি ডানহাতে রিভলবার ধরে বামহাতে আহমদ মুসাকে সার্চ করতে লাগল। বসা দুজনও উঠে এল। তারাও সাহায্য করল সার্চ করতে।

কিন্তু, খুচরো কিছু কয়েন ও টাকা ছাড়া আহমদ মুসার পকেটে তারা তেমন কিছু পেল না।

বসা থেকে উঠে আসা একজন বলল, এ শূন্য চিড়িয়ারে, শুধু পণ্ডশ্রম হল।

রিভলবারধারী লোকটি রিভলবার পকেটে ফেলে আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, কে তুমি বাড়ীতে ঢুকেছিলে কেন?

আহমদ মুসা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বলল, আমি দাউদ ইমরানের কাছে এসেছি।

‘দাউদ ইমরানকে চেন?’ রিভলবারধারী লোকটিই বলল।

‘চিনি না, তার নাম শুনেছি। আই সি টি পি’তে চাকুরী করেন।

‘কেন তার কাছে এসেছ?

তিনি লেবাননী......

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই ড্রইং রুমের টেলিফোনটি বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে উঠে আসা দীর্ঘবপু তীরের মত ঋজু নেড়ে লোকটি বলল, ওকে একটা ঘরে আটকে রাখ। কথা আদায় করতে হবে, তার আগে কিছু করা যাবে না।

রিভলবারধারী লোকটিই দাউদ ইমরান। সে আবার রিভলবারটি হাতে তুলে নিয়ে আহমদ মুসাকে সামনের দিকে ইংগিত করে বলল, চল।

আহমদ মুসা চলতে শুরু করল। চলতে চলতে ভাবল, টেলিফোন আসাটা তার জন্য আশীর্বাদ হয়েছে। তা না হলে আরও কত প্রশ্ন আসত, উত্তরে মিথ্যার মালা গাথা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে, শুরুতেই এদের সাথে সংঘাত বাধানো যাবে না। আসল টার্গেট তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট ও স্যাম্পুল উদ্ধার। ওগুলো উদ্ধার না হলে তাদের এ মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং ক্ষতির পরিধি আরও বাড়বে। সংঘাতে যাওয়ার আগে জানতে হবে ওগুলো কোথায়। আহমদ মুসা খুশী হল, সে ঠিক জায়গায় এসেছে। বিজ্ঞানী দাউদ ইমরানের হাতে রিভলবার অর্থ তাকে সন্দেহ তাদের যথার্থ হয়েছে। সে একজন মীরজাফর, আত্মবিক্রয় করেছে শত্রুর কাছে।

আহমদ মুসাকে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকিয়ে দরজা লক করে দিয়ে দাউদ ইমরান চলে গেল।

ঘরটি ছোট। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। দেয়ালের সাথে তৈরী দামী কাঠের বুক সেল্ফ। তিনদিকে ঘুরানো। সেল্ফে ছড়ানো-ছিটানো কিছু বই আছে। কিন্তু সেল্ফের বেশীরভাগই খালি। টেবিলের

উপরও দু'টি বই পড়ে আছে। টেবিলের সাথে একটা চেয়ার ছাড়াও পাশে একটা ইজি চেয়ার পাতা।

আহমদ মুসা টেবিলের বই হাতে নিয়ে দেখল বিজ্ঞানের বই। সেল্ফ থেকেও কয়েকটা বই টেনে দেখল বিজ্ঞানের বই।

আহমদ মুসা বুঝল দাউদ ইমরানের স্টাডি রুম এটা। আহমদ মুসা চেয়ারে বসল।

টেবিলের তিনটি ড্রয়ার।

ড্রয়ার খুলল আহমদ মুসা। প্রথম ড্রয়ারে কয়েকটা সাদা প্যাড, পেন্সিল ও কলম পড়ে আছে।

দ্বিতীয় ড্রয়ারে কয়েকটা জার্নাল পাওয়া গেল। বিজ্ঞান সাময়িকীর সাম্প্রতিক কয়েকটা সংখ্যা। এগুলো ঘাটতে গিয়ে একটা হিব্রু ম্যাগাজিনের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা।

হাতে তুলে নিল ম্যাগাজিনটা। ফিলিস্তিনে থাকাকালে হিব্রু শিখেছিল আহমদ মুসা।

ম্যাগাজিনটির নাম 'দি ট্রুথ'। ইহুদিবাদী আন্দোলনের বিশ্ব-বিখ্যাত পত্রিকা।

আহমদ মুসা চমকে উঠল, দাউদ ইমরান হিব্রু জানে? কেন জানে? বিজ্ঞানী বলে কি?

'দি ট্রুথ'এর সাম্প্রতিক সংখ্যা ওটা। তাহলে দাউদ ইমরান কি ম্যাগাজিনটা নিয়মিত পড়ে? ভাবল আহমদ মুসা।

ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টাতে লাগল আহমদ মুসা। লক্ষ্য সংখ্যাটিতে কি আছে দেখা।

পাতা উল্টাতে গিয়ে ম্যাগাজিনের মধ্যে চারভাজ করা একটা কাগজ পেল আহমদ মুসা।

ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে চার ভাজ করা কাগজটি খুলল সে। একটা চিঠি হিব্রু ভাষায় লেখা।

‘প্রিয় ডেভিড’ সম্বোধন দিয়ে চিঠির শুরু। সম্বোধন পড়েই শিউরে উঠলো আহমদ মুসা। ‘দাউদ’ আসলে ‘ডেভিড’। ইহুদী সে। তবে হিব্রু জানা এজন্যই কি?

চিঠিটা পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা।

“প্রিয় ডেভিড,

তোমার রিপোর্ট প্রতিমাসেই আমরা ঠিকঠাক পেয়েছি। সবকিছুই আমরা জানতে পেরেছি। আমরা এখানে মনে করছি, আইসিটিপি আমাদের জন্য হুমকী হয়ে উঠেছে। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র ওর যেভাবে বাড়ছে এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের ওটা আশ্রয় ও ট্রেনিং দিচ্ছে, তাতে, আমাদের সিদ্ধান্ত, আইসিটিপি আর চলতে দেয়া যায় না। তুমি এ মাসেই তিনটি স্টিল কন্টেইনার পাবে। এগুলো তুমি আইসিটিপি’র সুনির্দিষ্ট তিনটি স্থানে মাটির তলায় গেড়ে দেবে। মাটি চাপা দেয়ার আগে কনটেইনারের লাল বোতামে চাপ দিয়ে ছিদ্রপথগুলো খুলে দেবে এরপর তোমার মিশন ওখানে শেষ।

আগামী দু’মাসের মধ্যেই তোমাকে আইসিটিপি এবং ট্রিয়েস্ট ছাড়তে হবে।

তোমার একান্ত

‘আইজাক’

রুদ্ধশ্বাসে চিঠি পড়ে শেষ করল আহমদ মুসা। বুক কেপে উঠল তার। সর্বনাশা যে রাহুগ্রাস ঘিরে ধরেছে স্পেনের শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স এবং মুসলিম ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নগুলো, সেই রাহুগ্রাস গ্রাস করতে আসছে সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম জাহানের গর্বের ধন ও আশা-ভরসার কেন্দ্র আইসিটিপি’কে। ইহুদীরা আইসিটিপি ধ্বংস এবং এখানে কার্যরত মুসলিম ও তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিনাশ করতে চায়।

আহমদ মুসা দ্রুত চিঠির তারিখের দিকে চোখ বুলাল। দেখল, এখন থেকে দেড় মাস আগের তারিখ। অর্থাৎ, ডেভিড ওরফে দাউদ তেজস্ক্রিয় পূর্ণ কন্টেইনার তিনটি অনেক আগেই পেয়ে গেছে এবং তা সে স্থাপনও করেছে

আইসিটিপির মাটির তলায়। আবার বুকটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা উঠে দাড়ালো।

‘দাউদ ইমরান তাহলে.........’ভাবল আহমদ মুসা, ইহুদী এবং ইহুদী এজেন্ট। দিনের পর দিন এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের সকল তথ্য পাচার করেছে সে ইহুদীদের কাছে। অবশেষে বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং বিজ্ঞানীদের বিনাশ করে সে চলে যাচ্ছে। যাবার আগে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করল তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং স্যাম্পল চুরি করে।

‘দাউদ ইমরান যত পাপ করেছে, ওকে পালাতে দেয়া যাবে না।’ ভেবে চলল আহমদ মুসা, আমাদের তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট উদ্ধার করতে হবে, সেই সাথে গবেষণা কেন্দ্রের কি কি ক্ষতি করেছে তাও জানতে হবে।

হাত দু’টো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল আহমদ মুসার। দরজার দিকে এগুলো সে। দরজা লক করা।

আহমদ মুসা তার সব সময়ের সাথী লেসার কাটার বের করে নিল জুতার সোল থেকে।

লকের কী হোলে লেসার বীম প্রয়োগ করে লক গলিয়ে হাওয়া করে দিল।

খুলে ফেলল দরজা।

এ স্টাডি রুম থেকে করিডর দিয়ে অল্প কিছু এগুলেই ড্রয়িং রুম যেখানে ওদেরকে বসে থাকতে দেখে এসেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা পা টিপে টিপে এগুলো ড্রয়িং রুমের দিকে।

ড্রইং রুম থেকে একজনের কন্ঠ শোনা যাচ্ছিল। আহমদ মুসা উকি দিয়ে দেখল, সেই দীর্ঘ দেহ তীরের মত ঋজু টাক মাথা লোকটি টেলিফোনে কথা বলছে। আহমদ মুসা কান পাতল।

‘না, ওদের দু’জনকে কোথাও পাওয়া যায়নি। টেলিফোনে বলছিল

টাক মাথা লোকটি, ‘লোক পাঠানো হয়েছিল রেস্ট হাউজে। কেউ সেখানে নেই, সেই রুমটিও বন্ধ। আমরা সন্দেহ করছি, ওরা নেই।’ সেই কক্ষের দরজা এবং বাহিরটা পানি দিয়ে ধোয়া দেখা গেছে, আর সেখানে তাজা রক্তের গন্ধ পাওয়া গেছে।’ একটু থামল লোকটি। সম্ভবত: কথা শুনে নিয়ে আবার সে

বলল, ‘ কি জানি আমরা বুঝতে পারছি না। জোয়ান ঐ ঘরে একা ছিল। এমন কিছু ঘটার কথা নয়, কিন্তু ঘটেছে।’ থেমে ওপারের কথা শোনার পর আবার সে বলল, ‘না, গবেষণা কেন্দ্রের কারো পক্ষে এ ধরনের কিছু করা সম্ভব নয়। নিশ্চয় তৃতীয় কোন পক্ষ জড়িত হয়েছে।

‘হ্যাঁ ডেলিগেশন আজ রাতেই মাদ্রিদে ফিরে যাচ্ছে। আজ রাতেই আমরা চলে আসছি। দাউদ গোছ-গাছ করছে।’

‘ও, কে, বায়।’

টেলিফোন রেখে লোকটি পাশের করিডোর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। আহমদ মুসা অনুমান করল দাউদের বেডরুম এ দিকেই হবে।

আহমদ মুসা সবে দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে ড্রইং রুমের দিকে পা তুলতে যাবে, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনল, একদম পেছনেই।

সংগে সংগে আহমদ মুসার মাথা গাছ থেকে পড়া পাকা ফলের মত ঝুপ করে নিচের দিকে পড়ে গেল, আর দু’টি পা তার উপরে উঠে ধনুকের মত বেঁকে তীব্র বেগে ছুটে গেল পেছনের দিকে।

পেছনের লোকটির হাতের রিভলবারটা সবে উপরে উঠতে যাচ্ছিল। এই সময় সামনে ভোজবাজির মত দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে আহমদ মুসার জোড় পায়ের লাথি এসে লোকটির হাত সমেত বুকে তীব্র বেগে আঘাত হানল। হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল, সেও করিডোরের মেঝেতে সটান চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল্

আহমদ মুসার পা দু’টি মাটি স্পর্শ করতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দেখল, লোকটি সেই দীর্ঘদেহী লোকটির সাথী। এরও মাথা নেড়ে। লোকটির ডান হাতের পাশেই রিভলবারটি।

আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির উপর।

লোকটি রিভলবার হাতে তুলে নিতে পারল না। হাতের ধাক্কা খেয়ে রিভলবারটি আরেকটু সরে গেল।

আহমদ মুসা লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েই তার ডান হাতের একটা ঘুষি চালাল লোকটির বাম চোখের উপরে কানের পাশের নরম জায়গাটায়। সেই

সাথে লোকটির উঁচু করা মাথাটাও ভীষণভাবে আঘাত খেল মেঝের সাথে। লোকটি জ্ঞান হারল।

আহমদ মুসা লোকটির রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে ভারি গলায় বলে উঠল, রিভলবার ফেলে দাও। এক মুহূর্ত দেরী করলে মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গেই হাত থেকে রিভলবার ছেড়ে দিল এবং ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, সেই দীর্ঘদেহী লোকটি আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে রিভলবার তুলে স্থির দাঁড়িয়ে গজ দুয়েক দুরে।

আহমদ মুসা ঘুরতেই লোকটি বলে উঠল, তুমি যে বড় ঘুঘু হবে, তা আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল। কোন সাধু লোক এত রাতে এভাবে কারও বাড়িতে প্রবেশ করে না।

একটু থামল লোকটি, তারপর রিভলবার নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, বুঝেছি তুমিই আমাদের দু'জনকে হত্যা করেছ রেস্ট হাউজে। তোমাকে এখনি কুকুরের মত গুলি করে মারতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তা করব না। জানতে হবে তুমি কে?

বলে সে মেঝেয় পড়ে থাকা অজ্ঞান লোকটির দিকে ইংগিত করে বলল, নাও ওকে, বেডে পৌছে দাও।'

আহমদ মুসা সুবোধ বালকের মত তার হুকুম তালিম করল। আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়াল লোকটির মাথার কাছে। তারপর নিচু হয়ে দু'হাত লোকটির বগলের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে লোকটিকে তুলতে লাগল।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা।

আহমদ মুসা অজ্ঞান লোকটিকে বুক বরাবর তুলেই বিদ্যুৎ গতিতে ছুড়ে দিল সামনের দীর্ঘবপু লোকটিকে লক্ষ্য করে।

শেষ মুহূর্তে লোকটি বুঝতে পেরেছিল। গুলিও করেছিল আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে। কিন্তু আহমদ মুসা অজ্ঞান লোকটিকে ছুড়ে দেয়ার জন্য পেছন দিকে ঝুকতে গিয়ে অনেক খানি নিচু হয়েছিল। আর ছোড়ার বেগে অজ্ঞান লোকটিই বেশ উচুতে উঠেছিল। গুলী এসে আঘাত করল অজ্ঞান লোকটিকেই।

গুলী খাওয়া অজ্ঞান লোকটি গিয়ে আছড়ে পড়ল দীর্ঘবপু লোকটির উপর। দু'জনেই ছিটকে পড়ল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দ্রুত ছুটে গিয়ে লোকটির হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবারটি তুলে নিল।

তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, দীর্ঘবপু লোকটি পকেট থেকে আরেকটি রিভলবার হাতে তুলে নিয়েছে। রিভলবারের নলটি দ্রুত ছুটে আসছে আহমদ মুসার দিকে। ভিজে গেছে লোকটির বুক গুলীবৃদ্ধ অজ্ঞান লোকটির লাল রক্তে। তার চোখ দু'টিই রক্তের মত লাল। খুনি হয়ে উঠেছে সে।

আহমদ মুসার রিভলবার তাকে সুযোগ দিল না। উদ্‌গিরণ করল। লোকটি মাথা তুলেছিল গুলী করার জন্যে। গুড়ে হয়ে গেল তার সে মাথা।

গুলী করার পর আহমদ মুসা মুহূর্তকাল চিন্তা করল। দাউদ কোথায়। গুলীর শব্দ শোনার পর তার তো বের হবার কথা। বেড় রুমে কি সে নেই।

কোন দিকে যাবে যখন চিন্তা করছে সে সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। কেউ যেন দ্রুত উপরে উঠে আসছে।

আহমদ মুসা একটু সরে গিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালো। পায়ের শব্দে বুঝল লোকটি সিঁড়ি থেকে উপরে উঠে এসেছে। করিডোরের মুখে ড্রয়ইরুমের প্রান্তেই পড়ে ছিল ওদের দু'জনের লাশ। সিঁড়ি থেকে উঠে ড্রইংয়ে পা দিলেই যে কেউ তা দেখতে পাবে।

আহমদ মুসা আড়াল থেকে উঁকি দিল। দেখল, রিভলবার হাতে দাউদ আতংক-বিহবল দৃষ্টিতে লাশ দু'টির দিকে তাকিয়ে। তার রিভলবারটি উদ্যত, কিন্তু কোন টার্গেটে নয়। আহমদ মুসা এক ঝটকায় বেরিয়ে এল দেয়ালের আড়াল থেকে। দাউদ ইমরানের দিকে রিভলবার উদ্যত করে বলল, রিভলবার ফেলে দাও ডেভিড। ইহুদী স্পাই সেজেছ বিজ্ঞানী। তোমার খেলা এবার সাঙ্গ।

দাউদের চোখ দু'টি জ্বলে উঠল। সে রিভলবার ফেলে দিল না। বিদ্যুৎ গতিতে তা ঘুরে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার রিভলবার রেডি ছিল দাউদের রিভলবার ধরা হাত লক্ষ্যে গুলী করল সে।

দাউদের রিভলবার ধরা হাত ঘুরে এসে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আর উঠতে পারল না। তার গুলীবিদ্ধ হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ল। বা হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে সে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা এসে দাউদের সামনে দাঁড়াল। বলল, মি: ডেভিড তোমার কৃর্তির সবই আমি জানি। এখন বল, সেই স্যাম্পুল এবং তেজস্ক্রিয় রিপোর্টটি কোথায় রেখেছ?

'কে আপনি, সে রিপোর্টের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?' হাতের যন্ত্রণায় মুখ বাঁকা করে বলল দাউদ।

'আমি কে তা জেনে তোমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি যা জিজ্ঞেস করেছি, তার জবাব দাও।

'ওসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কিছু জানি না।'

'দেখ মনে করো না ঐ তথ্যটা আমার খুবই দরকার এবং ঐ তথ্যের জন্যে তোমার মাথায় এখনও গুলী করিনি। আমি জানি ওগুলো কোথায়।'

'কেন তাহলে বাঁচিয়ে রেখেছেন?'

'তুমি যা পাপ করেছ তার বিচার হতে হবে, শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান কেন্দ্র ধ্বংসের জন্যে তেজস্ক্রিয় সেট পেতেছ বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাটির তলায়।'

দাউদের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি কে?'

'বলেছি, আমার পরিচয় দিয়ে তোমার কাজ নেই।'

'তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট কোথায় আপনি জানেন?'

'হ্যা জানি, ওটা স্পেন থেকে শিক্ষা সফরে আসা দলের দলনেতার হাতে।'

আবার দাউদের চোখে একরাশ বিস্ময় ফুটে উঠল।

বসতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, উঠে দাঁড়াও, তোমার ফার্স্ট এইড বক্স কোথায় বের কর।'

দাউদ উঠে দাঁড়াল।

চলতে শুরু করল তার বেড রুমের দিকে। আহমদ মুসা তার পিছে পিছে।

বেড় রুমের থাক থেকে ফার্স্ট এইড বক্স বের করে আনল দাউদ। তারপর আহমদ মুসার নির্দেশে সে বাক্সটি খুলল এবং আহমদ মুসার নির্দেশেই সে ওষুধে তুলা ভিজিয়ে হাতের ক্ষতের উপর তা চাপিয়ে দিল।

দাউদের ডান হাতের গোড়ার দিকটা সহ হাতের ঐ অংশটা একদম বিধ্বস্ত হয়েছে।

আহমদ মুসা হাতের রিভলবার পাশে সরিয়ে রেখে দাউদের ক্ষতস্থানে আরও কিছু তুলা লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল।

আহমদ মুসা যখন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল, তখন দাউদের একবার মনে হয়েছিল, বাম হাতের এক ঘুসি দিয়ে তার শত্রুকে কুপোকাত করতে পারে। কিন্তু পরক্ষনেই সে ভেবেছিল, লোকটি সোজা নয়। ইহুদি এজেন্সি ইরগুন জাই লিউমি'র বিশ্বখ্যাত দুই দুর্ধষ্য যোদ্ধাকে সে এইমাত্র হত্যা করেছে। আর নার্ভটা তার ভয়ানক রকম শক্ত না হলে হাত খালি করে এভাবে শত্রুর কাছাকাছি সে আসতো না।

যত্নের সাথে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে দাউদের মনে আবার প্রশ্ন জাগল, শত্রুর ভাল-মন্দের দিকে মনোযোগী এই লোকটি কে? এমন শত্রুকে সে তো কোনদিন দেখেনি।

কিছু বলতে যাচ্ছিল দাউদ, তার আগে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট এইড বক্স থেকে দু'টুকরো সিল্কের কর্ড তুলে নিল। এক টুকরো দিয়ে দাউদের দু'টি হাত পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেলল।

'আহত লোককেও ভয় করেন?' বলল দাউদ।

'না ভয় নয়। ঝামেলা এড়াতে চাই।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল চলুন।

'কোথায়?'

'নিচে আপনার গাড়িতে।'

দাউদকে নিয়ে আহমদ মুসা নিচে নেমে এল। গাড়ি বারান্দাতেই দাঁড় করানো ছিল দাউদের গাড়ি। চাবিও ছিল গাড়ির সাথেই।

আহমদ মুসা গাড়ির পেছনের লাগেজ কেবিনটা খুলে সেখানে ঢুকিয়ে দিল দাউদকে। তারপর মুখে রুমাল পুরে দিয়ে লাগেজ কেবিন লক করে ফেলল।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল আহমদ মুসা।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

জেনরা অর্থাৎ স্পেন থেকে আগত শিক্ষা সফরের লোকরা কোথায় উঠেছে আহমদ মুসা জানে। জোয়ান কোথায় উঠেছে, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, সেটা খোঁজ করতে গিয়েই সে জানতে পারে গবেষণা কেন্দ্রের গেটম্যানের কাছ থেকে যে, স্পেন থেকে শিক্ষা সফরে আসা একটি টিম উঠেছে গবেষণা কেন্দ্র থেকে একটু পুবে সাগর-তীরের 'সি-কুইন' নামক মোটেলে।

আহমদ মুসা অনুমানেই ধরে নিল মোটেলটি কোথায় হবে।

আড্রিয়াটিকের বেলাভূমি। বেলা ভূমির প্রান্ত ঘেঁষে এগিয়ে গেছে প্রশস্ত একটি পাকা রাস্তা। সেই পাকা রাস্তার উত্তর পাশ ঘেষে মোটেলের সারি। প্রত্যেক মোটেলের প্রবেশ গেটে মোটেলের নাম। রাতে লিওন সাইনের আলোতে তা জ্বলজ্বল করছে। রাস্তা থেকে তা পরিস্কার পড়া যায়।

আহমদ মুসা তিনটি মোটেল পেরিয়েই সামনের মোটেলটার লিওন সাইনে 'সি কুইন' নাম দেখতে পেল।

প্রধান রাস্তা থেকে একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা বেরিয়ে মোটেলের গাড়ি বারান্দায় গিয়ে ঠেকেছে।

'সি কুইনের' গাড়ি বারান্দায় আগে থেকেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসার গাড়ি গিয়ে সেই গাড়ির পাশে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে। গাড়ি থেকে নেমে দেখল, একজন লোক দু'টো ব্যাগ ও একটি সুটকেশ ভেতরের দিক থেকে এনে দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রবাসে উঠাতে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝল, শিক্ষা সফরের দলটি তাহলে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ঢুকে গেল ভেতরে।

ঢুকেই পেল রিসেপশন কাউন্টার। সেখানে একজন লোক বসে।

‘স্পেনের শিক্ষা সফরে আসা দলটির দলনেতা কত নম্বরে।’ স্পেনীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘ঐ তো উনি আসছেন, চলে যাবেন উনি এখনি।’

আহমদ মুস ফিরে তাকাল রিসেপশনিস্ট–এর ইংগিত লক্ষ্য করে। দেখল, একজন মধ্য বয়সী লোক এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটা ব্রিফকেস। লোকটির দু’পাশে এবং পেছনে কয়েকজন। তাদের মধ্যে জেনও।

জেন আহমদ মুসাকে দেখে ফেলেছে। আহমদ মুসাকে থেকে জেনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। তার চোখ দু’টি বড় বড় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে সামান্য কোন পরিবর্তনও এল না। যেন কোনদিনই সে জেনকে দেখেনি।

জেনও নিজেকে সামলে নিয়েছে। কিন্তু তার মনটা থর থর করে কাঁপছে। সে জানে, আহমদ মুসা বিনা কারণে আসেনি, কি ঘটে কে জানে। সে মনে মনে প্রার্থনা করল, হে ঈশ্বর, তুমি ন্যায়ের পথে সংগ্রামী আহমদ মুসাকে, মজলুম জোয়ানকে সব বিপদ থেকে নিরাপদ কর।

ওরা এগিয়ে এলে আহমদ মুসা দু’ধাপ সামনে এগিয়ে দলনেতা লোকটির মুখোমুখি হয়ে বলল, গুড নাইট, আপনি কি শিক্ষা সফর টিমের দলনেতা?’

‘হ্যাঁ, আপনি কে?’

‘আমাকে চিনবেন না, আপনাদের কথা শুনে এলাম। আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।’

‘আমাকে? আমি তো যাবার জন্যে বেরিয়েছি। চলুন গাড়িতে বসে শুনব আপনার কথা।’

‘সবাই কি চলে যাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ যাচ্ছে, রাত দু’টার প্লেনে। আমার একটু কাজ আছে। তাই আগে বের হচ্ছি। যাচ্ছি এক বন্ধুর বাসায়।’

‘আপনি মি...।’

‘আমি অধ্যাপক ভিলারোয়া।’

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল তাদের মধ্যে।

তারা হাঁটছিল গাড়ি বারান্দার দিকে।

মিঃ ভিলারোয়ার পাশাপাশি হাঁটছিল স্কিন হেডেড একজন লোক। বয়স হবে পঁয়ত্রিশের মত। লোকটি শুরু থেকেই আহমদ মুসাকে দেখে ভ্রুকুচকে ছিল।

আহমদ মুসাও তাকে লক্ষ্য করছিল।

গাড়ি বারান্দায় পৌঁছে স্কিন হেডেড লোকটি আহমদ মুসা যে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সে গাড়ির দিকে তাকিয়েই ফিরে দাঁড়াল আহমদ মুসার দিকে। লোকটির চোখে তখন ক্রুর দৃষ্টি। বলল সে, এই গাড়িতেই আপনি এসেছেন?

লোকটি পকেটে হাত দিয়েছে।

আহমদ মুসার হাত আগে থেকেই পকেটে। বলল, হ্যাঁ, গাড়ি আমিই এনেছি।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই লোকটির হাত বেরিয়ে এসেছে পিস্তল সমেত। আহমদ মুসারও।

আহমদ মুসা হিসেবটা আগেই সম্পূর্ণ করেছিল। দু’জনের হাতে রিভলবার বেরিয়ে আসলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন একজনকে মরতেই হবে। আহমদ মুসা রিভলবার বের করেছিল সিদ্ধান্ত নিয়েই। সুতরাং স্কিন হেডেড লোকটি রিভলবার বের করে যে সময়টা সিদ্ধান্ত নিতে ব্যয় করেছে, সে সময়ে আহমদ মুসার বুলেট গিয়ে তার বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল।

ঢলে পড়ল তার দেহ মিঃ ভিলারোয়ার পায়ের কাছে।

কি ঘটে গেল বুঝে নিয়ে সবাই যখন আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলল, তখন দেখল আহমদ মুসার রিভলবারটি মিঃ ভিলারোয়ার দিকে স্থিরভাবে উদ্যত। নিহত লোকটির পিস্তলটিও তখন আহমদ মুসার বাম হাতে।

‘মিঃ ভিলারোয়া আপনার স্যুটকেশ এবং দু’টি ব্যাগ মাইক্রোবাসে উঠেছে, ওগুলো এই মুহূর্তে আমার গাড়িতে তুলে দিতে বলুন। এক মুহূর্ত দেরী করলে আপানা মাথা এবার গুড়ো হবে।

কাঁপছিল মিঃ ভিলারোয়া। সংগে সংগেই কিছু দূরে দাঁড়ানো বেয়ারাকে নির্দেশ দিল স্যুটকেশ ও ব্যাগ দু’টো আহমদ মুসার গাড়িতে তুলে দিতে।

বেয়ারা মুহূর্তকাল দেরী না করে নির্দেশ পালন করল।

আবার মুখ খুলল আহমদ মুসা। বলল, 'মিঃ ভিলারোয়া আমার গাড়িতে উঠুন।'

মিঃ ভিলারোয়ার কম্পন বেড়ে গেল। কথা বলতে চেষ্টা করেও পারল না।

জেন মিঃ ভিলারোয়ার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সকলের মধ্যে সেই মাত্র স্বচ্ছন্দভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যেত, তার চোখে-মুখে ভয়ের যে ভাবটা ছিল তা এখন নেই। সেই মুখ খুলল, তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?

'ভয় নেই ম্যাডাম, ওঁর কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের চুরি করা জিনিস উদ্ধার হলেই ওঁকে ছেড়ে দেব।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার তাঁর রিভলবার নাচিয়ে বলল, মিঃ ভিলারোয়া আমি এক আদেশ দু'বার করি না।'

মি:ভিলারোয়া কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে গাড়িতে চড়ল। আহমদ মুসা গিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিল। ড্রাইভিং সিটের পাশেই বসেছিল অধ্যাপক ভিলারোয়া।

আহমদ মুসার গাড়ি যখন প্রধান রাস্তায় উঠে চলতে শুরু করেছে, তখন দূরে বিপরীত দিক থেকে একটি পুলিশের গাড়িকে দ্রুত 'সি-কুইনের' দিকে আসতে দেখা গেল।

কিছু দুর চলার পর আহমদ মুসার গাড়ির আলো নিভিয়ে দিল তারপর রাস্তা থেকে গাড়িকে সাগরের বেলাভূমিতে নামিয়ে নিল এবং একটি ঝোপের আড়ালে গিযে দাঁড়াল।

'মি: ভিলারোয়া, গবেষণা কেন্দ্র থেকে আপনারা যে স্যাম্পুল ও তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট চুরি রেছেন, সেটা বের করে দিন। এখনই আপনি ছাড়া পাবেন। আর যদি মিথ্যা বলে হয়রান করেন, তাহলে আপনার কি পরিণতি হবে তা দেখেছেন।' ধীর, কিন্তু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমি ওগুলো চুরি করিনি, ওরাই ওগুলো আমাকে গছিয়েছে স্পেনে বয়ে নেবার জন্যে। আমার ব্রীফকেসে ওগুলো আছে। দিয়ে দিচ্ছি।' কাঁপা গলায় বলর মি: ভিলারোয়া।

মি: ভিলারোয়া মুখে কথা বলার সাথে সাথে ব্রিফকেস খুলে ভেতর থেকে একটা ইনভেলাপ ও একটি প্লাস্টিক থলে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল।

আহমদ মুসা গাড়ির ভেতরের লাইট অন করে ওগুলো পরীক্ষা করে পকেটে রেখে দিল।

'ধন্যবাদ মি: ভিলারোয়া, আপনার কোথায় যেন যাবার কথা ছিল? যাবেন সেখানে?'

'আমি জানি না, সাথের ঐ লোকটিই নিয়ে যাচ্ছিল।'

'তাহলে এখন মটেলে যাবেন?'

'জি।'

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

'তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল দিয়ে আপনি কি করতেন?

জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'আমার দায়িত্ব ছিল শুধু বহন করা। মাদ্রিদে পৌছলেই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মি: ভাসকুয়েজের লোক এসে এসব নিয়ে যাবার কথা।'

রাস্তায় উঠে আহমদ মুসা গাড়ির আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। 'সি-কুইন' মটেলের সামনে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা।

'দু:খিত মি: ভিলারোয়া আপনাকে একেবারে মটেলে পৌছে দিতে পারলাম না। পুলিশ ঝামেলা করবে।' বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি থামতেই মি: ভিলারোয়া বুঝে নিয়েছিল, তাকে এখানেই নামতে হবে।

'ধন্যবাদ' বলে গাড়ি থেকে স্যুটকেশ, দু'টি ব্যাগ ও ব্রিফকেস নিয়ে নেমে পড়ল মি: ভিলারোয়া।

গাড়ি স্টার্ট নিল আহমদ মুসার। তার গাড়ি গবেষণা কেন্দ্রের দিকে।

তার গাড়ি দাঁড়াল গিয়ে গবেষণা কেন্দ্রের রেস্ট হাউজের গেটে। গাড়ি দাঁড়াতেই গেট রুমের জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল গেঁটম্যান।

'ড: নুর আব্দুল্লাহ ভেতরে আছেন?'

‘চলে গেছেন।’

‘একা?’

‘না, মেহমানদের সমেত।’

‘কোথায়, ওর বাসায়?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘বাসা কোথায়?’

‘কমপ্লেক্সের ভেতরে, গবেষণা কেন্দ্রের পাশেই।’

‘ধন্যবাদ।

বলে আহমদ মুসা তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। কমপ্লেক্সের গেট সে চেনে।

গেটের সামনে গাড়ি পৌছতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল গেট খোলা। ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত ১২টা। এ সময় তো গেট খোলা থাকার কথা নয়।

গেটের মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল আহমদ মুসা।

গেটের একটা পাল্লা পুরো খোলা, আরেকটা পাল্লা অর্ধ খোলা। গেটরুম শূণ্য।

আহমদ মুসা অবাক হলো গুরুত্বপূর্ণ এই গেটের অবস্থা দেখে। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, অস্বাভাবিক কিছু তো ঘটে যেতে পারে! একবার হামলা ব্যর্থ হয়েছে, আরেকটা হামলা তো আসতে পারে! দাউদের বাড়ির ঘটনা ইতিমধ্যে তারা জানতেও পারে। সতর্ক হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

সে পা বাড়াবে ড: নুর আবদুল্লাহর বাড়ির দিকে যাবার জন্যে এমন সময় সে দেখতে পেল কমপ্লেক্সের দিক থেকে দুটো হেডলাইট এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা দ্রুত গেট রুমের একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

এগিয়ে আসা গাড়িটি গেটের কাছাকাছি এসে স্পিড কমিয়ে দিয়ে দু’বার হর্ন বাজাল। হর্ন শুনেই আহমদ মুসা বুঝল ওটা ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি’র সংকেত। নিশ্চিত হলো ওটা দাউদের দলের গাড়ি।

হর্ন বাজানোর কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। তার পরেই গাড়ি থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল। আর সংগে সংগেই ক্রিকেট বলের মত গোলাকার একটা বস্তু

ছুটে গেল আহমদ মুসার গাড়ির লক্ষ্যে। গোলাকার বস্তুটি সরাসরি গিয়ে আঘাত করল আহমদ মুসার গাড়িতে। সংগে সংগেই প্রচন্ড বিষ্ফোরণ। টুকরো টুকরো হয়ে গেল আহমদ মুসার গাড়ি।

এগিয়ে আসা গাড়িটি মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল। আবার নড়ে উঠল।

আহমদ মুসার কাছ থেকে গাড়ির দূরত্ব পাঁচ'ছ গজের মত। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল গাড়ি থামাতে হবে। নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটিয়ে ফিরে যাচ্ছে শত্রুর গাড়িটি।

গোলাকার সেই বস্তু অর্থাৎ গ্রেনেডটি ছোঁড়া হয়েছিল ড্রাইভারের সিট থেকে। সে জানালা খোলা।

আহমদ মুসা রিভলবার তুলে গুলী করল ড্রাইভারের আবছা অবয়বটা লক্ষ্য করে।

একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে এল। একবারই মাত্র। তারপর গাড়িটা একটু বেঁকে গিয়ে থেমে গেল।

গাড়ির মাথাটা বেঁকে এল গেট রুমের দিকেই। নিকটতর হলো গাড়িটা এবং গাড়ির দু'পাশটা এখন আহমদ মুসার চোখের সামনে। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল এই অযাচিত সাহায্যে।

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে একজন হাত উঁচু করে গেট রুম লক্ষ্যে গুলী করতে করতে গাড়ির ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা এরই অপেক্ষা করছিল রিভলবার বাগিয়ে। লোকটির মাথা উঁচু হবার সাথে সাথেই ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা ওর মাথা লক্ষ্যে।

মাথাটা আর ওর উঠল না দেহটা তার খসে পড়ল গাড়ির দরজাতেই।

আর কেউ বেরুল না গাড়ি থেকে। গুলীও এল না।

আহমদ মুসা ভাবল, গাড়িতে শত্রু পক্ষের কেউ থাকতে পারে। আহমদ মুসা আড়াল থেকে বের হওয়ার অপেক্ষা করতে পারে।

এই সময় আহমদ মুসা কমপ্লেক্সের দিক থেকে কয়েকজনকে আসতে দেখল। সেই সাথে ভেতর থেকে গাড়ির দরজায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল শত্রু পক্ষের কেউ নেই। নিশ্চয় কাউকে ওরা বন্দী করে এনেছিল তারাই বের হবার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা ছুটে গেল গাড়ির দিকে।

গাড়ির কাঁচে ডার্ক শেড দেয়া। বাইরে থেকে কিছুই দেখা গেল না।

আহমদ মুসা সামনের গেট দিয়ে লাশ ডিঙিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। তার হাতে তখন উদ্যত রিভলবার।

'মুসা ভাই দরজা খুলে দিন, আমরা বাঁধা।' জোয়ানের কণ্ঠ। আহমদ মুসা দ্রুত দরজা অন-লক করে দিয়ে বাইরে এসে দরজা খুলে দিল্

প্রথম বেরিয়ে এল জোয়ান, তারপর একে একে ড: নুর আবদুল্লাহ এবং ড: আবদুল্লাহ জাবের। তাদের সকলকেই পিছমোড়া করে বাঁধা।

এই সময় গবেষণা কেন্দ্রের নিরাপত্তা কর্মীসহ অন্যান্য লোকজন এসে পড়ল। তারা বাঁধন খুলে দিল সকলের।

বাঁধন খুললেই ড: নুর আবদুল্লাহ এসে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, ঠিক সময়ে আপনি এসে না পড়লে কি যে হতো! আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আহমদ মুসার মাথায় তখন অন্য চিন্তা গবেষণা কেন্দ্রের ভেতরে এসব হত্যাকান্ড ও ঘটনার একটা ব্যাখ্যা গবেষণা কেন্দ্রকে দিতে হবে।

চিন্তা করে নিয়ে আহমদ মুসা ডঃ নূর আব্দুল্লাহকে বলল, জনাব পুলিশ ষ্টেশনে খবর দিতে হবে। বলতে হবে আজ গবেষণাগার থেকে একটা গবেষণা রিপোর্ট চুরি হওয়ার পর এসব ঘটনা ঘটেছে। আপনারা কিডন্যাপ হবার পর যা ঘটেছে তার বাইরে আপনারা কিছুই জানেন না। সামনের গাড়ী ধ্বংস হবার পর ওদের গুলীতেই এ' দু'জন মরেছে। পরে কমপ্লেক্সের লোকজন আপনাদের উদ্ধার করেছে।

গবেষণা কেন্দ্রের সিকুরিটি চীফও আহমদ মুসার কথাগুলো শুনছিল। বলল, অর্থাৎ আমাদের শুধু একটা বিষয়ই গোপন করতে হবে, সেটা হলো, এ দু'জন আপনার হাতে নিহত হওয়া।

‘কারণ আমি সাক্ষ্য দেবার জন্য ইটালীতে থাকতে পারবো না, এ কারণেই।

‘ঠিক আছে জনাব, বলল সিকুরিটি চীফ।

সিকুরিটি চীফ ইসমত আবেদিন তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন ইটালীয় মুসলিম। ইটালীয় আর্মির একজন অবসর প্রাপ্ত কর্ণেল। ট্রিয়েস্টেই তার বাড়ি। পুলিশ ও প্রশাসন মহলে তার পরিচিতি ব্যাপক।

‘মিঃ ইসমত আপনিই আমার পক্ষ থেকে পুলিশ স্টেশনে ডাইরি করুন। সব আপনি শুনলেন, অন্য সব বিষয় আপনি জানেন। যে ভাবে লিখতে হয়, লিখবেন।

কথা শেষ করে ডঃ নুর আব্দুল্লাহ বলল, দারোয়ান কোথায়? পালালেও সে তো এতক্ষণ আসার কথা।

‘আমি দেখছি স্যার। বলে ইসমত আবেদিন গেট রুমের দিকে গেল।

গেট রুমের ভিতরে গিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, এখানে পড়ে আছে, কে যেন তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে।

‘ও যেভাবে আছে সে ভাবেই থাক’। বলল আহমদ মুসা।

ইসমত আবেদিন ফিরে এলো।

তার গ্যারেজ থেকে গাড়ী নিয়ে চলল পুলিশ স্টেশনে।

‘জনাব আপনার সাথে আমার অত্যন্ত জরুরি আলাপ আছে, এখনি সে আলাপ করতে হবে। ডঃ নূর আব্দুল্লাহকে বলল আহমদ মুসা।

‘চলুন আমার বাসায় ফেরা যাক’।

বলে ডঃ নূর আব্দুল্লাহ যাবার জন্যে পা তুলতে তুলতে বলল, অন্যান্য লোকদের লক্ষ্য করে। গেটটা এভাবেই থাকবে, তোমরা এখানেই থাক, সব যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

ডঃ নূর আব্দুল্লাহ, ডঃ আব্দুল্লাহ জাবের, জোয়ান এবং আহমদ মুসা পাশাপাশি হেঁটে চলল, ডঃ নূর আব্দুল্লাহর বাড়ীর দিকে।

ডঃ নূর আব্দুল্লাহর বৈঠকখানায় বসে আহমদ মুসা রেষ্ট হাউজ থেকে যাবার পর দাউদের বাড়িতে পৌছা, দাউদের হাতে তার বন্দী হওয়া, ইহুদী

গোয়েন্দা সংস্থার চিঠিটি থেকে দাউদের প্রকৃত পরিচয় ও তার কুকৃর্তির সব ঘটনা জানা, বন্দী দশা থেকে মুক্ত হওয়া, দু'জন ইহুদী গোয়েন্দাকর্মীকে হত্যা, দাউদকে আহত করা, দাউদকে গাড়ীর লাগেজ কেবিনে পুরে মটেল 'সি কুইন' যাওয়া সেখানকার ঘটনায় আরেক ইহুদী গোয়েন্দা কর্মীকে হত্যা এবং অধ্যাপক ভিলারোয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং তার কাছ থেকে 'তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট ও স্যাম্পুল উদ্ধার করা, প্রভৃতি সব ঘটনা বলা শেষ করে বলল, কমপ্লেক্সের গেটে যা ঘটল তা তো আপনারা দেখছেন।

ঘটনা শুনার পর কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলনা। ডঃ নূর আব্দুল্লাহর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ গবেষণা কেন্দ্র ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়ের শিকার হওয়ার কথা শুনে। কিছুক্ষণ পর ভাঙা গলায় বলল, আমাদের গবেষণা কেন্দ্রেও ওরা সেই ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় পেতেছে। আমাদের সব তথ্য দাউদ পাচার করেছে ইহুদী সংস্থার কাছে। দাউদ তাহলে ইরগুন জাই লিউমি'র গোয়েন্দা কর্মী ডেভিড ইমরান।

বলে অনেক্ষণ মুখ নিচু করে থাকল ডঃ নূর আব্দুল্লাহ। যখন মুখ তুলল, দেখা গেল তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। কাঁপা গলায় বলল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা, আপনি সবার বহু সাধের এ গবেষণা সংস্থাকে অবশেষে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করেছেন। আমি বিজ্ঞানী ডঃ সালামের এ পবিত্র আমানতের হেফাজত করতে পারিনি। আমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম না। আমার বুঝা উচিত ছিল মুসলিম জগৎ ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার চেষ্টা অনেকেই করবে।

ডঃ নূর আব্দুল্লাহর শেষের কথা আবেগে ভেঙে পড়ল। আহমদ মুসা দাউদের কাছে লিখা ইরগুন জাই লিউমি'র চিঠিটি ডঃ নূর আব্দুল্লাহর হাতে দিতে দিতে বলল, অতীত এখন অতীত ডঃ নূর আব্দুল্লাহ। আমাদের এখন বর্তমান নিয়ে ভাবতে হবে। আল্লাহর অশেষ প্রশংসা যে তিনি ওদের ষড়যন্ত্র অবশেষে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

দাউদ তাহলে ও গাড়ীটার লাগেজ কেবিনে ছিল, বিস্ফোরণে তাহলে সেও শেষ হয়ে গেছে। চিঠিতে নজর বুলাতে বুলাতে বলল ডঃ নূর আব্দুল্লাহ।

'জি হ্যাঁ, এটাই ঘটেছে। যদিও তার এ পরিণতি আমি চাইনি। আমি বন্দী করে নিয়ে এসেছিলাম এজন্যেই যে, তার কাছ থেকে আরও কথা পাওয়া যাবে। কিন্তু সে সুযোগ হলো না।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে পকেট থেকে তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট বের করে ডঃ নূর আব্দুল্লাহর হাতে দিয়ে বলল, রিপোর্ট কি বলছে দয়া করে বলুন।

রিপোর্টের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে ডঃ নূর আব্দুল্লাহর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বিষণ্ন হয়ে উঠল তার মুখ। সে রিপোর্টটি ডঃ আব্দুল্লাহ জাবেরের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, দুঃসংবাদ জনাব আহমদ মুসা। বিশেষ তেজস্ক্রিয় বিষের কোন এ্যান্টিডোজ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যেখানে তেজস্ক্রিয় পোতা আছে তা খুজে বের করে তাকে তুলে ফেলা অথবা সে কমপ্লেক্স বা বিল্ডিং ছেড়ে সরে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

শুনে আহমদ মুসার মুখেও চিন্তা ও শংকার ভাব ফুটে উঠল, বলল, মাদ্রিদের মসজিদ কমপ্লেক্স না হয় ছেড়ে দিয়ে বাঁচা গেল, কিন্তু স্পেনের কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগা, সেভিল প্রভৃতির শত শত অমূল্য মুসলিম স্মৃতি চিহ্নগুলোকে আমরা বাঁচাব কেমন করে। এতগুলো স্থান থেকে তেজস্ক্রিয়ের স্থান খুঁজে বের করা এবং তা তুলে ফেলা কি সম্ভব! আহমদ মুসার কন্ঠে অসহায় ও ভেঙে পড়া সুর।

আহমদ মুসার মত জোয়ানের মুখও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ভেঙে পড়েছে উভয়েই। কোন ঘটনায় জীবনে আহমদ মুসা এভাবে ভেঙে পড়েনি।

'মুসা ভাই আপনার কন্ঠে সাহসের সুর, আশার আশ্বাস বানী শুনতে আমরা অভ্যস্ত। আপনি ভেঙে পড়লে আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

একটু থামল ডঃ আব্দুল্লাহ জাবের। থেমেই আবার শুরু করল, সব ব্যাপারেই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারেও নিশ্চয় করবেন। যেমন তিনি সাহায্য করলেন আমাদের গৌরবের এ গবেষণাগারকে। আল্লাহ আপনাকে ট্রিয়েস্টে এই কাজের জন্যেই এনেছিলেন। আল্লাহ আপনাকে স্পেনে নিয়ে এসেছেন সাফল্য দিবেনই আল্লাহ আপনাকে।

আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে ডঃ আব্দুল্লাহ জাবেরের কন্ঠ।

‘ডঃ নূর আব্দুল্লাহ, ডঃ জাবের আমি এবং জোয়ান এই রাতে এখনই আমরা স্পেন যাত্রা করতে চাই। বলল, আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আহমদ মুসা বলল, ‘দোয়া করুন আপনারা, স্পেনের অবস্থা গুরুতর। জোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মরিসকো হওয়ার কারনে শিক্ষার পথ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই পরিচয় প্রকাশ হওয়ায় অনেককে জীবন দিতে হচ্ছে। এ সবের মোকাবেলায় আল্লাহ যেন আমাদের সাফল্য দান করেন।

‘আবার বলছি মুসা ভাই, আল্লাহ আপনাকে সফল করবেন। এই সাফল্য আপনার হাতে আসবে বলেই আল্লাহ আপনাকে স্পেনে নিয়ে গেছেন। বলল, ডঃ আব্দুল্লাহ জাবের।

আল্লাহ সাফল্য দান করেন কতকগুলো শর্তে। ঈমানের দৃঢ়তা এবং যোগ্যতা তার মধ্যে অন্যতম। এগুলো না থাকলে তো আল্লাহর সাহায্য আসবেনা, এখানেই ভয় জাবের।

‘আল্লাহ সব সাহায্যেরই মালিক’। বলল, ডঃ জাবের।

আমার একটা কথা। বলল ডঃ নূর আব্দুল্লাহ।

‘বলুন’, বলল, আহমদ মুসা।

‘মিঃ জোয়ান একটি বিরাট বিজ্ঞান প্রতিভা, তার মেধাকে আমরা আমদের গবেষণা কেন্দ্রের কাজে লাগাতে চাই।

আমি খুশি হব এটা হলে। তুমি কি বল জোয়ান?

‘আপনি যা নির্দেশ করবেন, তাই করব।’

‘ঠিক আছে জোয়ান আসবে, তবে ওকে আমাদের আর একটু দরকার আছে। বেশী সময় নয়। দু’একমাস পরেই সে আসতে পারবে।’

‘জোয়ান তুমি একটা ফরম নিয়ে যাও। পুরণ করে দু’চার দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দিও।’ বলল ডঃ নুর আব্দুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ।’ বলল জোয়ান।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ উঠে গিয়ে দু’টি ফরম এনে জোয়ানের হাতে দিল।

‘দু’টি কেন?’ জোয়ান বলল।

'রাখ, দরকার হতেও পারে।'

আহমেদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা এখনি যেতে চাই।'

জোয়ানও উঠে দাঁড়াল।

'এখনি যাবেন?' বলল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

'এখনি মানে এই মুহূর্তে।'

বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল ডঃ নুর আবদুল্লাহর দিকে।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ ও ডঃ জাবেরের সাথে হ্যান্ডশেক করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

পরে তার পেছনে বেরিয়ে এল জোয়ানও।

ড্রইং রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল ডঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

বাগানের ভেতর দিয়ে লাল সুড়কির রাস্তা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা ও জোয়ান।

'কোন পথে ওঁরা যাবেন, গাড়ি লাগবে কিনা, কিছুই জিজ্ঞাসা করা হলো না। ডাকি ওঁদের...।'

বলে সামনে পা চালাতে গেল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বলল, 'ডেকে লাভ হবে না। একটা পরিকল্পনা উনি নিশ্চয় করেছেন কোন প্রয়োজন হলে নিজেই বলতেন।'

'তবু...।'

'লাভ হবে না। নিজের পায়ে ভর করে স্বাধীনভাবে উনি চলবেন, এটাই ওঁর নিয়ম। কাউকে কষ্ট না দিয়ে যতটা সম্ভব নিজেই কষ্ট করবেন, এটাই ওঁর রীতি।'

'তাই তো উনি সবার এত প্রিয়, তাই তো উনি এতবড় বিপ্লবী।'

'হ্যাঁ, তাই।'

এগিয়ে চলছিল দু'জন রাত সাড়ে বারটায় শীতল নিরবতার মাঝে মৃদু স্পন্দন তুলে।

আহমদ মুসা ও জোয়ান যখন গবেষণা কেন্দ্রের এলাকা পেরিয়ে রাস্তায় উঠল, তখন পুলিশের দু'টি গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল আই সি টি পি' কমপ্লেক্সের দিকে।

আহমেদ মুসা একবার সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনে নিক্ষেপ করল।

'কেন তাড়াতাড়ি চলে এলাম জান জোয়ান, ডঃ নুর আবদুল্লাহ যাতে সহজেই বলতে পারেন, গবেষণা কেন্দ্র থেকে চুরি করা একটা দলিলকে কেন্দ্র করে দু'দলের সংঘাতের ফল এসব ঘটনা, হত্যা কাণ্ড।' বলল আহমদ মুসা।

'দু'দল প্রমাণ হবে কি করে?'

'দু'টো গাড়ির মুখো-মুখি সংঘাত। তাছাড়া মিঃ ভিলারোয়া এর জীবন্ত সাক্ষ্য হবেন। এক পক্ষ তাকে তেজস্ক্রিয় ও স্যাম্পুল দিয়েছিল, অন্য পক্ষ তার কাছ থেকে সেগুলো কেড়ে নিয়েছে। আমি মনে করি, মিঃ ভিলারোয়াকে পুলিশ আপাততঃ ছাড়ছে না।'

'তাহলে জেনদের কি হবে?'

'ওদের চলে যেতে অসুবিধা হবে না, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে মাত্র।'

'ওকে আমরা টেলিফোন করতে পারি না, শেষ খবরটা নিতে পারি না?

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমার উদ্বেগ বুঝতে পারছি জোয়ান। কিন্তু এ সময় বাইরের কোন টেলিফোন জেনকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এমনিতেই সে ভয়ানক কাজ করে বসে আছে।'

রেস্ট হউজের দু'জন লোক নিহত হওয়ার ঘটনা মনে পড়ল জোয়ানের। আহমদ মুসা বলেছিল, সে দু'জন জেনের গুলীতেই মরেছে। জেনের শান্ত, সুন্দর, সরল মুখটা ভেসে উঠল জোয়ানের চোখে। জেন জোয়ানের জন্যে এতবড় ঝুঁকি নিল। জেনের কাছে সে এতবড়। কোন ভাবে জানাজানি হলে ওর যে কি হবে। বোকার মত পিস্তলটা আবার সাথে রাখেনি তো। মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেল

জোয়ানের। একটা বোবা আতংক এসে তাকে ঘিরে ধরল। তার মনে হলো, তার জেনের নিরাপত্তার চেয়ে বড় যেন তার কাছে এখন আর কিছু নেই।

বলল জোয়ান, 'জেনের যদি কোন বিপদ ঘটে যায়?'

'আমি সেটা চিন্তা করেছি জোয়ান। কিন্তু আমরা তার সাথে যোগাযোগ করি কিংবা তাকে সেখানে থেকে সরিয়ে আনি- যাই করি আমরা তাকে ঘিরে, তাতে সে বেশী সন্দেহের শিকার হবে।'

থামল। 'একটু ভাবল আহমেদ মুসা, তারপর একটু হেসে বলল, তোমার জেনের জন্যে এটুকু করতে পারি, সে ট্রিয়েস্ট ছাড়ার আগে আমরা ট্রিয়েস্ট থেকে যাব না।'

'সেটা কিভাবে? আমরা তো ট্রিয়েস্ট ছাড়ছি।'

'আমরা যাচ্ছি বোটে। বোটে বসে আমরা যত খুশী অপেক্ষা করতে পারি।'

'কার বোট?'

'ও তুমি জান না। আমি ভেনিস থেকে বোট নিয়ে এসেছি ঝামেলায় যাতে না পড়তে হয় এ জন্যে। বোট ফিডেল ফিলিপের এক ভেনিসীয় বন্ধুর। তার বন্ধুটি আবার মুসলমান। সুতরাং বলতে পার বোটটি আমাদেরই।'

'আমরা কি আবার ভেনিসে যাব?'

'হ্যাঁ, বোটে ভেনিস। ভেনিস থেকে ফ্রান্সের 'মার্শেল' হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের 'তুলুজ'। তুলুজ থেকে সড়ক পথে ফ্রান্স পেরিয়ে বাসক এলাকা দিয়ে পিরেনিজ পর্বত পার হয়ে স্পেনে।'

'আপনি এ পথেই বুঝি এসেছেন? আপনি ইউরপের এই অঞ্চলে নতুন। নাগরিকত্বের ঝামেলা আছে। আপনি কি করে একা এলেন?'

'ফিলিপ আমাকে স্পেনের অত্যন্ত বৈধ একটা পাসপোর্ট করে দিয়েছে। আর একা তো নই। আমার সাথে আবদুর রাহমান সপ্তম এসেছে, সে বাসক গেরিলার একজননেতা, মুসলমান। ফ্রান্স, ইটালী, ইত্যাদি তার কাছে বৈঠকখানার মত।'

'কোথায় সে?'

‘বোটে।’

কোন কথা এল না জোয়ানের তরফ থেকে।

একটা ট্যাক্সি দেখে ডেকে নিল আহমেদ মুসা।

উঠে বসল দু’জন গাড়িতে।

ছুটে চলল গাড়ি ট্রিয়েস্টের ‘বিনোদন বন্দরের’ দিকে। ওটা ট্রিয়েস্টের শুধু নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অত্যন্ত লোভনীয় পর্যটন কেন্দ্র। ওখানেই রাখা আছে আহমেদ মুসার বোট।

৪

ট্রিয়েস্ট থেকে বের হওয়ার চতুর্থ দিন মধ্যরাতে আহমদ মুসারা তুলুজ বিমান বন্দরে পৌঁছাল। অথচ সিডিউল অনুসারে দ্বিতীয় দিন মধ্যরাতে তাদের তুলুজে পৌঁছার কথা ছিল। ট্রিয়েস্টে তাদেরকে দেখা করতে হয়নি। সকালেই তারা মটেল 'সি-কুইন'- এর রিসেপশনে টেলিফোন করে জানতে পেরেছিল, শুধু অধ্যাপক ভিলারোয়া ছাড়া সবাই রাতের প্লেনেই মাদ্রিদ রওনা হয়ে গেছে। আহমেদ মুসাদেরকে দু'দিন কাটাতে হয়েছে ভেনিসে।

আহমদ মুসারা ভেনিসে পৌঁছেছিল বুধবার বিকেলে। শুক্রবার পর্যন্ত তাদেরকে ভেনিসে থাকতে হয়েছে। ফিলিপ ও আবদুর রহমান সপ্তম এর বন্ধু ইব্রাহিম আলফনেসা কিছুতেই আহমেদ মুসাকে ছাড়তে রাজী হয়নি। তার যুক্তি ছিল, শুক্রবার বাদ জুমা গুরুত্বপূর্ণ দু'জন খৃস্টানের ইসলাম গ্রহণের অনুষ্ঠান আছে, এ অনুষ্ঠানে আহমদ মুসাকে হাজির থাকতেই হবে।

আপত্তি কিছু করলেও লোভ জেগেছিল আহমদ মুসার মনে। ভেনিসের মসজিদে জুমা পড়া যাবে, এখানকার মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, সবচেয়ে বড় লাভ হবে দু'জন ভাইয়ের ইসলাম- গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারা।

সুতরাং ইব্রাহিম আলফনেসার যুক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসা সেদিন আলাপ করছিল আলফনসোর ড্রইংরুমে বসে।

আহমদ মুসা কি সিদ্ধান্ত নেবে না নেবে ভাবছিল সেই সময় ঘরে প্রবেশ করেছিল একটি মেয়ে। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামানো তার স্কার্ট জুতার প্রান্ত কোন ছুঁই ছুঁই করছে। গায়ে কোট। মাথায় রুমাল, চোখের প্রান্ত পর্যন্ত নামানো।

ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে মেয়েটি ইব্রাহিম আলফনসোকে বলেছিল, 'একটা সুখবর আব্বা'।

'আমার মেয়ে আয়েশা। ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে'। মেয়েটিকে দেখিয়ে বলেছিল আলফনসো।

কথা শেষ করেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল আলফনসো, 'তুমি বুঝি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলে?'

'জি, হ্যাঁ'।

'তুমি তো এঁদের চিন না'।

'চিনি না, আম্মার কাছে শুনলাম'।

'কি শুনলে?'

'ইনি সেই আহমদ মুসা'। আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে বলল মেয়েটি।

'কোন আহমদ মুসা?' একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল আলফনসো।

'যিনি মুসলমানদের জর্জওয়াশিংটন, যিনি মুক্ত করেছেন ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া, ককেশাস ও বলকানের মুসলমানদের?'

'জর্জওয়াশিংটনের সাথে তুলনা কি মিলল, মা?'

'ঠিক মেলে না, জর্জওয়াশিংটন একটা সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু ইনি একটা সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের নির্মাতা ও সাফল্যদানকারি। ইনি সর্বোচ্চ সেনানায়ক, আবার সর্বনিম্ন সৈনিকও। ইনি যা আদেশ করেন, প্রথমে তিনি তা পালন করতে সামনে অগ্রসর হন। জর্জওয়াশিংটন শুধু ছিলেন মাথার ব্যক্তি, এমন মাথা ও মাটির ব্যক্তি ছিলেন না?'

আলফনসোর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় এসেছিল বিস্ময়। মেয়ের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আলফনসো বলেছিল, 'এত কথা এমন কথা তুমি জানলে কি করে, শিখলে কোত্থেকে মা?'

তখনই উত্তর দেয় নি আয়েশা। একটুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর বলেছিল, 'আপনাকে বলিনি আব্বা, আমরা 'ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসা' নামে একটি সংগঠন করেছি। ছেলে ও মেয়েদের জন্যে এর দু'টি ভিন্ন ভিন্ন উইং আছে। দু'টো উইং স্বাধীনভাবে কাজ করে। প্রতি সপ্তাহে আমরা স্ট্যাডি সার্কেলে বসি। আমরা দু'টো কাজ করি, এক, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস শিক্ষা করি আমরা, দুই, দেশ-বিদেশের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি, কোন দেশে মুসলমানদের কি সমস্যা সে তথ্য আমরা যোগাড় করি এবং

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা সংগঠনকে আমরা সাধ্যমত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, কাটিং, স্লিপিং পাঠিয়ে সাহায্য করি। এই সূত্রেই আমরা জনাব আহমদ মুসা সম্পর্কে জেনেছি'।

'এ সোসাইটি কি তোমার ভেনিস কেন্দ্রিক?'

'না আব্বা। এ সোসাইটি প্রথম গঠিত হয় জার্মানির মিউনিখ শহরে। ইসলাম গ্রহণকারী একজন জার্মান তরুণ ইঞ্জিনিয়ার এই সোসাইটি গঠনের উদ্যোক্তা। এই ইঞ্জিনিয়ার সৌদি আরবে পাঁচ বছর ছিলো একটি পারমাণবিক প্রকল্পে এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন এই সোসাইটি গোটা মধ্য ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ইটালিতেই আছে ২০টি কেন্দ্র'।

আয়েশা থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠেছিল, 'বোন, তোমাদের কাজের মতই তোমাদের সোসাইটির নামটা সুন্দর। কিন্তু বলত, 'আজকের সমৃদ্ধ ও সুন্দর ইউরোপ তার রেনেসাঁরই ফল, আবার ইউরোপে রেঁনেসা কেন?'

আয়েশার মুখে এক টুকরো সলজ্জ হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল সে, জনাব এর উত্তর আপনি জানেন, তবু বলছি, ইউরোপের সে রেনেসাঁ ইউরোপকে সমৃদ্ধি দিয়েছে এবং সমৃদ্ধিজাত সৌন্দর্য্য দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই সমৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধিজাত সৌন্দর্য্য নিয়ে তারা কোন পথে চলবে, কোন পথে চললে তাদের আত্মার পরিতৃপ্তি আসবে, কোন পথে চললে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে আনবে তাদের সার্বিক মংগল, সেই ব্যাপারে ইউরোপ আজ ভীষণ অন্ধকারে। এই অন্ধকারে তাদের হতাশা ক্রমেই বাড়ছে, জীবন হয়ে উঠেছে ক্লান্তিকর। মহত্তর ও মংগলতর অতি-জীবনিক একটি লক্ষ্যের অভাবে তাদের জীবন ও সমৃদ্ধি সবই অর্থহীন হয়ে পড়ছে। আমাদের রেনেসাঁ ইউরোপকে এই জীবন-বিনাশী অবস্থার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই। আজ একমাত্র ইসলামেই আছে এই রেঁনেসার শক্তি'।

'ধন্যবাদ বোন। তুমি যে মহত্তর ও মংগলতর অতি-জীবনিক একটা লক্ষ্যের কথা বললে সেটা কি?'

সেই সলজ্জ হাসি আবার ফুটে উঠেছিল আয়েশার মুখে। বলেছিল, 'মাফ করবেন, আমার কথা আমি পরিষ্কার করতে পারিনি। অতি-জীবনিক বলতে

বুঝাতে চেয়েছি জীবন-পরপারের অর্থাৎ পরকালীন জীবনের মহত্তর, উচ্চতর লক্ষ্যের কথা'।

'অর্থাৎ আমাদের এই জীবনের স্বস্তি ও সুখকে এবং অর্থ-প্রাচুর্যের অর্থময়তাকে তুমি পরকালীন জীবন-মুখী মহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছ। এর ব্যাখ্যা তুমি কিভাবে করবে'। বলেছিল আহমদ মুসা।

আয়েশার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল সে, 'সব বিষয় আমি ভালভাবে বুঝিনি। আমি যেটুকু বলতে পারব তাহলো, এই জীবনটাই যদি শেষ হয়, এই জীবনের পর যদি আর কিছু না থাকে, তাহলে অর্থ-প্রাচুর্য-সমৃদ্ধি সবকিছু সত্ত্বেও জীবনে এক সময় হতাশা এসে দাঁড়ায়, সবকিছু অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন, যে কোন সময় মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, আর মৃত্যুর সাথে সাথেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে জীবনের এত আয়োজন কেন, এর প্রয়োজন কি! এ থেকেই আসে জীবনে বিশৃঙ্খলা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। যার একটা প্রকাশ হলো, অস্বাভাবিক ধরণের ভাব-প্রবণতা, নেশাগ্রস্ততা। এটা হলো একদিক। আরেকটা দিক হলো, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করতে ভোগও প্রয়োজন, ত্যাগও প্রয়োজন। প্রয়োজন ভোগ ও ত্যাগের ভারসাম্য। কিন্তু পরকালীন জীবন যদি না থাকে, সেখানে যদি পুরস্কারের নিশ্চয়তা এবং শান্তির যদি বিষয় না থাকে তাহলে মানুষ অব্যাহতভাবে ত্যাগ করে যাবে কেন, স্বেচ্ছাচারিতা অন্যায় ও অবিচার থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকবে কেন? সুতরাং আমাদের এই জীবনের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি পরকালীন জীবনের উচ্চতর ও মহত্তর প্রতিশ্রুতি ও পুরস্কারের সাথে সম্পৃক্ত'।

আহমদ মুসার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ভেনিসে বসে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন ইউরোপীয় তরুণীর কন্ঠে এই কথাগুলো শুধু অপরূপ নয়, অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল আহমদ মুসার কাছে। বলেছিল আহমদ মুসা, 'ধন্যবাদ বোন, এত শিখলে কোথায়, স্ট্যাডি সার্কেলে?'

'স্ট্যাডি সার্কেলে এবং বই পড়ে'।

'কি বই?'

‘সাইয়েদ কুতুব ও আবুল আ’লার তাফসীর, তাদের জীবনী এবং আরও অনেকের বই’।

‘কোথায় পাও?’

‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বই আছে’।

‘কিনেছে ওরা?’

সোসাইটির মাধ্যমে আমরা পরিকল্পনা করেছি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টার মাধ্যমে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েই এই সব বই কিনিয়ে নেব। আমরা তাই করেছি। এখন অন্ততঃ মধ্য ইউরোপের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সব বই পাওয়া যায়’।

‘তোমাদের সোসাইটির কথা আমাকে বিস্মিত করেছে বোন। তোমরা অনেক-অনেক এগিয়েছ। আমার মনে হচ্ছে কি জান, ইউরোপের তোমরাই হবে আজকের বিশ্বে ইসলামের সবচেয়ে সুদক্ষ বাহিনী’।

‘ধন্যবাদ। কালকে আমাদের জোনাল সম্মেলন। ভেনিসেই। আপনাকে পেলে সেটা হবে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার চেয়েও বড় বিস্ময়। আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি আমি’।

আয়েশার আব্বা আলফনসো চট করে বলে উঠেছিল, ‘ওদের প্লেন আজ রাতেই, চলে যেতে চাচ্ছেন ওরা’।

আয়েশা ছোট চঞ্চলা মেয়ের মত উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ‘না আব্বা, ওঁদের যাওয়া হবে না কিছুতেই, যেতে দেব না। আহমদ মুসার উপর আমাদেরও অধিকার আছে। ইউরোপের প্রতিও ওঁর দায়িত্ব আছে’।

‘বল তুমি ওঁকে’। বলেছিল আলফনসো।

আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। গম্ভীর কন্ঠে বলেছিল, ‘স্পেনে ফেরার কেন আমার এত তাড়া তা আপনারা জানলে দেরী করতে আমাকে বলতেন না। ওখানে মুসলমানদের অবশিষ্ট চিহ্নটুকুর উপর ভয়াবহ আঘাত আসছে, যে দীপ শিখাটুকু মাদ্রিদে জ্বলে উঠেছে, তাও নিভে যাওয়ার মুখে। আমরা একটা সাহায্যের জন্যে গিয়েছিলাম ট্রিয়েষ্টে ডঃ সালামের গবেষণা কেন্দ্রে। কিন্তু

সে সাহায্য সম্ভব নয়। এখন কঠিণতর পথে আমাদের এগুতে হবে। প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমার কাছে অসহ্য রকম দীর্ঘ মনে হচ্ছে।’

থামল আহমদ মুসা।

গোটা ড্রইং রুমে নেমে এসেছে গাম্ভীর্য। আয়েশার মুখেও একটা বেদনা ও শংকার ভাব ফুটে উঠেছে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলেছিল, ‘তবু আমি থাকব দু’দিন ভেনিসে। জনাব আলফনসোর কথায় আমি দূর্বল হয়েছিলাম। আর আয়েশার কথায় আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি।’

আয়েশার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। ছুটে চলে যাচ্ছিল ভেতরে, সম্ভবতঃ তার মাকে সুখবরটি জানাবার জন্যেই। দু’পা গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়েছিল আয়েশা। বলেছিল তার আব্বাকে লক্ষ করে, ‘আপনাকে যে সুখবর জানাতে এসেছিলাম সেটা হলো, শুক্রবারে দু’জন ছাড়াও আরো কয়েকজন ইসলাম কবুল করতে পারে।’

কথা শেষ করেই আয়েশা ছুটছিল ভেতরে।

আলফনসো বলে উঠেছিল, ‘শুন আয়েশা, এ খবর কার কাছ থেকে শুনলে, তুমি?

কিন্তু কে কার কথা শুনে। আলফনসো’র কথা শুরু হতে হতেই আয়েশা ভেতরে।

আহমদ মুসা মেয়েদের ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর জোনাল সম্মেলনে গিয়েছিল। ঈদের আনন্দ এসেছিল সেদিন ঐ সম্মেলনে। প্রথমে ছিল বক্তৃতা। পনের মিনিটেই তার কথা শেষ করেছিল আহমদ মুসা। তারপর শুরু হয়েছিল প্রশ্নোত্তর। আড়াই ঘন্টা চলেছিল প্রশ্নোত্তরের আসর। এই আড়াই ঘন্টায় ইসলামের গত চৌদ্দশ’ বছরের ইতিহাস, মুসলমানদের আজকের সমস্যা-সম্ভাবনার কোন প্রধানদিকই বাদ যায়নি। আহমদ মুসা ধৈর্যের সাথে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। খুব খুশী হয়েছিল সে ইউরোপীয় বোনদের আগ্রহে। অনুষ্ঠান শেষে আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে সোসাইটির পক্ষ থেকে

ভেনিস শাখার সভানেত্রী আয়েশা বলেছিল, 'সোসাইটির জীবনে আজ ঐতিহাসিক দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহ আছে আহমদ মুসার উপর। তিনি যেখানে পা দেন, সেখানেই সোনার ফসল ফলে, মুসলমানদের জীবনের অন্ধকার কেটে গিয়ে আসে সোনালী দিন তার এই আগমন আমাদের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক পরিকল্পনার ফল আমরা মনে করি। তাঁর কথা, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর উৎসাহ দান আমাদের সোসাইটিকে নতুন জীবন দান করবে, আমাদের বহুদূর এগিয়ে নিবে। তাঁর কাছে আমাদের দাবী, ইউরোপ বঞ্চিত, ইউরোপের মানুষ বঞ্চিত, মুসলিম বিশ্ব ইউরোপের প্রতি নজর দিক। ইউরোপের মান অনুসারে উপযুক্ত ও যথেষ্ট ইসলামী সাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয়নি। ইংরেজীতে, ফরাসী ভাষায় কিছু আছে, ইউরোপের অনেক জাতীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য শূণ্যের কোঠায়। যোগ্য মুসলিম মিশনারীর সংখ্যাও বলা যায় শূণ্যের অংকে এই বিষয়গুলোর দিকে আমরা আমাদের মহান ভাই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জোর দিয়েই আমরা তাকে বলতে চাচ্ছি, ইসলামী আন্দোলনগুলো যে পরিশ্রম, যে কষ্ট, যে ত্যাগ ও কোরবানী মুসলিম দেশগুলোতে করছে, তা যদি তারা ইউরোপের জন্যে করে, তাহলে হাজারগুণ বেশী ফল তারা লাভ করবে। আমরা আশা করছি, ইউরোপের এই আকুল কণ্ঠ তাঁর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে যাদের কাছে পৌঁছা দরকার তাদের কাছে নিশ্চয় পৌঁছবে। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের মহান ভাই-এর দীর্ঘ জীবন ও সব ক্ষেত্রে কামিয়াবী প্রার্থনা করছি। আর প্রার্থনা করছি, ইউরোপও যেন তাঁকে পায়।'

আহমদ মুসাকে ভেনিসের আবু আলী সুলাইমান মসজিদে নামায পড়াতে হয়েছিল।

ভেনিসের এই আবু আলী সুলাইমান মসজিদটি এ্ই নামের পুরানো মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। এই অপরূপ সুন্দর মসজিদ কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে একটা বাজার, একটা শিক্ষালয়, একটা বড় সম্মেলন কেন্দ্র, একটা লাইব্রেরী।

এই আবু আলী সুলাইমান মসজিদের একটা ইতিহাস আছে।

তখন পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক। তুরস্কে খলিফার আসনে তখন দিগ্বীজয়ী সুলাইমান। সমগ্র ভূমধ্যসাগর তার নৌবহরের দখলে। ইটালীর উপকূল ও বহু নগরী তাঁর কব্জায়। রোমের মত ভেনিস তখন খৃষ্টান প্রতিরোধের দুর্ভ্যেদ্য দূর্গ। এই দুর্ভেদ্য দূর্গে সুলাইমানের মুসলিম নৌবহর প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু প্রবেশ করেছিল ইসলাম প্রচারক আবু আলী সুলাইমান। তাঁর হাতে ছিল কোরআন, আর তাঁর পিঠের ছোট্ট পুটুলিতে ছিল শুকনো রুটি। সৌম্যদর্শন, মৃদুভাষি ও দয়ালু হৃদয় আবু আলী সুলাইমান ছিল ভেনিসবাসীদের কাছে এক বিস্ময়। যে ভেনিসবাসীরা জানত মুসলমানরা যুদ্ধ, হত্যা ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক, সেই ভেনিসবাসীরা একটা ভিন্ন চিত্র দেখল আবু আলী সুলাইমানের মধ্যে। তাঁর নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের কাছে দাঁড়ালে হিংসা-বিদ্বেষ কোথায় যেন হাওয়া হয়ে যায়। ভীষণ স্বভাবের অপরাধীরা তাঁর সংস্পর্শে এলে গলে খাঁটি সোনা হয়ে যায়। তখন চারদিকের রণ-উন্মাদনা ও রণ-ডংকার মধ্যে তিনি যেন শান্তির এক ছায়াদার বৃক্ষ।

আবু আলী সুলাইমান তার বাসের স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন ভেনিসের এক প্রান্তে এক ছোট্ট-শান্ত স্রোতস্বীনির তীরে। খুব শীঘ্রই স্থানটি ধনী-নির্ধন সকলের দর্শন গাহ হয়ে উঠল। তিনি সকলকে বলতেন, স্রষ্টা যেভাবে চান সেভাবে না চলার কারণেই মানুষের মনে, সমাজে, দেশে-সবটা জুড়ে আসে অশান্তি। সব আচরণের জন্যে স্রষ্টামূখী না হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়াই মানবতার জন্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ। তিনি মানুষকে জানালেন, ইসলাম শুধু মানুষের নয়, কুকুর, ঘোড়ার মত পশুদেরও নিরাপত্তা বিধান করে, তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবে।

আবু আলী সুলাইমানের ক্ষুদ্র কুটিরের সামনে গড়ে উঠে মসজিদ। সেখান থেকে উচ্চারিত হতে থাকে মুয়াজ্জিনের আযান দিনে পাঁচবার। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার-এইভাবে ধীরে ধীরে নামাজিতে ভরে উঠে মসজিদ। গড়ে উঠে ভেনিসে একটি মুসলিম সমাজ। আবু আলী সুলাইমান শীঘ্রই শাসকদের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। বলা হলো আবু আলী সুলাইমান তুরস্কের সুলতান দিগ্বীজয়ী সুলাইমানের চর। একদিন ফজরের সময় নামাযীরা গিয়ে দেখল, আবু আলী সুলাইমানের রক্তাক্ত ও নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে মসজিদে

জায়নামাযের উপর। তীক্ষ্ণধার ছুরির আঘাতের পর আঘাতে তার দেহ বিকৃত হয়েছে, কিন্তু মুখ ভরা ছিল পবিত্র হাসি, যেমন তিনি হাসতেন ঠিক তেমনি। সে দৃশ্যের দিকে চেয়ে মানুষ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

তারপর ভেনিসের মুসলমানরা মসজিদের নামকরণ করে আবু আলী সুলাইমান মসজিদ। আবু আলী সুলাইমান মরলেও মানুষ তার নামকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এইভাবে।

কিন্তু ভেনিসের দূর্বল সংখ্যালঘু মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। আবু আলী সুলাইমানকে যেমন হত্যা করা হয়, তেমনি মসজিদটিকেও, প্রায় একশ' বছর পরে, ধ্বংস করা হয় এবং সেখানে গড়ে তোলা হয় গীর্জা।

কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই গীর্জাটি পরিত্যক্ত হয়, কোন উপাসক সেখানে আর যেত না রোববারের নির্দিষ্ট প্রার্থনা সভায়। সেখানে গড়ে উঠে ক্লাব, পরে রেস্তোঁরা। স্থানটি কিন্তু পরিচিত ছিল সব সময় 'হোলি আবু আলী সুলাইমান' বলেই।

অনেক পরে ভেনিসের মুসলমানরা স্থানটি কেনার উদ্যোগ নেয়। সিদ্ধান্ত নেয় পুরানো বুনিয়াদের উপর আবু আলী সুলাইমান মসজিদটি পূনঃনির্মাণের। কিন্তু অনেক টাকা প্রয়োজন। কোথায় সে টাকা। অবশেষে মক্কার রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী সাহায্যে এগিয়ে আসে। স্থানটি কেনার জন্যে অর্থ সাহায্য দেয়। তারপর সৌদি সরকারের অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠে সুন্দর, সুদৃশ্য আবু আলী সুলাইমান মসজিদ কমপ্লেক্স।

এই কাহিনী আহমদ মুসা শুনেছিল আগেই। যখন সে আবু আলী সুলাইমান মসজিদে প্রবেশ করেছিল, তার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠেছিল আবু আলী সুলাইমানের সব কাহিনী। একা এক মানুষ আবু আলী এসেছিলেন এই ভেনিসে- দেশ ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন, পরিবার-পরিজন সব ছেড়ে! কিসের টানে তিনি এসেছিলেন এই বিদেশ- বিভূই-এ! মানুষের প্রতি ভালবাসার টানে, তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাবার উদগ্র বাসনায়। নিজেদের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দানকারী এই মহান ত্যাগি ব্যক্তিদের চেষ্টার কারণেই ইসলামের আলো

বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহান অগ্রজদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আহমদ মুসার চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে উঠেছিল অশ্রুতে।

ইমাম সাহেবের অনুরোধে আহমদ মুসাকেই জুম্মার খোতবা দিতে হয়েছিল।

বিরাট মসজিদ। এক পাশে ছেলেরা, আরেক পাশে মেয়েরা। ভরে গিয়েছিল মসজিদ। শুধু ভেনিস নয়, আশ-পাশ থেকে যারা টেলিফোনে খবর পেয়েছিল তারাও ছুটে এসেছিল। প্রায় তিন হাজারের মত মুসল্লি হাজির হয়েছিল। অধিকাংশই যুবক ও তরুণ।

খোতবায় আহমদ মুসা বলেছিল, ইসলাম প্রচলিত অর্থের কোন ধর্ম নয়। জাগতিক জীবনে মানুষ যাতে ক্ষতি ও অন্যায়-অবিচার থেকে বাঁচতে পারে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে এবং পরকালে যাতে চিরন্তন শান্তির জীবন লাভ করতে পারে ইসলাম তারই একক একটি প্রাকৃতিক বিধান। আহমদ মুসা বলেছিল ইসলাম কিভাবে এসেছিল কিভাবে বিজয় লাভ করেছিল এবং কিভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। এই কথা বলতে গিয়ে সে স্মরণ করেছিল খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর কথা, শাহজালালের কথা, এক আবু আলী সুলাইমানসহ হাজারো শহীদি আত্মার কথা। বলতে গিয়ে আবেগে তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেঁদে উঠেছিল মসজিদের প্রতিটি মুসল্লি। অশ্রু গড়িয়েছিল তাদের চোখ থেকে অঝর ধারায়। তারপর আহমদ মুসা বলেছিল মুসলমানদের আদর্শ-বিচ্যুতি কি করে সেই সোনালী দিনের ইতি ঘটাল, স্বার্থপরতাজাত অনৈক্য কি করে তাদের পতন ঘটাল সেই কাহিনী। আত্মবিনাশের সেই মর্মন্তুদ কাহিনী আবার মুসল্লিদের চোখ সজল করে তুলেছিল। এরপর আহমদ মুসা বলেছিল, পতনের শেষতল থেকে মুসলমানরা আবার উঠে আসছে, পৃথিবীকে পথ দেখাবার দায়িত্ব নিয়ে যে জাতির উত্থান, সেই মুসলিম জাতি সেই দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আবার আজ এগিয়ে আসছে। স্বার্থপরতাজাত অনৈক্য যে মুসলিম জাতির একদিন পতন ঘটিয়েছিল, জীবন দেয়ার মত চুড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করে তারা আজ ঐক্যকে আবার সংহত করছে। মানবতার কল্যাণে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন দেবার সংখ্যা যে জাতির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান হারে বাড়ে, সে জাতির উত্থান কেউ রোধ করতে পারে না, সে

জাতির বিশ্ব-নেতৃত্ব ঠেকিয়ে রাখতে পারে না কেউ। মুসলমানদের আবার বিশ্ব-নেতৃত্ব লাভ অবধারিত। আমি দুর দিগন্তে সে সোনালী দিনের স্বর্ণরেখা দেখতে পাচ্ছি। আহমদ মুসার এ শেষ কথাগুলো আনন্দে উজ্জ্বল করে তুলেছিল মুসল্লিদের মুখগুলোকে। আহমদ মুসা উপসংহারে বলেছিল, সে সোনালী দিনে পৌছার জন্যে সংগ্রামের এক কঠিন পথ এখনও আমাদের পাড়ি দিতে হবে।

জুম্মার নামাযের পর শুরু হয়েছিল ইসলাম গ্রহণ করতে আসা লোকদের ইসলামে দীক্ষা দানের অনুষ্ঠান।

কথা ছিল দু'ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের। একজন ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আরেকজন তরুণ ব্যবসায়ী। কিন্তু ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল সাতে। এদের পরের পাঁচজনের মধ্যে তিনজন সরকারী চাকুরে, দু'জন ব্যবসায়ী। সবাই বয়সে যুবক। সকলের মধ্যে প্রবীণ একমাত্র ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক তিনি। উল্লেখ্য, তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সকলের অনুরোধে আহমদ মুসাই ওঁদের সকলের ইসলাম গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিল।

অনুষ্ঠান ও দোয়া শেষে আহমদ মুসা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছিল কয়েকজনের সাথে।

প্রবীণ অধ্যাপক জোস ওরতেগা, মুসলিম নাম আহমদ হাসান'কে আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করেছিল, ইসলামের কোন জিনিসটি আপনাকে আকৃষ্ট করেছিল সবচেয়ে বেশী'।

'কোন একটা দিককে আমি চিহ্নিত করতে পারবো না। জীবন সম্পর্কে ইসলামের টোটাল দর্শনটাই আমাকে আকৃষ্ট করে'। বলেছিল অধ্যাপক ওরতেগা।

'আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়টা কি ছিল?'

'তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত' এর বিশ্বাস সম্মিলিতভাবে যে অপূর্ব ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধানের জন্ম দিয়েছে সেটা'।

কথার মাঝখানে একটু হেসেছিল অধ্যাপক ওরতেগা। তারপর আবার শুরু করেছিল, তাওহিদের বিশ্বাস মানুষকে সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক স্বাধীন মানুষে পরিণত করে, যেখানে উপরে এক আল্লাহ ছাড়া তার উপরে আর কেউ থাকে না। আর রেসালত সেই আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিসিক্ত করে, আর তাকে দেয় স্রষ্টার দেয়া জীবন পরিচালনার সংবিধান। আখেরাতের বিশ্বাস 'মানুষকে দেয় সকল কৃতকর্মের জওয়াবদিহীর সদাজাগরুক ভয় এবং পরকালের চিরন্তনী জীবনে সৎ জীবনের জন্যে পুরস্কারের নিশ্চয়তা এবং অসৎ জীবনের জন্যে শাস্তির প্রবল ভীতি। জাগতিক জীবনকে সুখ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্যে মানুষের এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন অপরিহার্য'।

আহমদ মুসা অধ্যাপক ওরতেগার কথা শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিল। বলেছিল, অধ্যাপক ওরতেগার এই উপলব্ধি যদি ইউরোপের জাগ্রত বিবেকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমি মনে করি ইউরোপে পরিবর্তনের এক বিপ্লব ঘটে যাবে। মুসা বিন নুসায়েরের যে বিজয় অভিযান অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত পিরেনিজ পর্বতমালায় এসে থেমে গিয়েছিল, সে বিজয় আমরা ইউরোপে সম্পূর্ণ করতে পারবো। সমর শক্তি যা সেদিন পারেনি, ইসলামের আদর্শের শক্তি তা পারবে।

তরুণ-তরুণীর দল যারা হাজির ছিল সে সমাবেশে, তারা আনন্দে তকবীর দিয়ে উঠেছিল। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন।

আহমদ মুসা তরুণ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেদিন তাদের সাথেও আলোচনা করেছিল, তাদের উপলব্ধির সাথে পরিচিত হবার জন্যে।

একজন তরুণ বলেছিল, আমি কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু কম্যুনিষ্ট অর্থনীতি ও তার সাম্যবাদ অবাস্তব ও ব্যর্থ প্রমানিত হবার পর আমি হতাশায় ভুগছিলাম। সে সময় আমি 'ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসা' আয়োজিত একটি সেমিনারে উপস্থিত হয়েছিলাম। সে সেমিনারে একজন বক্তা বলেছিলেন, 'শাসন দন্ড উচিয়ে বন্টনের সাম্যতা বিধানের মধ্যে শুধু অবাস্তবতা

নয়, এক ধরণের নিপীড়নও বিদ্যমান রয়েছে। ইসলাম এই ধরণের সাম্যতা নয়, আইনের সাম্যতা বিধানে অত্যন্ত কঠোর এবং আপোষহীন। এখানে একজন দুর্বলতম সাধারণ লোকের অভিযোগে রাষ্ট্র প্রধানকেও আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন সাধারণ লোক রাষ্ট্র প্রধানকেও রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কৈফিয়ত তলব করতে পারে। ইসলাম মানুষের স্বাধীন আয়-ব্যয়ের উপর এমন নৈতিক ও আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং আয় ও ব্যয়কারীকে এমন দায়িত্বরোধে উজ্জীবিত করে যার ফলে সম্পদ অব্যাহতভাবে বিতরণশীল হয়ে ওঠে এবং এই সমাজে ধনী হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি গরীব থাকাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই কল্যাণ-সমাজে রাষ্ট্র প্রধানের ভাতা বা বেতন সাধারণ মানুষের অংশের চেয়ে বেশী হতে পারে না। আর এই কল্যাণ সমাজে শুধু মানুষ নয়, কুকুরও যদি না খেয়ে থাকে তার জন্যে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহীর ভয়ে রাষ্ট্র প্রধান ভীত থাকে'। এই কথাগুলো আমার সামনে অজানা এক জগতের দ্বার খুলে দেয় এবং আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করতে বাধ্য হই। ধীরে ধীরে আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, মানবতার জন্যে স্বাভাবিক ও শান্তিময় জীবনের একমাত্র পথ ইসলাম। তার পরেই আমি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি'।

'আপনার পরিবার থেকে কোন বাধা আসেনি?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করেছিল আহমদ মুসা।

'আসেনি। বরং আব্বা খুশী। তার বয়স একশ' তিন বছর, একজন গোঁড়া ক্যাথলিক তিনি। তিনি খুশী হয়েছেন কারণ আমি ধর্মদ্রোহী কম্যুনিজম থেকে ধর্মের দিকে আসছি। তিনি আমাকে বলেছেন, 'ইসলামই তোমাদের জন্যে উপযুক্ত। ধর্মগুলোর মধ্যে মাত্র ইসলামই তোমাদের দাবী পূরণ করতে পারে'।

আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাবে আরেকজন যুবক বলেছিল, 'ইসলামের নামায আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে একটা মসজিদের কাছাকাছি আমি থাকতাম। আসা-যাওয়া কালে প্রায়ই এক সাথে মুসলমানদের নামায পড়তে দেখতাম। অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখেছি। মুসলমানদের নামাযের মধ্যে গণতন্ত্র, সাম্যতা ও স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের চুড়ান্ত

প্রকাশ আমি দেখি। আরেকটা জিনিস আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। সেটা হলো, দিনে পাঁচবার নামায। এই ভাবে দিনে পাঁচবার কেউ যদি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ায়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে সৎ ও সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে। এই অনুভূতি থেকেই ইসলামকে জানার ব্যাপারে আমি আগ্রহী হই। ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ' এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করে'।

আহমদ মুসা ঐ দিনই বিকেলে 'ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ'র ছেলেদের শাখার এক আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগদান করেছিল।

এই দিনই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আহমদ মুসারা ভেনিস ছেড়েছিল। তাদেরকে বিমানে তুলে দিতে এসেছিল একদল যুবক। আর এসেছিল ইব্রাহিম আলফনসো এবং আয়েশা।

বিমানের গ্যাংওয়েতে প্রবেশের আগে আহমদ মুসা শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ফিরেই দেখতে পেয়েছিল আয়েশা একদম পেছনেই। তার নীলচোখ ভরা জল।

'কাঁদছ আয়েশা তুমি?' বলেছিল আহমদ মুসা।

'আর দেখা হবে না কোন দিন?' বলেছিল আয়েশা।

'জীবন পায়ে চলা পথের মত, কেউ তো নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না আয়েশা?'

'পথিক কি ফেরেনা তার ফেলে আসা পথে আর?'

'ফেরে বোন, আবার ফেরেও না।'

'তাহলে বোনরা কি হারিয়ে যাবে, ভাইদের জীবন থেকে?' অসহ্য এ অনুভূতি।'

আয়েশার চোখটা ভিজে উঠেছিল।

'না মা, এমন ভাবছ কেন? তুমিই না বলেছ, ইউরোপের দাবী আছে ওর প্রতি? ওকে আসতেই হবে।

'পরিচিত ভাই-বোনদের কাছে ফিরে আসতে আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু এ ওয়াদা কোথাও করতে পারিনি।'

'ক্ষণিকের এমন স্মৃতি বেদনাদায়ক।' চোখ মুছে বলল আয়েশা।

‘তবু এমন হাজারো ঘটনা জীবনের চলার পথে ঘটবেই।’

‘মনকে আল্লাহর জন্যে প্রস্তুত করেননি কেন?’

‘মানুষ তাহলে বোন মানুষ হতো না।’

‘তাহলে কি আল্লাহ চান বোনরা ভায়ের জন্য এভাবে কাঁদবে?’

‘অর্ধেক বললে ভাইরাও কাঁদবে বোনের জন্যে, মা কাঁদবে সন্তানের জন্যে, সন্তান কাঁদবে মায়ের জন্যে। এই মমতার বাঁধনেই তো মানব সমাজ বাঁধা।’

দরজায় যাত্রীর ভীড় বেড়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা ইব্রাহিম আলফনসোর দিকে চেয়ে বলেছিল, ‘আসি জনাব, সবাইকে আমার সালাম বলবেন।’

তারপর আয়েশার দিকে চেয়ে বলেছিল, ‘আসি বোন।’

আয়েশার ঠোট কাঁপছিল। কিন্তু কোন শব্দ বেরোয়নি। তার ভেজা চোখে করুন এক দৃষ্টি। আহমদ মুসার অন্তরের কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠেছিল। এমনভাবে বিদায় জানাবার মত তার কোন বোন নেই। বোনরা এমন মমতাময় হয় ভাইদের প্রতি! তাদের অশ্রু-জলে এমন ভাবেই কি সিক্ত হয়ে উঠে ভায়ের চলার পথ!

আহমদ মুসার মমতা-বুভুক্ষ হৃদয় বেদনায় চিনচিন করে উঠেছিল।

একটা আবেগ যেন বুক থেকে ঠেলে উপরে উঠতে চাইছিল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল!

লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করেছিল সে গ্যাংওয়ে ধরে।

গ্যাংওয়েতে ঢোকার পথে দরজায় দাঁড়ানো একজন লোক বিস্ফারিত চোখে দেখছিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা চলে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল ইব্রাহিম আলফনসোকে, ‘কে ইনি?’

‘আহমদ মুসা।’ বলেছিল আলফনসো।

‘ঠিক বলেছেন।’

‘আপনি চেনেন তাকে?’

‘না মানে ছবি দেখেছি। উনি কোথায় যাচ্ছেন?’

‘ফ্রান্সের তুলুজ।’

শুনেই লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। প্রবেশ করেছিল পাশের একটি কক্ষে। হাতে তুলে নিয়েছিল টেলিফোন।

‘আব্বা, ওর নাম বলে তুমি ঠিক করনি। লোকটিকে আমার ভাল মনে হলো না।’ বলেছিল আয়েশা।

‘ঠিক বলেছ মা, হঠাৎ বলে ফেলেছি।’

আয়েশার চোখে উদ্বেগ।

চোখ তখনও তার ভেজা অশ্রুতে।

তারা বাপ-বেটি দু’জন ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছিল বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। বাইরে লবীতে অন্যেরা অপেক্ষায় ছিল।

ফ্রান্সের তুলুজ বিমান বন্দরে পা দেবার পর আহমদ মুসার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল নতুন চিন্তায়। চিন্তাটা স্পেনের মুসলিম স্মৃতি চিহ্নগুলো এবং মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ কমপ্লেক্সকে তেজষ্ক্রিয়তার হাত থেকে উদ্ধার করার প্রশ্ন নিয়ে। একটা উদ্বেগ তার মনকে এসে ঘিরে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল তার, একটি করে দিন যাচ্ছে আর তেজষ্ক্রিয় দানবের ভয়ংকর রূপ ভয়ংকরতর হয়ে উঠছে। যার গ্রাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে স্পেন থেকে মুসলিম ইতিহাসের শেষ উপস্থিতিটুকু।

আহমদ মুসা বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল এই চিন্তা মাথায় নিয়ে।

ভাড়া করা ট্যাক্সি। মুরেট পর্যন্ত ভাড়া করেছে। মুরেট তুলুজের ৫০ মাইল দক্ষিণে একটা ছোট্ট শহর। মুরেটে আব্দুর রহমান সপ্তমের বন্ধুর বাড়ি। রাতে তারা ওখানেই উঠবে।

গাড়ি ভাড়া করেছে আব্দুর রহমান সপ্তম। সে বসেছে ড্রাইভারের পাশে। পেছনের সিটে আহমদ মুসা এবং জোয়ান।

মধ্যরাতের তুলুজ। রাস্তায় লোকজন গাড়ি-ঘোড়া খুব কম। আধা ঘুমন্ত নগরী। আলো-আধারীর লুকোচুরি খেলা ছাড়া দু'পাশে দেখার কিছু নেই। আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে চোখ বন্ধ করে সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তাকে আবার সেই চিন্তাই পেয়ে বসেছে। বিজ্ঞান যে তেজষ্ক্রিয়ের লোকেশনকে ডিটেক্ট করতে পারছেনা, সেই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সে অগ্রসর হবে কোন পথে! তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ হওয়ার আগে কিংবা শুরুর পর্যায়ে তেজষ্ক্রিয় কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা যেত, কিন্তু তেজষ্ক্রিয় একবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ওই তেজষ্ক্রিয়ের কেন্দ্র আর চিহ্নিত করা যায় না। কারণ তেজষ্ক্রিয় রাখা আছে ডিটেকশন প্রুফ কন্টেইনারে। কয়েকটি সুক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে তেজষ্ক্রিয়ের বিকিরণ হয়। বিকিরণের মাত্রা এত সুক্ষ্ম যে, ছড়িয়ে পড়া তেজষ্ক্রিয়ের সাথে তা প্রায় একাকার থাকে। এই অবস্থায় কেন্দ্রকে ডিটেক্টর আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে না। এই অবস্থায় তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের উৎস চিহ্নিত করে তা অপসারণের কোন উপায় নেই, সেই সাথে এর কোন এন্টিডোটও নেই। এখন এগুবার পথ কি! এই চিন্তাটাই আহমদ মুসাকে পেয়ে বসেছে।

রাতের জনবিরল রাস্তায় তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসাদের ভাড়া করা গাড়ি।

ড্রাইভার ছেলেটি যুবক বয়সের। পরনে ট্রাওজার, গায়ে জ্যাকেট। মাথার হ্যাটটা কপাল পর্যন্ত নামানো।

'কি ড্রাইভার, আমরা এতক্ষণও তো গেরোনে হাইওয়ে পেলাম না?' বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না।

আব্দুর রহমান সপ্তমের কথা বলার শব্দে আহমদ মুসার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

'একটু অন্য পথ দিয়ে যাচ্ছি তো।' একটু সময় নিয়ে জবাব দিল ড্রাইভার।

আব্দুর রহমান সপ্তমের প্রশ্ন, ড্রাইভারের দেরী করে জবাব দেয়া এবং ড্রাইভারের জবাবের ধরণ শুনে ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, অন্য পথটা কি বাঁকা পথ ড্রাইভার?

ড্রাইভার আবার একটু সময় নিয়ে বলল, জ্বি, একটু বাঁকা।

'এয়ারপোর্ট থেকে গেরোনে হাইওয়ে কোন দিকে?'

'পশ্চিম দিকে।' ড্রাইভার মুখ খোলার আগেই জবাব দিল আব্দুর রহমান সপ্তম।

আহমদ মুসা বসেছিল ড্রাইভারের পেছনের সিটেই।

আব্দুর রহমান সপ্তম কথা শেষ করার সংগে সংগে আহমদ মুসার বাম হাতটি দ্রুত গিয়ে ড্রাইভারের গলা সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল।

আহমদ মুসা দেখছিল স্পিডোমিটারের পাশে দিক নির্দেশক বোর্ডে গাড়ি যাচ্ছে উত্তর দিকে। কিন্তু আহমদ মুসা জানে তাদের গন্তব্যস্থল মুরেট দক্ষিণ দিকে। মুরেটগামী গেরোনে হাইওয়েতে পড়ার জন্য দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘোরা স্বাভাবিক, কিন্তু উত্তরে যাওয়া স্বাভাবিক নয়।

আহমদ মুসার হাত সাঁড়াশির মত চেপে ধরেছিল ড্রাইভারের গলা।

ড্রাইভারের গলা থেকে একটা শব্দও বের হলো না। রুদ্ধশ্বাস ড্রাইভারের চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হাত দু'টি তার সক্রিয় ছিল। এক হাত ছিল স্টিয়ারিং হুইলে, অন্য হাতে চেপে ধরেছিল হর্ন। একটানা বেজে চলছিল হর্ন।

আহমদ মুসা তার ডান হাত দিয়ে ড্রাইভারে হাত সরিয়ে দিল হর্ন থেকে। আহমদ মুসার বুঝতে অসুবিধা হয়নি হর্নের মাধ্যমে সংকেত পাঠাচ্ছে সে।

ওদিকে আব্দুর রহমান সপ্তম আহমদ মুসা ড্রাইভারের গলা পেঁচিয়ে ধরার সাথে সাথে এগিয়ে গিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরে ফেলেছিল। গাড়িটা অল্পকিছু এঁকে-বেঁকে এগিয়ে আবার সোজা চলতে শুরু করল।

ড্রাইভারের দেহটা শিথিল হয়ে এলে আহমদ মুসা টেনে তুলে তার দেহটা পেছনে নিয়ে এল এবং তাকে উপুড় করে ফেলে তাকে বেঁধে ফেলার জন্যে বলল জোয়ানকে। তারপর উঠে এল ড্রাইভারের সিটে। স্টিয়ারিং হুইল আব্দুর রহমান সপ্তমের হাত থেকে নিয়ে তাকে বলল, তুমি পেছনে গিয়ে ওকে সামলাও।

ড্রাইভিং সিটে বসে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা দেখল, পেছন থেকে তীব্র বেগে চার'টি হেডলাইট ছুটে আসছে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই পেছন থেকে আহমদ মুসার গাড়ির দু'পাশে দু'টি গাড়ি উঠে এল। ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছিল গাড়ি দু'টি।

আহমদ মুসা বুঝল, গাড়ি দু'টি ড্রাইভারের দলের। ওরা নিশ্চয় পেছন থেকে অনুসরণ করছিল। নিয়ে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদেরকে নিশ্চয় কোন একটা ফাঁদে। ড্রাইভারের হর্নে বিপদ সংকেত পেয়েই সম্ভবত ওরা এসেছে খোঁজ নিতে। হর্ন দিয়ে ওরা জানতে চাচ্ছে, ড্রাইভার ঠিক আছে কিনা।

আহমদ মুসা আরও বুঝল, তারা কোন এক অজ্ঞাত শত্রুর কবলে পড়েছে। কিন্তু কারা এরা? বিমান বন্দরে কেউ কি তাদের চিনে ফেলল? তা হলেও এটা কি করে সম্ভব! বিমান বন্দরে চিনে ফেললেও শত্রুদের পক্ষে এই আয়োজন এত তাড়াতাড়ি করে তো সম্ভব নয়! মনে হচ্ছে ফাঁদ যেন পেতে রাখা হয়েছিল। তাহলে কি তাদের আগমনের খবর আগেই এসে পৌঁছেছিল? হতে পারে ভেনিস অথবা মার্শেই বিমান বন্দরে কেউ তাদের চিনে ফেলে টেলিফোন করে দিয়েছে এখানে। ফ্রান্সের মার্শেই বিমান বন্দরেও তাদের ১ ঘন্টা যাত্রা বিরতি করতে হয়েছিল। কারা এই শত্রু? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কি? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হর্ন কোডের সাথে এদের হর্ন-সংকেতের মিল আছে। কিন্তু আনাড়ী মনে হচ্ছে অনেকটা। হতে পারে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানেরই কোন একটা গ্রুপ।

দু'পাশ থেকে দু'টি গাড়ি সমান্তরালে চলে আসার সাথে সাথে আহমদ মুসা গাড়ির গতি বেগ আকস্মিকভাবে বাড়িয়ে দিল। তীব্র বেগে সামনে এগোলো আহমদ মুসার গাড়ি।

ওরা মনে করল শত্রু পালাচ্ছে। ওরাও বাড়িয়ে দিল গাড়ির বেগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের গাড়ি আবার আহমদ মুসার গাড়ির পেছনে চলে এল। এবার পেছন থেকে ওরা গুলী করল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে। পর পর দু'টো গুলী। আহমদ মুসার গাড়ির দু'টি টায়ার প্রায় একই সাথে ভীষণ শব্দে ফেটে গেল।

কয়েক গজ মাটি কামড়ে, এগিয়ে গাড়িটি স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

'আব্দুর রহমান দেখো, ওর পকেটে নিশ্চয় পিস্তল আছে।'

আব্দুর রহমান সপ্তম পিস্তল আগেই বের করে নিয়েছিল। দ্রুত সে পিস্তলটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

পিস্তলটি হাতে নিয়েই আহমদ মুসা ডানদিকে তাকাল। দেখ গাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'জন ছুটে আসছে। হাতে ওদের পিস্তল। আহমদ মুসা মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পর পর দু'টি গুলী ছুড়ল। অব্যর্থ নিশানা। গাড়ি থেকে মাত্র দু'হাত দূরে এসে লোক দুটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা গুলী করার পর ওদিকে আর না তাকিয়েই লাফ দিয়ে চলে এল গাড়ির বাম পাশে।

'মুসা ভাই গাড়ির এ পাশটা লক করে দিয়েছি। দু'জন ওপাশে গেছে।' বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

'ধন্যবাদ আব্দুর রহমান, ডান পাশটাও লক করে দাও।' বলে আহমদ মুসা বাম পাশের দরজা খুলে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর সাপের মত দ্রুত বুকে হেঁটে গাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে এসে ডান প্রান্তে উঁকি দিল। দেখল ওরা দুজন পিস্তল বাগিয়ে গাড়ির গা ঘেঁষে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে গাড়ির সামনের দরজার দিকে।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। আরও দুটি গুলী বেরিয়ে এল তার পিস্তল থেকে পর পর। গুরিয়ে গেল ওদের দুজনের মাথা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় সামনে ডান পাশের গাড়ি থেকে নারী কন্ঠের একটা গোঙানী ভেসে এল। আহমদ মুসা পিস্তল বাগিয়ে ছুটল ঐ গাড়ির দিকে। গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। আহমদ মুসা দেখল হাত, পা, মুখ বাঁধা একটা মেয়ে গাড়ির সিটে বসে। মুখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা পিস্তলটি পাশে ফেলে দিয়ে মেয়েটির মুখের বাঁধন খুলে দিল।

মুখের বাঁধন খুলে গেলেই মেয়েটি কেঁদে উঠল হাউ মাউ করে।

আহমদ মুসা মেয়েটির হাত খুলে দিতে দিতে বলল, 'কেঁদো না বোন, তোমার আর কোনও ভয় নেই।'

এ সময় পাশে এসে দাঁড়াল আব্দুর রহমান সপ্তম। তার সাথে জোয়ানও।

‘তোমরা গাড়িটা লক করে দিয়ে এসেছো?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি হ্যাঁ।’ বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

‘ভাল করেছ, পুলিশ অন্তত একজনকে তো পাবে। কিছু জানতে পারবে।’

মেয়েটির পায়ের বাধনও খোলা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি মুখে রুমাল চেপে কাঁদছে তখনও।

‘বোন তুমি উঠে এসে সামনের সিটে বস।’ বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটি সংগে সংগেই যন্ত্রের মত নির্দেশ পালন করল। সামনে ড্রাইভিং সিটের পাশে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে।

জোয়ান ও আব্দুর রহমান বসল পিছনের সিটে।

দূরে পেছনে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল।

আহমদ মুসা স্টার্ট দিল গাড়িতে। ব্রান্ড নিউ গাড়ি। মাইল মিটারে দেখল মাত্র পাঁচশ মাইল চলেছে।

‘পেছনে চারটি হেডলাইট দেখা যাচ্ছে, পুলিশের গাড়ি এদিকে আসছে।’ পেছন থেকে বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

সব ঘটনা মাত্র দু’মিনিটে শেষ হয়ে গেল।

সামনেই রাস্তায় বড় একটা টার্ন। সে টার্নটি পার হবার পর পুলিশের গাড়ি আর দেখা গেল না। আহমদ মুসা আলো নিভিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। সুতরাং অত পেছন থেকে আহমদ মুসার গাড়ি তাদের নজরে পড়ার কথা নয়।

আহমদ মুসার গাড়ি চলছিল একশ’ চল্লিশ কিলোমিটার বেগে।

টার্ন নেবের পর আহমদ মুসা গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে আশিতে নিয়ে এল।

মেয়েটি তখনও রুমালে মুখ বুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মেয়েটির পরনে ব্রাউন স্কার্ট, ব্রাউন কোট। মাথায় সাদা পশমের টুপি। বয়স বিশ বছরের বেশী হবে না। নিরেট ফরাসী চেহারা।

‘বোন, তুমি কে? কি করে ওদের হাতে পড়লে?’ বলল আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই।

মেয়েটির কান্না বেড়ে গেল। একটু পরে চোখ মুছে সে বলল, আমার দাদি মুমূর্ষ। টেলিফোন পেয়ে আমি যাচ্ছিলাম ওঁর কাছে। রাত ১১টায় ওরা আমাকে আমার এই গাড়ি সমেত কিডন্যাপ করে গেরোন হাইওয়ে থেকে।

‘কেন কিডন্যাপ করে?’

‘প্রথমে আমার গাড়ি ব্যবহার ওদের টার্গেট ছিল। পরে আমাকেও ওদের ঘাটিতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওদের মতলব খুব খারাপ ছিল।’

‘তোমার দাদির বাড়ি কোথায়?’

‘মন্ট্রেজু’তে।’

‘মন্ট্রেজু’তে? এত দূরের রাস্তা একা বেরিয়েছিলে এত রাতে?’

‘কি করব আমার আব্বা আম্মা থাকেন স্পেনে, ফ্রান্সের কূটনীতিক মিশনে। আমি তুলুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, একা থাকি।’

‘এখন তুমি কি করবে? কোথায় যেতে চাও?’

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। মনে হয় স্থির করতে পারছিল না।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার। বলল, দ্বিধা করো না বোন। এটা তোমার গাড়ি। যদি মনে কর আমরা এখানেই নেমে যাচ্ছি, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাও। আর আমি মনে করি মন্টেজু-তে আজ তোমার যাওয়া ঠিক হবে না।

মেয়েটি মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। মনে তার প্রশ্ন, কে এরা? সে নিজ চোখেই দেখেছে এই লোকটিই ঐ চারজন গুন্ডাকে পাখি শিকারের মত করে খুন করেছে। এর তো হওয়া উচিত ছিল ওদের চেয়েও কঠিন হৃদয় ও লোভী। এই রাত সাড়ে বারটায় যখন গাড়ি পাওয়া দুস্কর, তখন এভাবে গাড়ি ছেড়ে নেমে যাওয়ার প্রস্তাব করছে কেমন করে? এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার তো সে দেখেনি!

“আজ আমাকে মন্টেজু” তে যেতে নিষেধ করছেন আপনি? বলল মেয়েটি।

ঠিক নিষেধ করছি না, আমি মনে করি একা যাওয়া নিরাপদ নয়।

মেয়েটির আরেক দফা বিস্মিত হবার পালা। একজন অচেনা, অজানা লোক তার নিরাপত্তার কথা এই ভাবে ভাবছে। মেয়েটির মনে পড়ল তার ছোটবেলার কথা। তখন পিতা মাতার সাথে থাকতো কায়রোতে। ওখানকার এক বৃদ্ধকে সে দেখত। তার কাজ ছিল অসুস্থ লোকের সেবা করা, পথহারা লোকদের পথ দেখানো এবং হারানো শিশুদের বাড়িতে পৌছে দেয়া। কিন্তু সে কারও গায়ে আচড় দিত না, আর এতো জলজ্যান্ত ৪টি লোক এখনি মারল। এখনও পিস্তল ওর পকেটে। এরপরও লোকটি এমন দায়িত্বশীল ও সৌজন্য বোধ সম্পন্ন হলো কি করে!

এ সময় নেমে গেলে আপনারা গাড়ি পাবেন কোথায়? এত রাতে তুলুজে কচ্চিত গাড়ি মেলে। বলল মেয়েটি।

কোন চিন্তা করো না। মানুষের চেষ্টা যেখানে শেষ হয়, বিধাতার চেষ্টা সেখান থেকে শুরু হয়।

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, আপনি বুঝি ঈশ্বরে খুব বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই। তিনি আমার স্রষ্টা, তিনি আমার প্রতিপালক এবং তিনিই আমার সব কাজের বিচারক হবেন।

মেয়েটির মুখ হা হয়ে উঠল। লোকটি যে একদম গীর্জার ফাদারের মত কথা বলছে। কিন্তু গীর্জার ফাদাররা তো রক্তপাত করে না। কে এই বিচিত্র চরিত্রের চরিত্রের লোকটি।

একটু সময় নিয়ে মেয়েটি মুখ খুলল। ফিরে এল তার প্রসংগে। বলল, জনাব মন্ট্রেজু আমার যেতে হবে, জানি না আমার দাদির.......

মেয়েটির কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল। কথা শেষ না করেই সে থেমে গেল।

মিঃ সেভেন, আমাদের গন্তব্য তো মুরেট, মন্ট্রেজু এই একই রাস্তায় না? আহমদ মুসা একটু ঘাড় কাত করে পেছনে লক্ষ্য করে বলল।

আবদুর রহমান সপ্তমকে আহমদ মুসা বাইরের লোকদের সামনে তার নামে না ডেকে মিঃ সেভেন বলে।

জি হ্যাঁ। বলল আবদুর রহমান।

মুরেটে হল্ট করা কি আমাদের জন্য অপরিহার্য?

মোটেই না। আমরা শুধু ওখানে রাত কাটাতে চেয়েছিলাম।

আমরা তাহলে এখন সোজা মন্ট্রেজু যেতে পারি। ওকেও পৌছে দেয়া গেল, আমরা ওর গাড়িতে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারলাম।

এটাই বেটার হবে। বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

আমি এখানকার রাস্তা ঘাট কিছুই চিনি না। তুমি আমাকে গাইড কর, এখন আমরা গেরোনে হাইওয়েতে উঠব। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটির চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। জীবনের আশাই যেখানে সে ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানে শুধু মুক্তি পাওয়াই নয়, রাতেই মন্ট্রেজুতেও সে যেতে পারছে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন পাশে বসা লোকটির প্রতি। সে তাকে সাক্ষাত জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করেছে। জীবনের ভয় সে করে না। কিন্তু গুন্ডাদের হাতে পড়লে জীবনের চেয়েও মুল্যবান জিনিস তাকে হারাতে হতো।

অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।

মেয়েটি রাস্তা বাতলে দিল। মিনিট পাচেকের মধ্যেই আহমদ মুসার গাড়ি উঠে এল গেরোনে হাইওয়েতে।

এবার ছুটল গাড়ি দক্ষিণ দিকে গেরোনে হাইওয়ে ধরে। একদম রাস্তার ধার বরাবর প্রবাহিত দক্ষিণ ফ্রান্সের একটা বড় নদী গেরোনে। এই নদীর নাম অনুসারেই হয়েছে রাস্তার নাম। গেরোনে নদী নেমে এসেছে পিরোনিজ পর্বতমালা থেকে। পিরেনিজ-অভ্যন্তরের ছোট্ট দুর্গম নগরী ভেল্লা পর্যন্ত হাইওয়ে ও নদী এক সাথেই গেছে। ভেল্লা স্পেনের উত্তর সীমান্তের উপর দাড়ানো ছোট্ট পার্বত্য শহর। এই শহরের অদূরে দুর্গমতর এক উপত্যকায় আবদুর রহমান সপ্তমের বসতি।

রাতের গেরোনে হাইওয়ে।

একদম ফাকা।

তীরের মত ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ি।

ঐ গুন্ডারা আপনাদের কিডন্যাপ করেছিল কেন? মৌনতা ভেঙ্গে প্রশ্ন করল মেয়েটি।

আমরা ওদের চিনি না, মতলব কি তাও জানি না। আগে থেকেই ফাদ পেতে বসেছিল ওরা। বলল আহমদ মুসা।

ওদের গল্প থেকে বুঝেছি, ভেনিস বিমান বন্দর থেকে কেউ ওদের টেলিফোন করেছিল। ওদের গল্পে এও বুঝেছি, সাংঘাতিক একজনকে ওরা ধরতে যাচ্ছে। সেই সাংঘাতিক লোক কে? আপনি?

তোমার তাই মনে হয় আমাকে?

মেয়েটির মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। বললো, হ্যাঁ।

কেন?

সাংঘাতিক না হলে ওভাবে চারজন ভীষণ গুন্ডা কি মরত?

সাংঘাতিক শব্দ কিন্তু কদর্যে ব্যবহৃত হয়। আমি কিন্তু ওদের হত্যা করিনি, ওদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করেছি।

সরি। আমি সাংঘাতিক বলতে শক্তি বুঝিয়েছি।

আহমদ মুসা উত্তরে কিছু বলল না।

চলছিল গাড়ি ঝড়ের বেগে।

মাফ করবেন, আপনি কে? আপনারা কে? মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল।

পরিচয় জিজ্ঞাসা না করলেই খুশী হতাম মি....। তোমার নাম যেন কি?

আমি ডোনা জোসেফাইন। আপনার নাম?

বললাম তো জিজ্ঞাসা না করলেই খুশী হতাম। সংক্ষেপে, এ, এম, বলতে পার আমাকে। তোমার আব্বা কি রাষ্ট্রদূত স্পেনে?

জি হ্যাঁ।

তুমি তোমার আব্বার সাথে থাক না?

ছিলাম প্রাইমারী লেভেল পড়া পর্যন্ত।

কোন কোন দেশ তুমি দেখেছ?

কায়রো, রিয়াদ ও আংকারার কথা মনে আছে।

তোমার আব্বা মুসলিম দেশেই তো বেশী ছিলেন দেখছি?

হ্যাঁ, আমার আব্বা সারাসিনিক স্ট্যাডিজ-এ ডক্টরেট নিয়েছেন।

তোমরা কি খৃষ্টান?

বলছি, কিন্তু আপনার এ, এম, এর অর্থ কি?

ঠিক এই সময় সামনে অল্প দূরে রেড সিগন্যাল স্টিক জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

প্রত্যেক গাড়িতেই এ ধরনের সিগন্যাল থাকে। বিপদে পড়লে এটা দিয়ে সংকেত দেয়া হয়।

হেড লাইটের আলোতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, দুজন লোক পাশাপাশি দাড়িয়ে আছে। একজনের হাতে রেড সিগন্যাল। তাদের পাশেই রাস্তার এক ধারে একটা গাড়ি পার্ক করা।

রেড সিগন্যাল দেখার সাথে সাথেই ডোনার মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। বলল, আজকেই কাগজে পড়েছি হাইওয়েতে রাতের বেলা ডাকাতি হচ্ছে, কিডন্যাপ হচ্ছে। কিডন্যাপ করে রেখে বড় অংকের টাকা দাবী করছে।

ভয় নেই ডোনা, ওরা তো সংখ্যায় খুব বেশী দেখছিনা।

বলে আহমদ মুসা বাম হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করে নিল এবং বলল, ডোনা, জোয়ান, আবদুর রহমান তোমরা মাথা নিচু রাখ। মতলব ওদের খারাপ হলে নিশ্চয় ওরা গুলী করবে।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি একটুও স্লো করলো না। সে পরীক্ষা করতে চাইল, ওরা সত্যিই বিপদগ্রস্থ কেউ কিনা। বিপদগ্রস্থ হলে সিগন্যাল দেখানো এবং চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই করবে না। আর যদি ডাকাত-হাইজাকার হয় ওরা, তাহলে গাড়ি না দাড়াতে দেখলে নিশ্চয় গাড়ির টায়ার ফাটাবার চেষ্টা করবে।

তাই হলো। আহমদ মুসার গাড়ি যখন দাঁড়ানোর ভাব দেখালো না এবং দাঁড়ানো লোক দু'টি যখন পয়ঁতাল্লিশ ডিগ্রি এ্যাংগেলে এল, তখন দু'জনই দ্রুত রিভলবার বের করল।

আহমদ মুসা একটু অপেক্ষা করছিল। ডান হাতে পিস্তল তার রেডি ছিল। ওরা পিস্তল হাতে তুলে নেয়ার সাথে সাথে আহমদ মুসা গুলী করল পরপর দু'টি।

ওদের পিস্তল উঠে আসছিল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে। কিন্তু লক্ষ্যে উঠে আসার আগেই গুলী খেয়ে দু'জন পড়ে গেল রাস্তায়।

একই গতিতে গাড়ি ছুটছিল। গুলী করার সময় মনোযোগটা টার্গেটের দিকে শিফট হবার পরও গাড়ির মাথাটা একটুও কাঁপেনি। বাম হাতটা নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে গাড়িটাকে।

গাড়িটা ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে এল।

পেছন থেকে জোয়ান বলল, মুসা ভাই, গাড়ি থেকে আরও তিনজন বেরিয়ে এসেছে। ছুটছে এ দিকে।

পর মুহূর্তেই গুলীর তিনটি শব্দ পাওয়া গেল। প্রায় এক সাথেই। সম্ভবতঃ হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া শিকারের লক্ষ্যে তিনটি গুলী ছুড়ে ব্যর্থতার জ্বালা জুড়াবার চেষ্টা করেছিল ওরা।

'গুলী খাওয়া দু'টির খবর কি জোয়ান?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'দু'জন মাটি থেকে আর ওঠেনি।

ডোনা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। সবিস্ময়ে সে ভাবছিল, কি অদ্ভুত লোক! কত কঠিন কাজ সে কত সাধারণভাবে করে ফেলে! এত বড় বিপদের সে মোকাবিলা করল, তার মুখে চিন্তার কোন ছায়াও পড়েনি। গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে যেন ছিল একটা খেলার মত। এমন নার্ভ, গুলীর এমন নিশানা তার কাছে রূপ কথার মত লাগছে। রূপ কথার মত এই যে লোক, সে নিশ্চয় অসাধারণ কেউ হবে।

আহমদ মুসার দিকে অপলক চেয়ে ডোনা বলল, দয়া করে কি বলবেন আপনি কে? ওঁ আপনাকে 'মুসা ভাই' বলেছে, আপনার নাম এ, এম, এর অর্থ কি? এম এর অর্থ 'মুসা' ধরে নিলাম, কিন্তু 'এ'-এর অর্থ?

'ধন্যবাদ ডোনা, খুব বুদ্ধিমতি তো তুমি। আবিস্কার করেই ফেলেছ নামটা। 'এ'-এর অর্থ 'আহমদ'।

'অর্থাৎ আপনি, 'আহমদ মুসা'। মুসলমান?'

‘কায়রো, রিয়াদ ও আংকারায় তো তুমি মুসলমান দেখেছ, তাই না?’

‘দেখেছি। কিন্তু মুসলমানদের খুব ভয় করি ওরা নাকি খুব ঝগড়াটে জাতি। তিন’শ বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড করেছে।’

‘ডোনা, ক্রুসেড হয়েছিল কোথায় বলত?’

‘ফিলিস্তিন অঞ্চলে।’

‘ঐ অঞ্চলে কাদের বাস?’

‘মুসলমানদের।’

‘তাহলে ক্রুসেড করতে মুসলমানরা এসেছিল, না খৃষ্টানরা গিয়েছিল?’

একটু ভাবল। হাসল ডোনা। বলল, বুঝেছি, বলতে চাচ্ছেন, খৃষ্টানরাই ক্রুসেড করতে গিয়েছিল মুসলিম ভূ-খন্ডে। এবং দায়ী খৃষ্টানরাই।’

‘আমি বলতে চাচ্ছি না ডোনা, ইতিহাস বলে এটা। খৃষ্টানরা অমূলক এক উম্মাদনা আর কুৎসিত এক রক্ত পিপাসা নিয়ে অন্যায় এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল মুসলমানদের উপর। সে সময় খৃষ্টানরা ধর্মের নামে যা করেছে, তার চেয়ে অধর্মের কাজ আর নেই ইতিহাসই এটা বলছে।’

’আমি ইতিহাস জানি না। আব্বা এ বিষয়টা ভাল বলতে পারবেন। তিনি বলেন, কায়রো, আংকারার মত জায়গায় সাধারণভাবে যে সব মুসলমান দেখ, ওরা ইসলামের ধ্বংসাবশেষ।’

‘অর্থাৎ?’

‘আব্বা বলেন, কোন নগরীর বিক্ষিপ্ত সামান্য ধ্বংসাবশেষ দেখে যেমন সেই নগরীর পূর্ণাংগ ছবি আঁকা যায় না, তেমনি ঐসব মুসলামানের সমাজ ও জীবন দেখে ইসলামের পূর্ণ রূপ কল্পনা করা যায না।’

‘তোমার আব্বা ঠিকই বলেছেন, ইসলামকে নিশ্চয় তিনি জানেন। তবে কি জান, ইসলাম কিন্তু আল-কোরআন, হাদীসে রসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে, বিকৃত হয়েছে ঐ মুসলমানরা। এই বিকৃতিকে সংশোধনের কাজও কিন্তু চলছে।’

‘আপনাকে দেখে এটাই মনে হচ্ছে। একমাত্র বাপ-মার’র কাছ ছাড়া আজকের এই সময়ের মত এমন নিরাপত্তা বোধ আর কখনও করিনি। আমার জীবনে ‘বোন’-এর সম্মানজনক সম্বোধন দিয়ে কেউ আমাকে ডাকেনি।’

ডোনার কণ্ঠ গম্ভীর শোনাল।

‘ইসলাম সকল মানুষকে ভাই ও বোনের মধুর সম্পর্কে এক সাথে বেঁধে দিয়েছে।’

ডোনা একটা ভাবল। একটু পর বলল, ‘আমার ভাবতে ভাল লাগছে, এমন পবিত্র সম্পর্ক যেখানে, সে সমাজে শান্তি ও সকলের নিরাপত্তা আসা আমার মনে হয় খুব সহজ।’

ডোনার কথাটা স্বগতোক্তির মত শোনাল। তার দৃষ্টি প্রসারিত ছিল সামনে।

আহমদ মুসাও আর তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। তারও দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

বাইরে রাতের নিঃশব্দ প্রহর।

দু’পাশে অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের অন্তহীন শ্রেণী।

এরই মাঝে মসৃণ পাথুরে পথ বেয়ে শোঁ শোঁ এক শব্দ তুলে তীর বেগে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

মন্ট্রেজু থেকে গোরানে হাইওয়ে ধরে পিরেনিজ পর্বতমালার কোলে দাঁড়ানো দক্ষিণ ফ্রান্সের সর্বশেষ শহর। ম্যানোনার দিকে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। গাড়িটি ডোনার। মন্ট্রেজু থেকে আসার সময় গাড়িটি ডোনা উপহার দিয়েছে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা নিতে অস্বীকার করেছিল। বলেছিল স্পেনে যাবার ট্যাক্সি সার্ভিস আছে, অসুবিধা হবে না। উত্তরে ডোনা কিছু বলেনি। তার দু’চোখ ভরে উঠেছিল অশ্রুতে, নেমে এসেছিল দু’গন্ড বেয়ে। ডোনার আব্বা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। পক্ককেশ কুটনীতিক চার্লস প্লাতিনি আহমদ মুসার পিট

চাপড়ে বলেছিল, আমার একটি মাত্রই মা। বড় একা। তাই বোধহয় বড় জেদি। একটা ভাই পেয়ে ওর কি গর্ব। ওকে প্রত্যাখান করো না।

‘না, আব্বা, থাক। কারো ভাল লাগা, না লাগা, পছন্দ-অপছন্দের উপর জোর খাটানো যায় না আব্বা।’ বলে ডোনা দু’হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাচ্ছিল।

‘ডোনা, দাঁড়াও। আহমদ মুসা শক্ত কণ্ঠে নির্দেশের সুরে বলেছিল। ডোনা এ নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারেনি। নির্দেশের সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থেকেই ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। অশ্রুতে তার চোখ ভিজা।

আহমদ মুসা দু’ধাপ সামনে এগিয়ে তার সামনা-সামনি হয়ে বলেছিল, আমার উপর অবিচার করছ ডোনা। উপহার মানুষ যত্নে রাখে। আমার সে জায়গা কোথায়, সময় কোথায়? চীনে তোমারই মত এক বোন তার প্রিয় সাদা রিভলবার আমাকে উপহার দিয়েছিল। আমি তা রাখতে পারিনি। বলকানে এসে তা খুইয়েছি। তোমার গাড়ি আজ নেব, কালকেই হয়তো দেখবো এক ঝাঁক গুলীতে এর দেহ ঝাঝরা হয়েছে, অথবা বোমা মেরে কেউ উড়িয়ে দিয়েছে। অথবা আমার হাত ছাড়াও হতে পারে। তখন আমার কষ্ট লাগবে।’

‘তাহলেও ঐ পিস্তলের মত আমার গাড়ি হবে সৌভাগ্যবান।’

‘ঠিক আছে, তোমারই জয় হলো ডোনা। তোমার এই সহমর্মীতা ও সহযোগীতার জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে।’

‘কোথায় আমি কি করলাম? ‘

‘তোমার গাড়ি আমাদের যাত্রাকে অনেক সহজ ও স্বাধীন করবে।’

‘ধন্যবাদ। আমার ভাগ্য, আমার গাড়ি বিশ্ববিখ্যাত আহমদ মুসার সঙ্গ পাবে।’

বলে ছুটে চলে গিয়েছিল ডোনা তার গাড়ির কাছে।

আহমদ মুসার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছিল ওদের কাছে আহমদ মুসা ডোনার বাড়িতে আসার পরেই।

ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি তার মা' অসুস্থতার খবর স্পেন থেকেই পেয়েছিল। পেয়েই স্থল পথে ছুটে এসেছিল মন্ট্রেজু'তে। ডোনা পৌঁছার আগেই তার আব্বা পৌঁছে গিয়েছিল।

ডোনা বাড়িতে পৌঁছে আহমদ মুসাদের ড্রইং রুমে বসিয়ে ছুটে গিয়েছিল ভেতরে। ভেতরে ঢুকে পেয়েছিল তার আব্বাকে। তার আব্বা তখন টেলিফোন করছিল তুলুজে। ডোনাকে দেখে টেলিফোনে রেখে সে লাফিয়ে উঠেছিল। জড়িয়ে ধরেছিল ডোনাকে। বলেছিল, সেই সন্ধ্যায় বেরিয়েছিস তুলুজ থেকে। তোর কোথায় কি হলো ভেবে আমাদের দম বন্ধ হবার যোগাড়। রাস্তায় কিছু হয়েছিল? এত দেরী হলো কেন? কেন রাতে একা বেরিয়েছিলি?'

ডোনা সংক্ষেপে বলেছিল তার কিডন্যাপ হওয়া এবং উদ্ধার পাওয়ার ঘটনা।

শুনতে গিয়ে বার বার কেঁপে উঠেছিল ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি। শেষে আহমদ মুসার নাম শুনে চমকে উঠেছিল। বিস্ময়ের সাথে বলেছিল, ঠিক বলছিস ওঁর নাম, উনি আহমদ মুসা বলেছিলেন? ঠিক শুনেছিস তুই?'

'ঠিক আব্বা। নাম বলতে চাননি, বলেছিলেন, এ.এম। তারপর তার সাথীর ডাক থেকে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। পরে স্বীকার করেন।

থেমেছিল ডোনা একটু, 'তারপরেই আবার চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে বলেছিল, ওভাবে যে বলছ, চেন নাকি আব্বা তাঁকে?

'বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিপ্লবী আহমদ মুসাকে জানি, তার ফটো দেখেছি। তোমার মুখে যে দুঃসাহসিক কাজ ও যে দুর্লভ চরিত্র বৈশিষ্টের কথা শুনলাম, তাতে ইনিই সেই আহমদ মুসা হবে। আমরা জেনেছি তিনি স্পেন অঞ্চলে এসেছেন।'

আব্বার কথা শুনে ডোনার মুখ থেকে ও বিস্ময় আনন্দ ঠিকরে পড়েছিল। আহমদ মুসার কথা পড়েছে পত্রিকায়। বার বার তাকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছ। কেউ তাকে 'নিউ সালাহ উদ্দিন বলতো, কেউ বলতো সে মুসলমানদের 'মাওসেতুং', কারও কাছে সে ছিল স্পেন বিজয়ী 'তারিক বিন জিয়াদ' ও 'মুসা বিন নুসায়ের'-এর নতুন রূপ, কেউ আবার তাকে ডাকতো 'মুসলিম রবিনহুড'

বলে। আসার পথে ডোনার একবারও কিন্তু এসব কথা খেয়াল হয়নি, একবারও মনে আসেনি এ আহমদ মুসা সে আহমদ মুসাই হতে পারে!

আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল ডোনা। বলেছিল, 'ঠিক বলেছ আব্বা, ইনি তিনিই হবেন। এ আহমদ মুসা সে আহমদ মুসা হলেই শুধু সব দিক থেকে মানায়।'

তারপর বাপ-বেটি দুজনেই ছুটে গিয়েছিল তাদের ড্রইং রুমে।

ডোনা ছোট্ট চঞ্চলা বালিকার মত ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার সামনে গিয়ে বলেছিল, 'বুঝেছি, আপনার নাম বলতে চাননি কেন? চিনেছি আপনাকে। আপনি সেই আহমদ মুসা।'

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে ডোনাকে এসে দাঁড়াতে দেখে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই ডোনার আব্বা আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, ওয়েলকাম গ্রেটম্যান, আমি ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'খুশী হলাম আপনার সাথে দেখা হওয়ায়।

চার্লস প্লাতিনি আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, ডোনা আমার একমাত্র সন্তান, তাঁকে আপনি নতুন জীবন দিয়েছেন। আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহন করুন।

'জনাব, আমার বা আমাদের কারও কৃতিত্ব নেই আমরাও হাইজ্যাক হয়েছিলাম। নিজেরা বাঁচতে গিয়ে ওকে বাঁচানোর সুযোগ পেয়ে যাই আমরা। প্রশংসা আল্লাহর। তিনিই আমাদের সাহায্য করেছেন।'

'ধন্যবাদ আপনাকে, গ্রেটম্যানের কথা এরকমই হয়ে থাকে।'

'লজ্জা দেবেন না, আমি আপনার ছেলের মত। আমাকে 'তুমি' বললে খুশি হবো।'

পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত আহমদ মুসা ডোনাদের বাড়িতে ছিল। অনেক কথা হয়েছিল ডোনার সাথে, ডোনার আব্বার সাথে।

ডোনার আব্বার সাথে পরিচয় হয়ে উপকৃত হয়েছে আহমদ মুসা। ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি প্রবীণ কুটনীতিক। কুটনৈতিক ও গোয়েন্দা সূত্রের অনেক খবর তিনি রাখেন। তিনি আহমদ মুসা কে জানিয়েছিলেন, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান স্পেনে মুসলিম স্থাপনা ও ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন গুলোতে যে তেজস্ক্রিয় পেতেছে, তা ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা অতি সম্প্রতি জানতে পেরেছে এবং স্পেন সরকারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু স্পেন সরকার এটাকে ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডা বলে অভিহিত করেছে। তাদেরকে বিশ্বাস করাবার মতো কোন ডকুমেন্টও নেই। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে কেউ-ই ঘাটাতে চায় না বলে ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগও এ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ডোনার আব্বা আরও একটা মূল্যবান তথ্য আহমদ মুসাকে জানিয়েছিল। সেটা হলো, প্রথমে মুসলিম স্থাপনাগুলোর বিস্তারিত নক্সা তৈরী হয়। সেই নক্সায় বৈজ্ঞানিক পরিমাপ অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় সেট করার স্থান নির্দিষ্ট হয়। সেই নক্সা অনুসারে নিখুঁতভাবে তেজস্ক্রিয়গুলো পাতা হয়। এই নক্সা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর কারও কাছে আছে। সেই নক্সা না পাওয়া গেলে সেই তেজস্ক্রিয় ইউনিটগুলো খুঁজে বের করা অসম্ভব।

আহমদ মুসা বলেছিল, স্থাপনাগুলোর ইট, পাথর, সিমেন্ট, মাটি ইত্যাদি পরীক্ষা করলেই তো তেজস্ক্রিয় ধরা পড়বে, স্পেন সরকারের কাছে এটা কি ডকুমেন্ট হতে পারে না?

ডোনার আব্বা উত্তরে বলেছিল, 'এক খন্ড কংক্রিট পরীক্ষা করলে ঐ টুকুর মধ্যে যে মাত্রার তেজস্ক্রিয় পাওয়া যায় তা এতই স্বল্প যে, এ থেকে প্রমাণ হয় না অস্বাভাবিক কোন তেজস্ক্রিয় সংক্রমণের ফল এটা এবং এ থেকে আরও প্রমাণ হয় না যে, অব্যাহত তেজস্ক্রিয় সংক্রমন চলছে।'

কথার উপসংহার টানতে গিয়ে ডোনার আব্বা আরও বলেছিলেন, এ নতুন ধরণের এক ভয়ানক যন্ত্র। ইউরোপের দু'একটা ল্যাবরেটরীই হয়তো পারে এর সঠিক প্রকৃতি প্রতিক্রিয়া নিরুপণ করতে। এখানেই হয়েছে মুস্কিল, কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।'

আহমদ মুসা এই মূল্যবান তথ্য পেয়ে খুশী হয়েছিল, সেই সাথে ভীষণ হতাশও হয়ে পড়েছিল। চার্লস প্লাতিনি স্বান্তনা দিয়ে বলেছিল, মাদ্রিদে ফরাসি

দূতাবাসের দ্বার আহমদ মুসার জন্যে খোলা, যতটা পারে, যতদিক দিয়ে পারে সে তাদেরকে সাহায্য করবে।'

পরদিন সকাল ১০টায় আহমদ মুসা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

বিদায়ের সময় চার্লস প্লাতিনি এবং ডোনা দুজনেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। ডোনার আব্বা আহমদ মুসার সাথে বিদায়ী হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে বলেছিল, 'যুগের সবদিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষের সাথে একটা রাতের একটা অংশ আর একটা সকাল কাটাবার সৌভাগ্য আমার হলো। এমন সময় আরও পেলে খুশী হবো। আর ডোনা বলেছিল, 'আমি আপনাকে বিদায় দিচ্ছি না, বোন ভাইকে বিদায় দেয় না।' বলেই মাথা নিচু করেছিল ডোনা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। একটা ভেঙ্গে পড়া উচ্ছ্বাসে তবু কাঁপছিল তার ঠোঁট।

ডোনার একথাগুলো এবং ডোনার আব্বার অনেক কথা বাজছিল আহমদ মুসার কানে, তার চোখে ভাসছিল ডোনাদের শেষ বিদায়কালীন ছবি। আহমদ মুসা ভাবল, মানুষের মনের মায়া-মমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুন্দরতম নেয়ামত। এই নেয়ামতই মানুষের সমাজকে মানুষের সমাজ রেখেছে।

ড্রাইভিং সিটে ছিল আব্দুর রহমান সপ্তম।

ছুটে চলছিল গাড়ি ডোনাদের মন্ট্রেজুকে পেছনে ফেলে ফ্রান্সের সীমান্ত শহর ম্যানোনার দিকে গেরোনে হাইওয়ে ধরে।

ম্যানোনা যতই কাছে এগিয়ে আসছে, পথ ততই দুর্গম হয়ে উঠছে। গাড়ির গতি কমে আসছে ততই। বেলা একটার দিকে ম্যানোনা অতিক্রম করলো আহমদ মুসার গাড়ি। ম্যানোনা শহর পার হয়ে একটা উপত্যকায় গাড়ি থামিয়ে আহমদ মুসারা নামায পড়ে নিল।

ম্যানোনা থেকে ১০মাইল দূরে ফ্রান্স স্পেন সীমান্ত। সীমান্ত রেখাটি পিরেনিজের উত্তর ঢাল বরাবর। ফরাসী সীমান্ত পুলিশের ফাঁড়িতে নাম লিখিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে স্পেনে প্রবেশ করতে হয়। স্পেন পুলিশের সীমান্ত ফাঁড়িতেও এ ধরণের একটা ব্যবস্থা। এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে কোনই অসুবিধা হয়নি

আহমদ মুসাদের। যাবার সময়ই আহমদ মুসার পাকা কাগজ-পত্র তৈরী হয়েছিল। স্পেনের নাগরিক হিসেবে পাসপোর্ট করা হয়েছিল আহমদ মুসার।

সীমান্ত ফাঁড়ির ঝামেলা চুকানোর পর আবার যাত্রা শুরু হলো আহমদ মুসাদের। এবার পথ আরও দুর্গম। পিরেনিজের একদম বুকের উপর দিয়ে চলছে এখন তারা। ভেল্লা পর্যন্ত পথ এ রকমই। ভেল্লা এখনও পনের মেইল দূরে।

ভেল্লা ছোট্ট একটি পার্বত্য শহর। উত্তরে স্পেনের সর্বশেষ শহর এটি। বাসক এলাকার মধ্যে পড়েছে এ অঞ্চলটি।

বেলা ৪টার দিকে। আহমদ মুসারা ভেল্লা শহরে প্রবেশ করল। আহমদ মুসারা ঠিক করেছে শহরে নাস্তা সেরে নামায পড়ে তারা আবার যাত্রা শুরু করবে মাদ্রিদের পথে। ভেল্লা থেকে মেইল দশেক পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা একটা উপত্যকায় আব্দুর রহমান সপ্তমের বাড়ি। যাওয়ার পথে আহমদ মুসা আব্দুর রহমান সপ্তমের বাড়িতে গিয়েছিল। এক রাত সেখানে থেকেছিল। এবার আর সে রকম কোন প্রোগ্রাম নেই। আহমদ মুসা যতটা সম্ভব দ্রুত মাদ্রিদ পৌঁছুতে চায়।

নাস্তা ও নামায সেরে আবার যাত্রা শুরু করেছিল আহমদ মুসারা। আগের মতই ড্রাইভিং সিটে আবদুর রহমান সপ্তম।

একটা হাসপাতলের পাশ দিয়ে এগুচ্ছিল গাড়ি। হঠাৎ আবদুর রহমান সপ্তম ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে হাঁক দিলঃ আবুল হাসান।

কয়েক মুহূর্ত পরেই এক যুবক এসে দাঁড়াল আবদুর রহমান সপ্তমের সামনে।

'আম্মা অসুস্থ, আমি ওষুধ নিতে এসেছি।' এসে দাড়িয়েই যুবকটি বলল।

আহমদ মুসা যুবকটিকে চিনতে পারল। আবদুর রহমান সপ্তমের ছোট ভাই সে।

কি অসুখ? উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

'বুঝা যাচ্ছে না। ডাক্তার দেখেছেন। ওষুধ নিতে এসেছিলাম।'

আবদুর রহমান সপ্তম তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল আবদুর রহমান সপ্তমের মনের কথা। বলল আবদুর রহমান গাড়ি ঘুরাও। ওঁকে না দেখে যাওয়া যায় না।

‘ধন্যবাদ মুসা ভাই। বলে আবদুর রহমান আবুল হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল,’ গাড়ি এনেছ?’

‘হ্যাঁ’। বলল আবুল হাসান।

‘যাও, গাড়ি নাও, চল যাই।’

আবুল হাসান এগিয়ে গেল কার পার্কিং এর দিকে।

এবার গাড়ি চলতে শুরু করল। আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়ির দিকে। আগে আহমদ মুসাদের গাড়ি। পেছনে আবুল হাসানের গাড়ি।

‘আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়ি কোথায় কতদূর?’ বলল জোয়ান।

‘নিউ ভ্যালেনসিয়া, মাইল দশেক পশ্চিমে।’

নিউ ভ্যালেনসিয়া একটা সমৃদ্ধ উপত্যকা। চারদিকে পাহাড়ের দেয়াল।

উপত্যকায় প্রবেশের একটাই পথ, উত্তর দিকের একটি মাত্র গিরি পথ। বেশ প্রসস্ত। এটাই উপত্যকায় প্রবেশের দরওয়াজা।

উপত্যকায় উর্বর মাটিতে প্রচুর ফল ও ফসল উৎপাদিত হয়। বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর পরিমানে বাইরে বিক্রি করতে পারে।

উপত্যকায় প্রায় ৫’শ বাসক ও মুসলিম পরিবার বাস করে। জনসংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মত। এর প্রায় সবাই মুসলমান। এদের অনেকে দক্ষিণ ও স্পেন থেকে পালিয়ে আসা তবে বেশির ভাগই ধর্মান্তরিত। বাসক সম্প্রদায়ের প্রচুর পরিবার খৃষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। জনশ্রুতি আছে ষোড়শ শতকের শুরুতেই এক দরবেশ নানা স্থান ঘুরে তার স্ত্রী সহ এসে এই উপত্যকায় আস্তানা গেড়েছিলেন। স্থায়ী জনপদ তখন এ উপত্যকায় গড়ে উঠেনি। সে পবিত্র দরবেশকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল স্থায়ী জনপদ। সে দরবেশ জ্ঞানে ছিলেন সবজান্তা সুপন্ডিত, চরিত্রে ছিলেন ফেরেশতা তুল্য। মানুষ তাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা দিয়ে মাথায় রাখতো, কিন্তু তিনি নিজেকে মনে করতেন মানুষের এক নগন্য সেবক। যেখানে মানুষের বিপদ সেখানেই তিনি। প্রতিটি দুঃখী ও অসুস্থ মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতো, তাদের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে, চিকিৎসকের সেবা নিয়ে পবিত্র দরবেশ আবদুর রহমান আসবেনই। তার চরিত্রে ইসলামের রুপ-মাধুর্য দেখে শুধু এই উপত্যকার নয়, আশে পাশের শত শত পরিবার ইসলাম গ্রহণ

করে। আবদুর রহমান সপ্তমরা সেই দরবেশ আবদুর রহমানেরই বংশধর। উপত্যকার একটি সুন্দর সবুজ টিলায় তাদের বাড়ি। উপত্যকায় প্রবেশ করলেই দেখা যায় সুন্দর টিলাটি, তার আগে দেখা যায় টিলায় অবস্থিত মসজিদের সুউচ্চ মিনার।

আহমদ মুসাদের গাড়ি উপত্যকায় প্রবেশ করল, আযান ধ্বনিত হচ্ছিল সে মিনার থেকে। আযানের ধ্বনি সেই কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছিল সমগ্র উপত্যকায়, প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল পাহাড়ের বুকে।

সবে সূর্য ডুবেছে। কিন্তু পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় তখন অন্ধকার। উপত্যকার সবুজ আর সন্ধ্যার কালো একসাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

অন্ধকার জড়িত নিঃশব্দ এই পরিবেশে মধুর আযানের ধ্বনি প্রতিধ্বনি অপরুপ লাগছিল আহমদ মুসার কাছে। সমগ্র সত্তা দিয়ে উপভোগ করছিল আহমদ মুসা সেই আযান।

‘এই আযান বাসক এলাকা ছাড়া স্পেনের আর কোথাও পাবেন না মুসা ভাই।’ বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

‘এমন পরিবেশ হৃদয় আকুল করা এমন আযান জীবনে আর একবার শুনেছিলাম মধ্য এশিয়ায় উজবেকিস্তানের একটা গ্রামে। এ মসজিদটি কোথায়, কতদূরে আবদুর রহমান?’

‘আমাদের বাড়ির সামনে মুসা ভাই। চলুন নামায আমরা ধরতে পারবো।’

আবদুর রহমান সপ্তমদের সুন্দর বিশাল বাড়িটির সামনে ছোট একটা চত্তর, তারপরেই মসজিদ। বিশাল মসজিদ। প্রথমে মসজিদটি ছিল বেড়ার। দরবেশ আবদুর রহমানের সময়েই জনগণ পাহাড় থেকে পাথর বয়ে এনে মসজিদ তৈরী করেছে। পরে আরও সম্প্রসারণ হয়েছে মসজিদটির।

মসজিদটি দেখে চমৎকৃত হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ইতিহাসে পড়েছিল, মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসায়ের পিরেনিজ পর্বতে উঠেছিলেন, কিন্তু ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। সেই সাথে ইসলামও এখানে থেকে পশ্চাতপসরণ করেছিল, ইতিহাস এটাই বলে। কিন্তু

ইতিহাস জানে না, পিরেনিজ এর বুকে এ রকম সুন্দর মসজিদ আছে, এ রকম সুন্দর সমৃদ্ধ মুসলিম জনপদ লুকিয়ে আছে। ইতিহাস শুধু রাজা-বাদশাহদের কথাই লিখে, লিখে না দরবেশ আবদুর রহমানদের কথা। লিখে না বলেই জানে না ইতিহাসের পরেও ইতিহাস আছে।

মাগরিবের জামায়াতের নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল আহমদ মুসাকেই।

নামায শেষে আবদুর রহমান সপ্তম শুধু নামটা গোপন রেখে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আহমদ মুসাকে। সকলের অনুরোধে ছোট-খাট বক্তৃতাও দিতে হয়েছিল আহমদ মুসাকে বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার উপর। উপসংহারে আহমদ মুসা একজন মহান ব্যক্তির কথা উদ্বৃত করে বলেছিল, 'ইসলাম জিন্দা হয় প্রত্যেক কারবালার পর। কয়েক শতাব্দীর এক ভয়াবহ কারবালা মুসলমানদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এবার তাদের উত্থানের পালা। এই জাগরণের গান শোনা যাচ্ছে চারদিকে। সামনের অন্ধকারের ওপারে সোবহে সাদেকের সফেদ আলোকছটা দেখা যাচ্ছে। মুক্তি আমাদের সুনিশ্চিত।'

নামায শেষে সকলের সাথে সালাম-মোহসাফা শেষ করে আহমদ মুসা আবুল হাসানের সাথে এল আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়িতে। আবদুর রহমান সপ্তম আগেই চলে এসেছিল তার মায়ের কাছে।

বাড়িতে ঢোকার পথে দরজার উপরে কাঠের ফলকে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা 'দারুল হিকমাহ'। তার নিচে আরবী অক্ষরে একই কথা লেখা আছে। আহমদ মুসা, জোয়ান সবাই এ লেখাটা পড়ল। বুঝল এটা বাড়ির নাম।

প্রবেশ করল বৈঠক খানায়।

বিরাট বৈঠকখানা।

ঘরের চারদিকে সাজানো সোফা। একসাথে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন লোক বসতে পারে।

আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়ি শুধু এই উপত্যকায় নয় গোটা এই অঞ্চলের মিলন ক্ষেত্র। যত শালিস-দরবার সব এখানেই হয়। উত্তরাধীকার সূত্রে আবদুর রহমান সপ্তম এই এলাকার সর্দার। তবে আবদুর রহমান বাসক গেরিলা

বাহিনীর দায়িত্বশীল পদে উন্নীত হবার পর তার ভাই আবুল হাসান তার পক্ষ থেকে সরদারীর দায়িত্ব পালন করে।

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করেই দেখল টেবিলে শরবত রাখা হচ্ছে। আঙুরের শরবত।

আবুল হাসান আহমদ মুসাদের শরবত পান করিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আহমদ মুসা ও জোয়ান যেখানে বসেছিল সেখান থেকে সোজা ওপাশের দেয়ালে হাতে আঁকা পাশা-পাশি দু'টি ছবি। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আর অন্যটি একটি বালকের।

ছবি দু'টি চোখে পড়ল জোয়ানের। ভাবল সে, নিশ্চয় বৃদ্ধের ছবিটি দরবেশ আবদুর রহমানের, আর বালকটি নিশ্চয় আবদুর রহমান সপ্তম হবে।

কৌতুহল হলো জোয়ানের। লোকটির চেহারার সাথে আবদুর রহমানের চেহারা মিলছেনা। আরও ভাল করে দেখার জন্যে জোয়ান উঠে গিয়ে ছবি দু'টির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পর ছবির নিচের লেখাগুলো জোয়ানের কাছে স্পষ্ট হলো।

প্রথমে চোখ পড়ল বৃদ্ধের ছবির নিচে লেখাগুলোর দিকে।

পড়ল জোয়ান -"নাম আব্দুর রাহমান। জন্ম পূর্ব স্পেনের ভালেন্সিয়ার ১৪৫৫সালে। ভালেন্সিয়ার দারুন হিকমার তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। বিজ্ঞানের উপর অনেক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। সব মুসলিমদের সাথে তাকেও উচ্ছেদ করা হয় ভালেন্সিয়া থেকে ১৫০৩ সালে। তিনি ইন্তেকাল করেন ১৫৩০ সালে। তিনি হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তার বেহেস্ত নসিব করুন"।

পড়তে পড়তে হৃদয়টা কেঁপে উঠল জোয়ানের। মনে পড়ল তার পূর্ব পুরুষ আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান খাতার কথা, খাতায় লেখা স্মৃতি কথার বিষয় গুলো। তার পূর্ব পুরুষ আবদুল্লাহর পিতার নামও তো ছিল আব্দুর রাহমান। তিনি দারুল হিকমার অধ্যক্ষ ছিলেন। ভালেন্সিয়া থেকে তিনিও উচ্ছেদ হয়েছিলেন। ঐ সময়েই।

কম্পিত হৃদয় নিয়ে জোয়ান গিয়ে দাঁড়াল বালকটির ছবির নিচে। বালকটির ছবির নিচে একটা কবিতা। চার লাইনের কবিতার সার কথা হলঃ "বালকটি দশ বছরের আবুদুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান। সেদিন ভালেন্সিয়ায় রাজা ফিলিপ্সের নিষ্ঠুর সৈন্যরা ক্রন্দনরত বালকটিকে কেড়ে নিয়েছিল ক্রন্দনরত মায়ের বুক থেকে, পিতার কাছ থেকে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া বালকটির নেগাহবান আর কেও ছিল না।"

পড়া শেষ করার আগেই জোয়ানের গোটা সত্তা জুড়ে নেমে এল দুর্বোধ্য এক অবসন্নতা। এই উপত্যকার নাম "নিউ ভালেন্সিয়া, এই বাড়ির নাম 'দারুল হিকমা' কেন তা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে হল এ নামগুলো, এই ছবিগুলো তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। আব্দুর রাহমান সপ্তম-এর অর্থ তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। সেই মহান আব্দুর রাহমানের সপ্তমের অধস্তন পুরুষ এই আব্দুর রাহমান।

মনে হল। এই "সপ্তম" শব্দটাও যেন তারই জন্য এক সংকেত। তার পূর্ব পুরুষ হতভাগ্য আবদুল্লাহ বছরের পর বছর দেশ-দেশান্তর ঘুরে যার দেখা পাননি, আমি আজ তার ঠিকানায়। আর চিন্তা করতে পারল না জোয়ান। সেই আচ্ছন্নতা গাড় অন্ধকার হয়ে ঘিরে ধরল তাকে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের উপর।

ছুটে গেল আহমদ মুসা।

কোলে তুলে নিল জোয়ানকে।

অজ্ঞান জোয়ানকে যখন সোফায় শুইয়ে দিচ্ছে আহমদ মুসা, আব্দুর রাহমান সপ্তম এবং আবুল হাসান তখন ঘরে ঢুকল। জোয়ানকে ঐভাবে দেখে তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

দ্রুত এগিয়ে এল তারা আহমদ মুসার কাছে।

"কি ব্যাপার, জোয়ানের কি হয়েছে মুসা ভাই?" জিজ্ঞাসা করল আব্দুর রাহমান সপ্তম।

জোয়ানকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাড়িয়ে আহমদ মুসা বলল, দেয়ালের ঐ ছবি দুটো দেখতে গেয়েছিল জোয়ান। ছবি দেখতে দেখতেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে জোয়ান। বলে আহমদ মুসা জোয়ানের একটি হাত তুলে নিল।

"ডাক্তার ডাকব মুসা ভাই"?

"না, দরকার নেই। এখনি ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।"

বলে আহমদ মুসা জোয়ানের জুতা খুলে ওর পায়ের তালুর বিশেষ কিছু জায়গায় বিশেষ নিয়মে খোঁচা দিতে লাগল।

"আব্দুর রাহমান, ঐ ছবি দুটো কার"? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

ছবি দুটির পরিচয় দিল আব্দুর রাহমান। তারপর বলল, "ছবি দুটো দেখেই কি জোয়ান....।

"তা বলতে পারব না আব্দুর রাহমান। তবে ছবি দেখার সময় তাকে স্বাভাবিক মনে হয় নি।

মিনিট তিনেক পার হল।

আহমদ মুসা জোয়ান এর পায়ে সেই খোঁচা দিয়েই চলেছিল।

নড়ে উঠল জোয়ান। ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। চোখ মেলেই তড়িঘড়ি উঠে বসল।

সামনেই দাড়িয়ে আব্দুর রাহমান সপ্তম। জোয়ান উঠে দাড়িয়ে "আমার ভাই" বলে জড়িয়ে ধরল আব্দুর রাহমানকে। বলল, "পিরেনিজের বুকে এইভাবে আমাদের দেখা হবে কে জানত"। আবেগে ভারি হয়ে উঠল জোয়ানের কণ্ঠ।

আব্দুর রাহমান সপ্তম কিছু বুঝতে না পেরে বিব্রত বোধ করছিল। আব্দুর রাহমানের ন'বছরের মেয়ে বৈঠক খানায় ঢুকেছিল সেও হ্যাঁ করে দেখছে ব্যাপারটা।

জোয়ান আব্দুর রাহমান সপ্তমকে ছেড়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, "মুসা ভাই আমার পূর্ব পুরুষ যা খুঁজে পায়নি, আমি তা পেয়েছি, এ বড় আনন্দের। কিন্তু এ আনন্দে হাসা যায় না, কান্না পায়।"

জোয়ান ভারি কণ্ঠে যখন এ কথা গুলো বলছিল, অশ্রু ঝরছিল তখন জোয়ানের চোখ দিয়ে।

আব্দুর রাহমান এগিয়ে এসে জোয়ানের পিঠ হাতে রেখে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা ভাই, খুলে বলুন।

জোয়ান ঘুরে দাঁড়াল। অশ্রুতে ভেজা জোয়ানের চোখ।

কোন কথা না বলে জোয়ান আব্দুর রাহমান সপ্তমের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বৃদ্ধের ছবির কাছে। বলল, "ভালেন্সিয়ার দারুল হিকমার অধ্যক্ষ এই আব্দুর রাহমান কে আপনার?"

"আমার পূর্ব পুরুষ, নিউ ভালেন্সিয়ার এই উপত্যকায় তিনি এসে বসতি স্থাপন করেন,"। বলল আব্দুর রাহমান।

জোয়ান গিয়ে দাঁড়াল বালকের ছবির নিচে। বলল, আর এ হতভাগ্য বালক হল আমার পূর্ব পুরুষ যাকে ফিলিপের সৈন্যরা ছিনিয়ে এনেছিল পিতা-মাতার বুক থেকে, যাকে মর্মন্তুদ এক দাস জীবনযাপন করতে হয়েছে খ্রিষ্টান পরিবারে।

"জোয়ান" বলে চিৎকার করে আব্দুর রাহমান সপ্তম জড়িয়ে ধরল জোয়ানকে। এবার আব্দুর রাহমান সপ্তমের চোখ ফেটে বেরিয়ে এসেছে অশ্রু।

পাশে মূর্তির মত দাড়িয়ে আছে আবুল হাসান।

আব্দুর রাহমান জোয়ানকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল ভিতরে। আবুল হাসানও। সেই ন'বছরের মেয়েটিও।

জোয়ান ফিরে এল সোফায়।

বসল আহমদ মুসার পাশে।

আহমদ মুসাও এই মিলন দৃশ্যে অনেকটা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমবারের মত মুখ খুলে বলল, এই মিলন আমার কাছে রূপ কথার চেয়েও অপরূপ লাগছে জোয়ান। স্পেনে মুসলমানদের বিপর্যয় বিচ্ছিন্ন একটি বংশের দুটি ধারার শত শত বছর পর এই মিলন অকল্পনীয়। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া।"

কিছুক্ষণ পরে বৈঠকে খানায় ফিরে এল আব্দুর রাহমান সপ্তম। বলল, না বলেই চলে গিয়েছিলাম, মাফ করবেন মুসা ভাই। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম হারানো মানিকের সন্ধান পেয়ে। আমরা কল্পনাও করতে পারি না মুসা ভাই,

আমার পূর্ব পুরুষ দরবেশ আব্দুর রাহমান খ্রিস্টান এর ছদ্মবেশ নিয়ে ভালেন্সিয়ায় কত দিন কত রাত যে খুঁজে বেড়িয়েছে তার হৃদয়ের ধন ঐ বালককে! সন্ধান তিনি পাননি, সেই পাওয়া আজ আমরা পেলাম।

আব্দুর রাহমান সপ্তম চোখ মুছল। বলল, চলুন মুসা ভাই, চল জোয়ান, খাবার রেডি। আম্মা এবং পরিবারের সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে জোয়ানের কথা শোনার জন্য, কিন্তু তার আগে খাওয়া।

খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল পারিবারিক ডাইনিং রুমে। খাওয়া শেষে আহমদ মুসা ও জোয়ানকে এনে বসানো হল পারিবারিক ড্রইং রুমে। ড্রয়িং রুমের পাশেই একটা ঘরে বসেছে আব্দুর রাহমান সপ্তমের পরিবারের মেয়েরা।

ড্রয়িং রুমে আহমদ মুসা ছাড়াও রয়েছে আব্দুর রাহমান সপ্তমের ন'বছরের মেয়ে ৫ বছরের একটি ছেলে, আবুল হাসান এবং তারও পাঁচ বছরের একটি ছেলে, আব্দুর রাহমান সপ্তম ভিতরে ছিল।

অল্পক্ষণ পর সে ড্রয়িং রুমে এসে প্রবেশ করল। বলল, আমার আম্মা, আমার স্ত্রী ও আবুল হাসানের স্ত্রী এবং আমাদের দুই বোন আহমদ মুসা ভাই ও জোয়ানকে সালাম দিয়েছেন।

সালাম বিনিময় পর আব্দুর রাহমান সপ্তম বলল, আল্লাহর হাজার শুকরিয়া যে শত শত বছরের বিচ্ছিন্নতার পর আমাদের বংশের দুটি ধারার আল্লাহ মিলন ঘটিয়েছেন। আমাদের পরিচয় হয়েছে, জানাজানি হয়নি। আমাদের সবার মন আকুল বিকুল করেছে এই জানার জন্য, আমি ভাই জোয়ানকে অনুরোধ করছি, কিছু কথা বলার জন্য। পরিবারের সবাই এ কথাগুলো শুনতে চায় এ জন্য এই ব্যবস্থা।

জোয়ান শুরু করল-আমার নাম জোয়ান ফারদিনান্দ। এই নামেই আমি বড় হয়েছি, এই নামই আমার পরিবারে, এই নামেই আমার লেখাপড়া, পরিচয়, সবকিছু। আমার পিতার নাম জন সেমেনিজ। বাড়ির কেও কোনদিন গীর্জায় যায়নি, আমাদের বাড়িতে বাইবেল নেই, কিন্তু আমরা খ্রিষ্টান ছিলাম। নিজেকে আমি খ্রিস্টান মনে করতাম। আমি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাল ছাত্রদের একজন ছিলাম। সব পরীক্ষায় সব সময় প্রথম স্থানে থেকেছি। আমার জীবনের

মোড় পরিবর্তন ঘটল আমার অনার্স পরীক্ষার রেজাল্টের দিন। প্রথমবারের মত প্রথম স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেলাম। সেই দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে শুনলাম আমি মরিসকো, আমি ছদ্মবেশী মুসলমান। আমার এ পরিচয়ের কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়েছিলাম, পরিচয়টা আমার কাছে আমার জন্যে মৃত্যুর পরোয়ানার মত ছিল। আমি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলাম। পাগলের মত ছুটে এসেছিলাম বাড়িতে। আব্বা মারা গেছেন অনেক আগে। চাইছিলাম, আম্মা বলুন আমি মরিসকো নই, আমি ছদ্মবেশী মুসলমান নই, আমি খৃস্টান। না হলে যে আমার ২২ বছরের সাজানো জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু আম্মার কাছে, দাদির কাছে যা শুনলাম তা আমার উদ্বেগ-আতংককে আরও বাড়িয়ে দিল। তাঁরা বললেন, তাঁরা দু'জন মরিসকো, কিন্তু আমার আব্বা, আমার দাদা মরিসকো ছিলেন কিনা তা তারা জানেন না। আমার তখন মনে হলো আমার আব্বা, আমার দাদা নিশ্চয় মরিসকো ছিলেন। না হলে তারা মরিসকোকে বিয়ে করেছেন কেন। আমার ঘরে ফিরে আমি ভীষণভাবে কাঁদলাম। দুপুরে কিছু খেলাম না। গোটা দুনিয়া আমার কাছে বিষাদ হয়ে গেল। মনে হলো, আমার মরা আর বাঁচার মধ্যে আজ আর কোন পার্থক্য নেই। বিকেলে মা এলেন আমার ঘরে। তিনিও কাঁদছিলেন। তিনি আমার হাতে একটা কাঠের বাক্স তুলে দিয়ে বললেন, বেটা, এই বাক্স তোমার আব্বা তাঁর মৃত্যুকালে আমার কাছে আমানত রেখে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, যেদিন তোমার বয়স বাইশ বছর পূর্ণ হবে, সেদিন যেন এই বাক্স তোমার হাতে তুলে দেই। বাক্সে কি আছে আমি জানি না।

বাক্স আমার হাতে তুলে দিয়ে আম্মা চলে গিয়েছিলেন। আমি পাগলের মত বাক্স খুলে ফেলেছিলাম। পেয়েছিলাম আমার কাছে লেখা আব্বার একটা চিঠি এবং একটি খাতা। চিঠির খামে লেখা ছিল 'মুসা আবদুল্লাহ ওরফে জোয়ান ফার্ডিনান্ড'। এই প্রথম জানলাম আমি জোয়ান ফার্ডিনান্ড নই, আমি মুসা আবদুল্লাহ। আব্বার চিঠি পড়লাম। মূল কথাটা যা তিনি লিখেছেন, তা হলো- এই চিঠির সাথে চামড়া বাঁধানো যে খাতা পাবে, তা আমি পেয়েছিলাম এমনি বাক্সে করে আমার আব্বার কাছ থেকে। আমার আব্বা পেয়েছিলেন তার আব্বার কাছ

থেকে। ছয় পুরুষ ধরে এই বাক্স এমনিভাবে আসছে। সপ্তম পুরুষ হিসেবে তোমার জন্যে বংশের এই পবিত্র আমানত আমি রেখে গেলাম।'

বংশের পবিত্র আমানত খাতা খানি আমি পড়লাম। ওটা ছিল আপনাদের বৈঠক খানায় যার ছবি টাঙানো আছে সেই বালক আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের আত্মকথা।'

জোয়ান সেই আত্মকথা ধীরে ধীরে বর্ণনা করলো। কেমন করে তাকে পিতা-মাতার কোল থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল, কি করে খৃস্টান শহর কোতোয়ালের বাড়িতে তার দাসজীবন শুরু হয়েছিল, কি মর্মন্তুদ নির্যাতন সেই বালকের উপর নেমে এসেছিল, কি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠল, কি করে অবশেষে মুক্তি পেল, কি করে খৃস্টানের ছদ্মবেশে তার জীবন শুরু হলো, কেন তাকে শেষে পালিয়ে আসতে হলো মাদ্রিদে, কিভাবে শুরু হলো মাদ্রিদে তার ছদ্মবেশী খৃস্টান জীবন- সব কথাই জোয়ান একে একে বর্ণনা করল। বলতে বলতে বারবার কান্নায় জড়িয়ে গিয়েছিল জোয়ানের কথা। আবদুর রহমান সপ্তম, আবুল হাসান দু'জনেই কেঁদে ফেলেছিল শুনতে শুনতে। আহমদ মুসারও চোখ শুকনা ছিল না। সে আগে শুনেছিল, কিন্তু এতটা শুনেনি।

জোয়ান থামার পর অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না।

আবদুর রহমান সপ্তমের ৫ বছরের ছেলেটি ভেতর থেকে এসে তার আব্বার কানে কানে বলল, দাদি কাঁদছে।

আবদুর রহমান সপ্তম তার মুখ চাপা দিয়ে বলল, বেটা, তুমি যাও দাদির কাছে। তাঁর কোলে গিয়ে বস।

চলে গেল ছেলেটি।

আবদুর রহমান সপ্তম ধীরে ধীরে বলল, আল্লাহর হাজার শোকর, পূর্ব পুরুষরা এ কথাগুলো রেখে না গেলে অতীত শুধু আমাদের হারিয়ে যেত না, হারাতাম আমরা ভবিষ্যতও।

'ঠিক বলেছেন ভাই জান, পূর্ব পুরুষ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের স্মৃতি কথা পড়ার পর আমি আমার অতীতকে নিয়ে গর্ব করতে শিখেছি, নিজের

পরিচয়কে ভালবাসতে শিখেছি এবং জাতির প্রতিও ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে।' বলল জোয়ান।

'আমাদের পূর্ব পুরুষ দরবেশ আবদুর রহমান কোন স্মৃতি কথা রেখে যাননি। রেখে গেছেন একটা ডাইরী। সেটা ঘটনার একটা দিনপঞ্জী। জাহাজ যোগে যাত্রা শুরুর পর কিভাবে ভূমধ্যসাগরের মেজর্কাদ্বীপে পৌঁছলেন, কি করে জাহাজ লুন্ঠিত হলো, কিভাবে তারা ফ্রান্সের ভেনড্রেস বন্দরে পৌঁছলেন, কিভাবে সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হলো পিরেনিজের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে, কিভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে, গাছের ফল-মূল খেয়ে বেঁচে থেকে অবশেষে একদিন এই উপত্যকায় পৌঁছলেন। প্রতিদিনের ঘটনাই সে ডাইরীতে লিখিত আছে। সে এক হৃদয় বিদারক উপন্যাস। ডাইরীটার আমরা কপি করিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি। একটা কপি ভাই জোয়ান তোমাকে দেব।'

থামল আবদুর রহমান সপ্তম।

জোয়ান বলল, 'খুব খুশি হবো। আমার পূর্ব পুরুষ আবদুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহর স্মৃতি কথায় পড়েছি, তিনি তাঁর পিতার সন্ধানে মেজর্কা গেছেন, পিরেনিজের উত্তর পাদদেশেও ঘুরে বেরিয়েছেন দিনের পর দিন। সন্ধান পাননি তার পিতার। আমি খুশী হবো জানতে পারলে সেই কাহিনী, যা আমার পূর্ব পুরুষ জানতে পারেননি।'

'জোয়ান ভাই, দরবেশ আবদুর রহমানও তার সন্তানকে খুঁজতে গেছেন ভ্যালেনসিয়া পর্যন্ত। একবার নয়, কয়েকবার। কিন্তু পাননি সন্ধান। সে সব কথাও তাঁর ডাইরীতে আছে।' বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

গভীর রাত পর্যন্ত চলল তাদের কথাবার্তা। ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেদিকে কারও খেয়াল ছিল না।

অবশেষে আবদুর রহমান সপ্তমের অসুস্থ মা ওপার থেকে বলেছিল, বেটা আবদুর রহমান, দীর্ঘ পথ তোমরা সফর করে এসেছ। সবাই তোমরা ক্লান্ত। মেহমানদের আর কষ্ট দিও না। ওঁদের শুইয়ে দাও। কালকে কথা বলা যাবে।

রাতে শোবার সময় আহমদ মুসা আবদুর রহমানকে বলল, আবদুর রহমান সপ্তম এবং আবদুল্লাহ সপ্তম, দুই সপ্তমে কাটাকাটি করলে দুই সপ্তমও শেষ হয়। সুতরাং আর সপ্তমের দরকার নেই। যে কারণে গুণাগুণি সেই প্রয়োজন শেষ।

'ঠিকই বলেছেন মুসা ভাই, আর প্রয়োজন নেই।' বলল আবদুর রহমান।

আহমদ মুসাদের শুইয়ে দিয়ে আবদুর রহমান চলে যাচ্ছিল। তাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'আব্দুর রহমান আমরা সকালেই কিন্তু চলে যাব, কিছুতেই দেরী করা যাবে না।'

আবদুর রহমান মাথা নেড়ে চলে গেল।

পরদিন সকাল ৮টা।

আহমদ মুসা এসে গাড়িতে উঠেছে। জোয়ান তখনও আসেনি। বিদায় নিতে গেছে আবদুর রহমানের মা'র কাছে। সকালেই আরেক দফা কথা হয়েছে জোয়ানের সাথে আবদুর রহমানের মা'র। ফজরের নামাযের পর আবদুর রহমান জোয়ানকে নিয়ে গিয়েছিল অন্দর মহলে বাড়ি-ঘর এবং অন্যান্য সব স্মৃতি চিহ্ন দেখাবার জন্যে। জোয়ান ঘুরে ঘুরে গোটা বাড়ি দেখেছে।

আবদুর রহমানের মা জোয়ানকে বলেছে, জোয়ান বেটা, দরবেশ আবদুর রহমানের সম্পত্তির তুমিও অংশীদার। এ বাড়িতে তোমারও ভাগ আছে। আজ থেকে তুমিও এ বাড়ির একজন!

শুনে কেঁদে ফেলেছে জোয়ান। বলেছে, মা, আপনাদের পেয়েছি এর চেয়ে বড় সম্পত্তি আর নেই। তবু আবদুর রহমানের মা কথা আদায় করেছে যে, সে তার মা'র দেয়া প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে না।

সোয়া আটটার দিকে ফিরে এল জোয়ান ও আবদুর রহমান। জোয়ানের মুখ ভারি, চোখ ভেজা।

পেছনে বাড়ির দরজায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় দেয়ার জন্যে।

গাড়িতে চড়ল জোয়ান ও আবদুর রহমান।

আহমদ মুসা আগেই ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেছিল।

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল গাড়ি। জোয়ান ও আবদুর রহমান দু'জনেই পেছন ফিরে দেখল বিদায় দিতে আসা আপনজনদের। বাড়ির মেয়ে ও

শিশু-কিশোর হাত নেড়ে বিদায় জানাল তাদের। আহমদ মুসা তার গাড়ির রিয়ার ভিউ-এ দেখতে পেল দৃশ্যটা। তার মনের কোথায় যেন খচ করে উঠল। মনে হল, এমন একটা গৃহস্থান তার নেই, যেখানে মা, বোনেরা একান্ত আপনজনরা তার পথ চাইবার জন্যে দাঁড়াতে পারে! আহমদ মুসার চোখে ভেসে উঠল সিংকিয়াং-এর এক গ্রামের দৃশ্য, সেই গ্রামের একটি সুন্দর বাড়ির ছবি, যা তার বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের কলরোলে একদিন মুখরিত ছিল। কিন্তু সব হারিয়েছে, তার চোখের সামনেই তারা নিহত হয়েছে একের পর এক। আজ সে নিঃস্ব, ঠিকানাহীন! তাকে বুকে ধারণ করার জন্যে এমন কোন বাড়ি অবশিষ্ট নেই, এমন কোন আপনজন তার নেই। অজান্তেই চোখের কোণটা তার ভিজে উঠল। মনে পড়ল আমিনার কথা। তার মত সেও এক হতভাগী। কত কষ্ট পাচ্ছে কে জানে।

আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। ঢিলে হয়ে গিয়েছিল হাতের স্টিয়ারিং হুইল। গাড়িটা বেঁকে গিয়ে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল একটা গাছের সাথে। শেষ মুহূর্তে আহমদ মুসা গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রনে আনতে পেরেছে।

গাড়ির এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হলো জোয়ান। বিস্মিত হয়ে সে তাকালো আবদুর রহমানের দিকে। দেখল তারও চোখে বিস্ময়। বিস্মিত হবারই কথা। আহমদ মুসা অকল্পনীয় ধরনের সুনিপুণ ও সুদক্ষ ড্রাইভারই শুধু নন, গাড়ি চালনা যে চমৎকার একটা আর্ট সেটা আহমদ মুসার হাতেই তারা দেখেছে।

আহমদ মুসা গাড়িটা ঠিক লাইনে ফিরিয়ে এনে দাঁড় করাল। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বলল, ‘আবদুর রহমান তুমি এস ড্রাইভিং সিটে।

জোয়ানের বিস্ময় উদ্বেগে পরিনত হলো। বলল, ‘মুসা ভাই শরীর খারাপ করছে না তো আপনার?’

‘না জোয়ান, এমনি একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম।’ মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

মুখে হাসি টানলেও জোয়ান ও আবদুর রহমান আহমদ মুসার চোখের কোণে জমে উঠা সেই অশ্রু বিন্দুটা দেখতে পেল।

আবদুর রহমান পেছনের সিট থেকে নেমে ড্রাইভিং সিটের দিকে এগুলো।

‘কিন্তু মুসা ভাই, এমন আনমনা হতে কোনদিন আপনাকে দেখিনি। আপনার চোখে আবার অশ্রুও দেখেছি।’ বলল জোয়ান।

‘ও কিছু নয় জোয়ান, হঠাৎ চীনের সিংকিয়াং-এ আমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামের কথা মনে পড়েছিল, মনে পড়েছিল আমার ছোট বাড়িটার কথা, মনে পড়েছিল হারিয়ে যাওয়া আব্বা, আম্মা, ভাই-বোনের কথা।’

‘মুসা ভাই, আপনিও এমন করে এসব ভাবেন? ভেবে এইভাবে আনমনা হন, কাঁদেনও?’

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসেছিল। চলতে শুরু করেছিল গাড়ি আবার।

‘কেন জোয়ান, একজন বাপের, একজন মায়ের আদরের সন্তান কি আমি নই? একজন ভাই, একজন বোনের স্নেহময় ভাই কি আমি না? তারা আজ কেউ নেই, স্মৃতি তো আছে।’ সামনে দূর দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে বড় নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা। আবার আনমনা হয়ে পড়ল সে।

জোয়ান পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। কথা বলতে আর সাহস করল না জোয়ান। মনে হচ্ছে আহমদ মুসা পাশে থেকেও যেন নেই। বাল্য কিংবা কৈশোরের কোন স্মৃতি সে হাতড়ে ফিরছে কে জানে! জোয়ানের কাছে বিপ্লবী নেতা আহমদ মূসার এ এক নতুন রূপ।

কথা বলে আহমদ মুসার এ ধ্যান-মগ্নতা ভাঙতে চাইলো না জোয়ান। বিস্ময়ের সাথে ভাবল শুধু, আহমদ মুসার সংগ্রামী জীবনের আড়ালে তার একান্ত ব্যক্তিগত একটা জীবন আছে যেখানে সে বড় দুর্বল, বড় একা। সেখানে তাকে পীড়া দেবার মত আছে অনেক অশ্রু, অনেক কান্না।

পাহাড়িয়া পথে এঁকে-বেঁকে চলছিল তখন গাড়ি। আবদুর রহমানের শক্ত হাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইল।

প্রথমে তারা পার্বত্য শহর ভেল্লায় ফিরে যাচ্ছে। সেখান থেকে তাদের যাত্রা শুরু হবে মাদ্রিদের দিকে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আহমদ মুসা মাদ্রিদ পৌছতে চায়।

৫

মাদ্রিদে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টার।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের প্রধান বুটাগুয়েনা ভাসকুয়েজ বিরাট কক্ষের বিশাল টেবিলে বসে আছে। তার সামনে টেবিলে একটা মেসেজ। ফ্যাক্সে এসেছে অল্প আগে। এসেছে ইটালীর ট্রিয়েস্ট থেকে।

এয়ার কন্ডিশন ঘরেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে ভাসকুয়েজের। মনের ভেতরের অবস্থা তার আরও খারাপ। ক্রুদ্ধ অন্তর থেকে তার রক্ত ঝরছে যেন। গোটা দেহের রক্ত তার টগবগ করে ফুটছে। এতবড় পরাজয়, এতবড় বিপর্যয়ের কথা ভাবতে পারেনি ট্রিয়েস্টে। রাত আটটায় সে খবর পেল, জোয়ান যে স্যাম্পল নিয়ে গিয়েছিল তেজষ্ক্রিয় পরীক্ষার জন্যে সে স্যাম্পলসহ তেজষ্ক্রিয় রিপোর্ট এবং কম্পিউটার ডিস্ক ইরগুন জাই লিউমির হাতে এসেছে। সে স্যাম্পল, তেজষ্ক্রিয় রিপোর্ট এবং কম্পিউটার ডিস্কসহ মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসফরে যাওয়া দলটিকে রাত ১২টা প্লেনে মাদ্রিদে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভীষণ খুশী হয়েছিল ভাসকুয়েজ আহমদ মুসার পরিকল্পনা ভন্ডুল করতে পেরে। এক ট্রিয়েস্টেই এই পরীক্ষা আহমদ মুসা করতে পারতো, কিন্তু সেটার হলো গুড়ে বালি। ট্রিয়েস্টে আর পারবে না তারা এই পরীক্ষার জন্যে যেতে। আর ইউরোপ আমেরিকার কোন গবেষণাগারে তো আহমদ মুসা কিংবা হিদেন(মুসলমান) তো ঢুকতেই পারবে না। সুতরাং বুঝতেই পারবে না, স্পেনের বাদশাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্সসহ স্পেনের ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপনা কোন মহাধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব খুশীর চিন্তা বুকে নিয়েই ভাসকুয়েজ রাতে ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু সকালে ৮টায় অফিসে এসেই এই ফ্যাক্স মেসেজ পেল ট্রিয়েস্ট থেকে। ভয়ানক দুঃসংবাদ।

ট্রিয়েস্ট থেকে ইরগুন জাই লিউমি লিখেছে, 'গত রাত ১২টার দিকে সি-কুইন মোটেলের সামনে ইরগুন জাই লিউমি'র একজন গেরিলাকে হত্যা করে

শিক্ষাসফর দলের নেতা মিঃ ভিলারোয়াকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে সেই স্যাম্পল, তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট, ডিস্ক সব কেড়ে নিয়েছে একজন লোক। এর কিছুক্ষন আগে দাউদ ইমরানের বাড়িতে আমাদের দ'জন মূল্যবান লোক খুন হয়েছে। এছাড়া রেস্ট হাউজে জোয়ানের ঘরের সামনে আরো দু'জন এবং গবেষণা কেন্দ্রের ফটকে অন্য আরো চারজন লোক আমাদের নিহত হয়েছে। ইরগুন জাই লিউমি'র মূল্যবান বিজ্ঞানী দাউদ ইসরানের পোড়া দেহ পাওয়া গেছে তার নিজ গাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে। মোট আমাদের দশজন খুন হয়েছে আপনার কাজে। এর জন্যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরও এক মিলিয়ন ডলার আমরা চাই।'

ইরগুন জাই লিউমি'র এই মেসেজ পড়েই এয়ার কন্ডিশন ঘরে ঘামছে ভাসকুয়েজ। কাজের কাজ কিছুই হলো না। এক মিলিয়ন ডলার যাবার পথে।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান ট্রিয়েস্টের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র আই সি টি পি থেকে জোয়ানের নিয়ে যাওয়া স্যাম্পলটি, এর তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং ডিস্ক চুরি করার দায়িত্ব দিয়েছিল ইরগুন জাই লিউমিকে। বিনিময় হিসেবে অগ্রিম দিয়েছিল এক মিলিয়ন ডলার। আরও কথা দিয়েছিল প্রতিটি লোকের ক্ষতির জন্যে দেবে এক লাখ ডলার।

মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জোয়ান পুরাতন কিছূ ইট খন্ড ও কংক্রিট খন্ডাংশের তেজস্ক্রিয় পরীক্ষার জন্যে এসেছে ট্রিয়েস্টে-একথা ইরগুন জাই লিউমিই জানিয়েছিল ভাসকুয়েজকে। ভাসকুয়েজের ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান যে স্পেনের মুসলিম স্থাপনাগুলো ধ্বংসের জন্যে তেজস্ক্রিয় প্রয়োগ করেছে, এখবর ইরগুন জাই লিউমি রুশ গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে জানতে পারে। ইরগুন জাই লিউমি'র এজেন্ট আই সি টি পি'র বিজ্ঞানী দাউদ ইমরান পুরোনো ইটের ভাঙা টুকরার বয়স পরীক্ষা করেই ধরে নেয় ওগুলো কর্ডোভা বা গ্রানাডার মুসলিম স্থাপত্য থেকে আনা। যেহেতু সে জানে, তার কাছে সব বিষয় পরিস্কার হয়ে যায়। সংগে সংগেই সে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিষয়টি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে জানাবার ব্যবস্থা করে।

ভীষণ ক্রোধ ও দুঃখের সাথে বিস্ময়ও বোধ হচ্ছিল ভাসকুয়েজের। ইরগুন জাই লিউমি'র ১০জন গেরিলা এজেন্টকে খুন করল কে? জোয়ান সম্পর্কে আমরা জানি যে, সে জীবনে কোনদিন পিস্তল ধরেনি। সে নিরেট একজন

একাডেমিশিয়ান। তার কাছ থেকে এ ধরনের কাজ আশা করা যায় না। তাহলে এই হত্যাকান্ড চালাল কে? আহমদ মুসা কি!

এই সময় ইন্টারকম কথা বলে উঠল। বলল, ট্রিয়েস্ট থেকে ফিরে আসা শিক্ষা সফরকারী দলের সহকারী নেতা অধ্যাপক জোস এসেছেন।

'পাঠিয়ে দাও।' দ্রুত বলল ভাসকুয়েজ।

মিনিট খানেকের মধ্যেই মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোককে নিয়ে ভাসকুয়েজের সেক্রেটারী প্রবেশ করল।

ভদ্রলোক বসলে বেরিয়ে গেল ভাসকুয়েজের পি, এস।

কথা বলল ভাসকুয়েজ প্রথম। বলল, 'ক'টার প্লেনে উঠেন ট্রিয়েস্ট থেকে?'

'রাত বারটায়।'

'তাহলে ১২টার আগের সব খবর আপনি রাখেন।'

'সব জানি না, কিছু শুনেছি মাত্র। বিজ্ঞানী দাউদ ইমরানের বাড়িতে তার দু'জন লোক খুন হয়েছে।'

'আর কিছু?'

'জানি না।'

'কি জন্যে এসেছেন, কি বলতে চান, বলুন।'

'অধ্যাপক ভিলারোয়া আপনাকে বলতে বলেছেন, আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্যে বিজ্ঞানী দাউদ ইমরান কিছু কাগজ ও জিনিসপত্র দিয়েছিলেন, সেগুলো একজন লোক ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে কিডন্যাপ করে। যে তাঁকে কিডন্যাপ করেছিল, সেই লোকটিই মটেল সি-কুইনের গাড়ি বারান্দায় একজন লোককে খুন করে। খুন করার পরেই অধ্যাপক ভিলারোয়াকে কেডন্যাপ করা হয়।'

'আপনি তখন সেখানে ছিলেন?'

'ছিলাম।'

'আর কে ছিল?'

'হোটেলের কয়েকজন সহ আসরা সাত আটজন ছিলাম।'

'একজন লোক এসে একজনকে খুন করল, আর একজনকে কিডন্যাপ করল, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কাজটা করেছিলেন?'

'কি ঘটল, কি ঘটছে তা আমরা বুঝে উঠার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে তাছাড়া লোকটি সশস্ত্র, ভয়ানক ক্ষিপ্র। আমরা ছিলাম খালি হাতে'

'আপনি খুনি লোকটাকে দেখেছেন ?'

'দেখেছি'

'কি রকম সে দেখতে ?'

'গায়ের রং সাদাটে স্বর্ণাভ। কালো চুল। চেহারায় এশীয়।'

একটু ভাবল ভাসকুয়েজ। তারপর পাশের ফাইল কেবিনেট থেকে একটা ফটো বের করে অধ্যাপক জোসের সামনে তুলে ধরল। বলুন তো, 'এই লোক কি না।'

অধ্যাপক জোস খুশী হয়ে উঠল। বলল, ঠিক এই লোক। এখানে জ্যাকেট গায়ে, আর সেখানে স্যুট পরে।'

চোখ দু'টি জ্বলে উঠল ভাসকুয়েজের। মুখের মাংস পেশীগুলো যেন শক্ত হয়ে উঠল তার।

'ধন্যবাদ অধ্যাপক, আমার কথা শেষ। ' কষ্ট করে যেন কথা কয়টি উচ্চারন করল ভাসকুয়েজ।

অধ্যাপক জোস বেরিয়ে যেতেই ভাসকুয়েজ প্রচন্ড এক মুষ্টাঘাত করল টেবিলে। মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'বিষ্ট আহমদ মুসা! তুমিই তাহলে গিয়েছিলে ট্রিয়েস্টে।'

বলেই ইন্টারকমে পি,এস, কে নির্দেশ দিল, 'জুবি জারিটাকে আসতে বল, এখুনি।'

জুবি জারিটা স্প্যানিশ ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নতুন অপারেশন চীফ। অপারেশন চীফ সিনাত্রা সেন্ডো নিহত হবার পর জুবি জারিটা এই দায়িত্বে এসেছে। মাদ্রিদের বাদশাহ ফয়সাল কমপেক্সে আহমদ মুসাদেরকে ধরার জন্যে যে অভিযান করেছিল, সেই অভিযানে সিনাত্রা সেন্ডো নিহত হয়। সিনাত্রা সেন্ডো

তার চারজন সাথীকে নিয়ে যে গাড়িতে ছিলো, সেই গাড়িটিই আহমদ মুসার বোমায় বিস্ফোরিত হয় এবং সংগীদের সমেত নিহত হয়।

মিনিট দেড়েকের মধ্যেই জুবি জাড়িটা দরজায় এসে দাঁড়াল এবং প্রবেশ অনুমতি চাইল।

অনুমতি নিয়ে দরজা ঠেলে জুবি জাড়িটা প্রবেশ করল ঘরে।

সারে পাঁচ ফিটের প্রমান সাইজের মানুষ জুবি জাড়িটা। সামরিক বাহিনীর কর্নেল ছিলেন। চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে চরম বর্নবাদী মানসিকতার জন্যে। ন্যাটো বাহিনীতে এক মহড়া কালে একজন আমেরিকান মুসলিম নিগ্রো অফিসারের সাথে অন্যায়ভাবে মারপিট করার কারনে তাকে বরখাস্ত করা হয়। ক্লু-ক্ল্যাঙ-ক্ল্যান তাকে লূফে নিয়েছে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে সে অপারেশন চীফের আসন লাভ করেছে। ভাসকুয়েজ খুবই আদর করে তাকে, তার এক রোখা ও আপষহীন আচরনের জন্যে।

উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিল ভাসকুয়েজ। জুবি জারিটা ঘরে ঢুকতেই ভাসকুয়েজ ফিরে এল তার চেয়ারে।

চেয়ারে বসে দাঁড়ানো জুবি জাড়িটাকে বসতে বলল। জুবি জাড়িটা মেরুদন্ড খাড়া রেখে এ্যটেনশনের কায়দায় চেয়ারে বসল।

'জানো কিছু খবর?' নিরস কন্ঠে বলল ভাসকুয়েজ।

'কোন খবর স্যার?'

'এক মিলিয়ন ডলার গেছে, আরেক মিলিয়ন ডলার যাবার পথে।'

জুবি জাড়িটা কোন প্রশ্ন না করে উদ্বেগের সাথে তার প্রশ্ন বোধক দৃষ্টি তুলে ধরল।

ভাসকুয়েজই আবার মুখ খুলল। বলল, শয়তান জোয়ানই জয়ী হয়েছে। সেই স্যাম্পুল, তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং কম্পিউটার ডিস্ক যা হাত করা হয়েছিল আই সি টি পি' থেকে, তা ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে, তার সাথে ইরগুন জাই লিউমি'র দশ জন লোক খুন হয়েছে। এক মিলিয়ন ডলার পানিতে গেল। দশজন লোকের ক্ষতিপুরণ আরও ১ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে।'

'ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে? ইরগুনের দশজন লোক খুন হয়েছে?'

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল জুবি জাড়িটা।

‘এই সর্বনাশ করেছে কে বলতে পার?’

‘জোয়ান তো অবশ্যই নয়, গবেষণা কেন্দ্রের কেউ হতে পারে বলে আমি মনে করি না।’

‘তাহলে?’

‘এতবড় কাজ এমন নিখুঁত ভাবে একজনেই করতে পারে, সে হলো আহমদ মুসা।’

‘ধরতে পেরেছ তাহলে। লজ্জা বোধ হচ্ছে না একজনের কাছে বার বার এভাবে হারতে।’

জুবি জাড়িটার মুখে যেন এক পোচ কালি কেউ মাখিয়ে দিল।

একটা ঢোক গিলে জুবি জাড়িটা বলল, ‘কি করতে হবে স্যার, আদেশ করুন।’

‘কি আদেশ করবো, কি করতে হবে তা শোনার জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি। ‘

‘স্যার আমি ট্রিয়েস্টে যেতে পারি। ওখানে নিশ্চয় আহমদ মুসার সাঙাত আছে, ওদের খুঁজে বের করে আহমদ মুসার কাছে পৌঁছার পথ করতে পারি।’

‘গর্দভ, আহমদ মুসার সাঙাত খোঁজার জন্যে ট্রিয়েস্ট যাবে, এখানে মাদ্রিদে আহমদ মুসার সাঙাত নেই?’

‘স্যার জোয়ানের পরিবারের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি অনেক চেষ্টা করেও। ওরা তাদের নিজের বাসায় থাকে না।’

‘আর কোন সাঙাত বুঝি আহমদ মুসার নেই?’ জানো, বাসক গেরিলা নেতা ফিলিপের বোনকে বাঁচিয়ে আহমদ মুসা এখন বাস্কদের কাছে জামাই আদর পাচ্ছে ?’

‘জি স্যার, আমি বাস্কদের পরিচিত ঘাটিগুলোর দিকে নজর রেখেছি। তবে, ফিলিপ ও ফিলিপের বোন মাদ্রিদে এলে এক ভাড়া বাড়িতে থাকে, সেই বাড়িটার সন্ধান এখনও আমরা করতে পারিনি।’

জুবি জাড়িটা একটু থেমেই আবার মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, ‘স্যার একটা কথা বলব।’

‘কি কথা ?’

‘ফ্রান্সিসকো জেমেনিজ সিসনারোসার মেয়ে জেন ক্যাথারিনার গতিবিধি সন্দেহজনক। তাকে শিক্ষা সফরে পাঠানো ঠিক হয়নি, বিশেষ করে জোয়ান যেহেতু সেখানে গিয়েছিল।’

‘তোমার সন্দেহ অমূলক গর্দভ। জেনের পিতার কাছ থেকেই শুনেছি, জেন শিক্ষা সফরে কিছুতেই যেতে চায়নি, তাকে সবাই জোর করে নিয়ে গেছে। তাছাড়া জোয়ান সেখানে গেছে এটা কারোই জানা ছিলো না। জেনের সম্পর্কে তোমার কথা সত্য হলে, জেন জানত যে জোয়ান ট্রিয়েস্ট গেছে এবং সেক্ষেত্রে জেন আগ্রহী হতো ট্রিয়েস্ট যাবার জন্যে।’

একটু থামল। তারপর চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসে আবার বলল, ‘জুবি, ভবিষ্যতে জেন সম্পর্কে এইভাবে কথা বলবে না। সে ফ্রান্সিসকো জেমেনিজের মেয়ে। আর ফ্রান্সিসকোর অবদান ক্লু-ক্যাক্স-ক্ল্যানে তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী।’

‘স্যরি স্যার।’

‘করণীয় তো কিছু বের করতে পারলে না। এখন শুন, গোটা মাদ্রিদ ঘিরে ফেলতে হবে।’

‘ইয়েস স্যার। কিন্তু.. ..।’

কেন ঘিরে ফেলতে হবে সেটাই তো বলবে? বলত আহমদ মুসা তেজস্ক্রিয়া রিপোর্ট নিয়ে এখন কি করবে?

এর এন্টিডোট খুজবে অথবা তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল গুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করবে তাদের উল্লেখযোগ্য স্থাপনা গুলো থেকে।

গর্দভ তেজস্ক্রিয়ের কোন এন্টিডোট নেই। তাদের হাতে একটাই বিকল্প। সেটা হলো তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল গুলো মাটির তলা থেকে তুলে ফেলা। এই কাজের জন্য প্রথমেই আহমদ মুসা আসবে মাদ্রিদ, এখন পরিষ্কার হয়েছে কেন মাদ্রিদ ঘিরে ফেলতে হবে ?

ইয়েস স্যার। এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠল জুবি জারিটার মুখে।

শুধু ইয়েস স্যার নয়। আজকেই কাজে লেগে যাও। মাদ্রিদ প্রবেশের প্রতিটি পথে পাহারা বসাও। তোমাদের নজর এড়িয়ে একটা পিপড়াও যেন মাদ্রিদ প্রবেশ করতে না পারে। যাও এখন।

ইয়েস স্যার। বলে উঠে দাডাল জুবি জারিটা।

চারদিন পরের ঘটনা।

ভাসকুয়েজ তার টেবিলে জুবি জারিটার রিপোর্ট পড়েছিল। জুবি জারিটা মাদ্রিদ বন্দের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এ তারই রিপোর্ট। ভাসকুয়েজের ঘরে ঢুকল তার মিডিয়া অপারেটর মেয়েটি। তার হাতে সদ্য আসা একটা ফ্যাক্স মেসেজ।

পায়ের শব্দে মুখ তুলল ভাসকুয়েজ। ভ্রু কুচকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল জরুরী কিছু?

জরুরী মেসেজ অপারেটর নিজেই সোজাসুজি নিয়ে এল ভাসকুয়েজের কাছে, এটাই নিয়ম। সাধারণ ও রুটিন মেসেজ গুলো ফাইল আকারে পি এস এর কাছে যায় পি এস সেগুলো নিয়ে আসে ভাসকুয়েজের কাছে।

জি স্যার। তুলুজ থেকে জরুরী মেসেজ।

ভাসকুয়েজ হাত বাডিয়ে মেসেজটি নিল নজর বুলাল মেসেজটিতে তুলুজের ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান ইউনিটের সহকারী ডুপ্লে লিখেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় আমরা ভেনিস থেকে জানতে পারি আহমদ মুসা তার দুইজন সাথী সহ তুলুজ গামী বিমান উঠেছে। বিমান বন্দরে আমার তিনটি গাডির একটা ফাদ তৈরী করি। আহমদ মুসা সহ তারা তিনজনই আমাদের ফাদে পড়ে যায়। আমার ট্যাক্সিতেই ওরা ভাডায় উঠে। আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। অন্য দুটি গাডি নিয়ে আমাদের কমান্ডারসহ চারজন আমাদের গাডির পেছনে আসছিল। আমাদের টার্গেট ছিল ওদেরকে আমাদের ঘাটিতে নিয়ে আটকানো। ওরা গেবোনে হাইওয়ে হয়ে সুরেট যাবার জন্য আমার গাডিতে উঠেছিল। ওরা তিনজন কেউ রাস্তা চেনে না তবু ওদের সন্দেহ হয় আমি ঠিক পথে চলছি না। পেছনে থেকে একটা হাত এসে আমার গলা চেপে ধরে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে। পুলিশ

আমার জ্ঞান ফেরায়। দেখতে পাই আমাকে অজ্ঞান করে কমান্ডার সহ চারজনকে খুন করে আহমদ মুসারা পালিয়েছে। আমাকে জড়িয়ে কেস হয়েছে। আমি পুলিশ কাস্টোডিতে থেকেই একজনকে পয়সা দিয়ে এই মেসেজটি পাঠালাম।

মেসেজটি পড়ে কুইনাইন খাওয়ার মতো বিকৃত হয়ে গেল ভাসকুয়েজের মুখ। আবার আহমদ মুসার কাছে পরাজয়। কিন্তু এ পরাজয়টা হলো কি করে। একজনকে না হয় অজ্ঞান করে একটা গাড়ি দখল করল অন্য দুটি তখন কি করছিল। কিছু করতে তারা না পারুক দুটি গাড়ির সবাই আহমদ মুসার হাতে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গুলী খেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়েছে। মন বিষিয়ে উঠল ভাসকুয়েজের।

ভাসকুয়েজ কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর এসে দাড়াল দেয়ালে টাঙানো বিশাল মানচিত্রের সামনে। দৃষ্টি নিবন্ধ করল দক্ষিণ ফ্রান্সের উপর। তুলুজে ওদেরকে খুন করে আহমদ মুসা নিশ্চয় মুরেটে এসেছে মুরেটে কেন? আসলে মুরেট একটা স্টপেজ। সে আসছে স্পেনে সম্ভবত গোরোনে হাইওয়ে ধরে মন্টেজূ ও ম্যানোনা হয়ে বাসাক এলাকার মধ্যে দিয়ে সে স্পেনে প্রবেশ করবে। দুঃখের মধ্যেও এ হদিসটুকু পেয়ে খুশি হলো ভাসকুয়েজ।

চেয়ারে আবার ফিরে এল ভাসকুয়েজ। ইন্টারকমে যোগাযোগ করল জুবি জারিটার সাথে। বলল শুনো পিরেনিজ থেকে বিশেষ করে পিরিনিজ এর ভেল্লা এলাকা থেকে যে সব রাস্তা সে সব রাস্তার উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। আহমদ মুসা ঐ পথ দিয়েই স্পেনে প্রবেশ করছে। আর মাদ্রিদের উত্তর মুখি রাস্তা গুলোর উপরই পাহারা জোরদার কর।

তুলুজে ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যানের বিপর্যয় ও চারজন নিহত হবার কথা ভাসকুয়েজ জুবি জারিটার কাছে চেপে গেল। ভাসকুয়েজ চায় না যে ওদের মধ্যে একটা আতংক সৃষ্টি হোক। আত্মবিশ্বাস কমে যাক এবং আহমদ মুসাকে ভয় করতে শুরু করুক।

জুবি জারিটার সাথে কথা শেষ করে ভাসকুয়েজ সবে একটা ফাইলে মনোযোগ দিয়েছে এমন সময় ইন্টারকম কথা বলে উঠল জুবি জারিটার গলা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। বলল স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কি সর্বনাশ হয়েছে?

তুলুজে আহমদ মুসা আমাদের চারজন লোককে খুন করেছে। আহমদ মুসাকে ওরা ...।

তুমি কোথেকে জানতে পারলে এ খবর? জুবি জারিতাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ভাসকুয়েজ।

ফরাসি ইন্টেলিজেন্সের একটা মেসেজ এইমাত্র পেলাম।

হু করে একটা শব্দ বেরুল ভাসকুয়েজের মুখ থেকে। বলল হ্যা ওরা খুশী হয়ে খারাপ খবরটা তাড়াতাড়ি দিয়েছে, ভাল কোন খবর ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

বলে ভাসকুয়েজ ইন্টারকম অফ করে দিল। মুখটা বিরক্তিতে ভরা।

সামনে খোলা ফাইলটি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ভাসকুয়েজ। চোখ বন্ধ করল। কিছুক্ষণ সব ভুলে থেকে শান্তি পেতে চায় সে কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই ব্যর্থতার ভয়াবহ চিত্রগুলো এক এক করে ছায়াছবির দৃশ্যের মত তার সামনে এসে হাজির হতে লাগল। বিশ্রাম হলো না। উঠে দাড়ালো ভাসকুয়েজ।

ঘরময় আবার পায়চারি শুরু হলো তার।

তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল হান্না জেনকে।

তোকে বিশ্বাস না করলে দুনিয়াতে আর কাকে বিশ্বাস করি বলত? আমার গোটা হৃদয় তোর কাছে খোলা। বলল জেন হান্নার একটি হাত নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে।

কেন কেউ নেই? জোয়ান?

জোয়ানের সাথে তো আমার বিশ্বাসের সম্পর্ক নয় ও আমার সত্তা আমার সব। আর তুই আমার একমাত্র বন্ধু যার কাছে আমার হৃদয় খোলা।

না তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না জেন। আবার জোর দিয়ে বলল হান্না।

তুই বাজে বকছিস।

বাজে বকছি? আচ্ছা বলত ত্রিয়েস্তে সি কুইন মোটেলের সামনে যে দিন হত্যার ঘটনা ঘটল। সেদিন রাত আটটায় তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

প্রশ্ন শোনার পর জেন কিছুক্ষণ হান্নার দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকল। যেন জেন পাঠ করার চেষ্টা করছে হান্নাকে।

একটু পর ধীরে কণ্ঠে বলল তুই কত টুকু জানিস হান্না?

কিছুই জানিনা তুই কোথাই গিয়েছিলি বল? হেসে বলল হান্না।

জেনের মুখে কিন্তু হাসি নেই। হান্নার একটি হাত তুলে নিয়ে বলল না তুই জানিস। বল কতটুকু জানিস?

জেনের অবস্থা দেখে হান্নার বোধ হয় করুনা হলো বলল সেদিন বিকেলে থেকেই তোকে আমি আনমনা দেখি। তারপর রাত ৮টার দিকে তুই যখন বাইরে যেতে চাইলি এবং আমাকে সাথে নিতে চাইলি না তখন আমার সন্দেহ হলো নিশ্চয় জোয়ানের ওখানে যাচ্ছিস। তোর অভিসার যাত্রাকে অনুসরন করলাম। জোয়ানের রেস্ট হাউসের দিকে যাচ্ছিস দেখে আমার অনুমান সত্য হওয়াই ভীষণ খুশী হলাম কিন্তু শীঘ্রই আমার খুশী কৌতুহলে রূপ নিল যখন দেখলাম তুই ওঁত পেতে বসলি। ভাবলাম এই লুকোচুরি খেলার শেষ দেখতে হবে। অভিসারের এ আবার কোন রূপ, অবশ্য পরক্ষনেই জোয়ানের ঘরের দরজা খোলা দেখে আমার মনে হয়েছিল নিশ্চয় জোয়ানের ঘরে লোক আছে এ জন্য তোর এই লুকানো। মজা দেখার লোভ নিয়ে তোর থেকে সামান্য দুরে একটা ঝাউগাছের আড়ালে বসে রইলাম। মজা দেখার আনন্দ আতংকে রূপান্তরিত হলো যখন দেখলাম দু জন স্টেনগানধারী জোয়ানের ঘরের দরজায় গিয়ে স্টেনগান উদ্যত করে দাঁড়াল। তারপর তোর দিকে তাকিয়ে তো আমার বুকের কাঁপুনি ধরে গেল। দেখলাম তোর হাতে উদ্যত পিস্তল, তুই গুড়ি মেরে এগুচ্ছিস জোয়ানের ঘরের দিকে। ভয়ে আমি আড়ষ্ট, কিন্তু চোখ সরাতে পারলাম না তোর উপর থেকে। তারপর দেখলাম তোকে গুলি করতে এবং ঐ দুই স্টেনগানধারীকে পড়ে যেতে। আমি তখন কাঁপছি। আমার পাশ দিয়েই দৌড়ে চলে গেলি। কিন্তু আমি নড়তে পারছিলাম না, কথাও বলতে পারছিলাম না। তুই চলে আসার পর আমার ভয় ধরে গেল, আমি না ধরা পড়ে যাই। কম্পিত পায়ে গুড়ি মেরে ফুলের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে

এলাম রাস্তায়। তারপর ছুটলাম। মটেলে আসতে ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল আমিই যেন খুন করেছি, কারও সাথে দেখা হলেই ধরা পড়ে যাব। চলে এলাম নিচে। এক বেঞ্চিতে নিরিবিলি বসে থাকলাম আধা ঘন্টা। ভয় কমলে, মনটা শান্ত হলে মটেলে ফিরে এলাম। তোর সাথেও কথা বলতে ভয় হচ্ছিল। শুয়ে পড়লাম কম্বল মুড়ি দিয়ে।'

থামল হান্না।

জেনের মুখে কোন কথা নেই। মুখ নিচু।

হান্নাই আবার কথা বলল। বলল, 'এত বড় ঘটনা আমার কাছ থেকে লুকিয়েছিস, নিশ্চয় তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না।

মুখ তুলল জেন। বলল,'তোকে বলিনি কেন জানিস, তোকে বললে তুই আমাকে যেতে দিতিস না ঐ কাজে। 'প্রায় কান্না ভেজা কন্ঠে বলল, জেন।

'অবশ্যই যেতে দিতাম না। কি সর্বনাশা পথ ওটা! যদি স্টেনগানধারীরা টের পেত, যদি কিছু ঘটত! তোর ভয় করেনি?'

'ভয়ের কথা তখন মনে হয়নি, এখন ভয় করে মনে হলে। তখন আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে জোয়ানের নিরাপত্তার প্রশ্ন। বিকেলে দাউদ ইমরানের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনেছিলাম, রাত ৯টায় অপারেশন জোয়ানের ঘরে। সন্ধ্যায় জোয়ানের আনা স্যাম্পুল, তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট, এমনকি ডিস্ক গায়েব হবার খবর যখন শুনলাম, তখন বুঝলাম জোয়ানকে সরানোর পরিকল্পনাও চূড়ান্ত। এটা বোঝার পর আর আমার জ্ঞান ছিল না।'

তাই বলে তুই নিজ হাতে পিস্তল ধরে খুনিদের মোকাবিলা করার সাহস করলি, খুন করতেও পারলি?'

'কেমন করে পেরেছি জানিনা, একটা চিন্তাই তখন আমার মনে ছিল, জোয়ানকে বাঁচাতে না পারলে আমার বেঁচে লাভ নেই। আমি মরেও যদি ওকে বাঁচাতে পারি।

থেমে গেল জেন। ভারি হয়ে উঠেছিল ওর কন্ঠ।

'আমি দুঃখিত জেন, এটা তোর বাড়াবাড়ি। জোয়ানের অবস্থা তুই জানিস। তার সাথে তোর জীবনকে এভাবে জড়ালে তার পরিণতি কি?

‘আমি জানিনা। আমি ওসব ভাবি না।’

না ভাবলে চলবে কি করে? ট্রিয়েস্টে তুই তাকে বাঁচালি। কিন্তু ও এখন স্পেনে ফিরবে কি করে? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান তাকে ছাড়বে মনে করিস?’

‘জেন, মা, তোমার এ্যাটলাস বইটা একটু দাও তো দেখি’-বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করল জেনের আব্বা মিঃ ফ্রান্সিস্কো জেমেনিজ। ঘরে ঢুকে হান্নাকে দেখে বলে উঠল, ‘বাঃ হান্না, কখন এসেছ মা?’

‘এই অল্পক্ষণ।’ উঠে দাঁড়িয়ে বলল হান্না।

এ্যাটলাস বুক নিয়ে চলে যেতে শুরু করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জেনের আব্বা বলল, শুনেছ মা জেন, মা হান্না, ট্রিয়েস্টে কি ঘটেছে? তোমরা কিছু তো দেখেছও।’

জেন কিছু বলল না।

‘কি ঘটেছে চাচাজান? আমি তো একজন লোক খুন হয়েছে দেখে এসেছি। ‘বলল হান্না।

‘একজন বলছ, দশজন খুন হয়েছে এবং এই সবগুলো খুনের জন্যে আহমদ মুসা দায়ী। আর তোমাদের জোয়ান এখানে নাটের গুরু হিসেবে কাজ করেছে।’

‘মুখটা লাল হয়ে উঠল জেনের।’

হান্নাই আবার কথা বলল। বলল, ‘চাচাজান, আমরা তো তেমন কিছু দেখিনি। সে তো কি একটা কাজে আই সি টি পি’তে গিয়েছিল। ওখানে কারও সাথে তার তেমন কোন পরিচয়ও নেই’। ‘তোমরা ছেলে মানুষ কি জান। সে এক সাংঘাতিক মিশনে ট্রিয়েস্টে গিয়েছিল। ওটাকে কেন্দ করেই তো ঐসব খুন-জখম। ছেলেটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারল।’

‘কিভাবে চাচাজান? সে কি কাউকে খুন করেছে? কারও ক্ষতি করেছে?’

‘ওর পক্ষে এসব কথা বাইরে বলো না হান্না। সে এখন আমাদের জাতীয় শত্রু। ও স্পেনে আর ফিরতে পারবে না, ফিরতে পারলেও বাঁচবে না।’

বলে জেনের আব্বা বেরিয়ে গেল।

জেনের মুখে তখন কোন রক্ত নেই। কাঁপছে তার ঠোঁট।

হান্না তার একটা হাত ধরে বলল, ‘জেন তোকে পাগলামি ছাড়তে হবে, শুনলি তো সব?’

জেন হান্নার দুই হাত জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বলল, ‘আমি পারবো না, আমি পারবো না। আমি ওসব কথা বিশ্বাস করি না। জোয়ান নির্দোষ। বরং জোয়ান ষড়যন্ত্রের শিকার।’

‘এ কথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবি?’

‘কোন ক্ষতি নেই কেউ বিশ্বাস না করলে। আমি শুধু বিশ্বাস করতে চাই।’

‘জোয়ান যদি স্পেনে না ফিরতে পারে?’

একটু চুপ করে থেকে জেন বলল, যেখানেই থাকুক, ভাল থাকলে, নিরাপদ থাকলে আমি খুশী হবো। তবে আমি কি মনে করি জানিস, জোয়ান স্পেনে আসবে, কোন বাধা তাকে রুখতে পারবে না।’

‘এতবড় কথা কি করে বলছিস? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ক্ষমতা তুই জানিস?’

‘জেনেই বলছি হান্না।’

‘কিন্তু আমি কোন যুক্তি দেখছি না, জোয়ান তো শান্ত-শিষ্ট এক ছেলে। ওর মাথা আছে, কিন্তু হাত তো নেই।’

‘ট্রিয়েস্টে বাকি যে আটটি খুনের ঘটনা ঘটল, তার একটিও জোয়ান করেনি। তাহলে এসব ঘটল কি করে বলতে পারিস?’

‘আমারও বিরাট জিজ্ঞাসা এটা।’

‘সব ঘটনা একজনে ঘটিয়েছেন না।’

‘একজনে? কে সে?’

‘আহমদ মুসা।’

‘আহমদ মুসা? কোন আহমদ মুসা?’

‘আজকের বিশ্বে সবাই চেনার মত আহমদ মুসা একজনই আছে।’

‘সেই আহমদ মুসা স্পেনে এসেছে? ট্রিয়েস্টে গিয়েছিল? চাচাজানের কথা তাহলে ঠিক?’ চোখ কপালে তুলে বলল হান্না।

‘হ্যাঁ।’

‘তুই কি করে জানলি?’

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল জেন। তারপর বলল, ‘আমি তার ফটো দেখেছিলাম, ট্রিয়েস্টে দেখেই চিনতে পারি।’

‘ট্রিয়েস্টে দেখেছিস, কোথায়?’

‘মটেল সি-কুইনের সামনে তিনিই হত্যা করলেন অধ্যাপক ভিলারোয়ার সাথের লোকটিকে।’

‘ওই লোক আহমদ মুসা?’

একটা ঢোক গিলল হান্না। তারপর আবার বলল, ‘তাই হবে আমিও ভেবেছি, এতগুলো লোকের সামনে এত শান্তভাবে এতগুলো কান্ড ঘটিয়ে গেল যে লোক সে সাধারণ নয়। তাছাড়া মিঃ ভিলারোয়াকে যে লোকটি নিয়ে এসেছিল, সেই তো প্রথম পিস্তল বের করে, কিন্তু ব্যবহার আগে করতে পারেনি। আহমদ মুসা লোকটি কিভাবে কখন পিস্তল বের করল, ব্যবহার করল বোঝাই গেল না।’

আবার থামল হান্না। থেমেই আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আহমদ মুসা জোয়ানের সাহায্যে আসবে কেন?’

‘আহমদ মুসা বিপদগ্রস্ত মানুষ, বিপদগ্রস্ত জাতির পাশে দাঁড়ান।’

‘কিন্তু জোয়ান যে বিপদে পড়েছে, সে বিপদ তো দু’চারশ’ লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করে দূর করা যাবে না।’

‘আমি এসব কিছুই জানিনা হান্না,কিন্তু মনে হচ্ছে বড় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।’

‘তুই এটা বোঝার পরেও জোয়ানের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিস কি করে?

‘হয়তো এটাই আমার ভাগ্য।’

‘তুই বুদ্ধিমতী, কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে তুই এত অবুঝ হবি, ভাবতে বিস্ময় লাগছে।’

কেঁদে ফেলল জেন। বলল, ‘ও নিরপরাধ, ওর প্রতি আমার দেশ, আমার জাতি, সরকার সবাই অবিচার করছে। আমি ওকে আঘাত দিতে পারিনি।’

‘জেন, আমি তো সাক্ষী, জোয়ান তোর কাছ থেকে সরে যেতে চেয়েছিল।’

'সরে যেতে চেয়ে ও প্রমান করেছে ও অসাধারন। কেন আমি প্রমান করব না যে, আমি ওর চেয়ে ছোট নই। থাক এসব কথা হান্না। তুই সব বুঝেও এমন করে বলছিস। জানি তুই আমার ভাল চাস। কিন্তু চরম অবিচারের শিকার হয়ে জোয়ান যদি শেষ হয়ে যায়, আমি বাচঁব না। তার চেয়ে ভাল, যতটুকু পারি ওর পাশে থেকে লড়ব জাতির অবিচারের বিরুদ্ধে। তাতে জীবন যদি আমার যায়, তাতে আমার এই কার্ডিনাল পরিবারের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। মরিসকোদের উপর জুলুম আমার মনে হয় আমার পরিবারের চেয়ে বেশী কোন পরিবার করেনি।'

জেনের দু'চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু খসে পড়ল, নেমে এল গন্ড বেয়ে।

হান্না জড়িয়ে ধরল জেনকে। বলল, 'হতভাগী বান্ধবী আমার। তোকে আমার চেয়ে কে বেশী বোঝে! আমি যাই মনে করি আমাকে তোর পাশে পাবি।'

'আমি জানি হান্না।' হান্নাকে জড়িয়ে ধরে বলল জেন।

দুই বান্ধবীর চোখেই তখন অশ্রু।

ঘরের বাইরে জেনের আম্মার কন্ঠ শোনা গেল, তার সাথে পায়ের শব্দ।

জেন ও হান্না দু'জনেই তাড়াতাড়ি তাদের চোখের পানি মুছে ফেলল।

আলবাসেট-মাদ্রিদ হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি মাদ্রিদের দিকে। তারা ঠিক দক্ষিন দিক দিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে মাদ্রিদে। পিরেনিজ থেকে সোজা এলে উত্তরের যে কোন পথে তাদের মাদ্রিদ প্রবেশের কথা, কিন্তু আহমদ মুসা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে কাঁচ কলা দেখাবার জন্যে দিক পরিবর্তন করেছে।

চারদিক থেকে মাদ্রিদ প্রবেশের মোট হাইওয়ে আছে সাতটা। মাদ্রিদ-সারাগোসা ও মাদ্রিদ বারগোস হাইওয়ে উত্তর দিক থেকে, পশ্চিম দিক থেকে মাদ্রিদ-ভেল্লাদলিত ও মাদ্রিদ-বাজোস হাইওয়ে এবং দক্ষিনে তিনটি হাইওয়ে মাদ্রিদ-টলেড, মাদ্রিদ-আলবাসেট এবং মাদ্রিদ-ভ্যালেন্সিয়া। পিরেনিজের ভেল্লা

থেকে মাদ্রিদের সোজা পথ ছিল লেরিদা-সারাগোসা-মাদ্রিদ হাইওয়ে। এ পথে এলে তারা পূর্ব-উত্তর প্রান্ত দিয়ে মাদ্রিদ প্রবেশ করতো। কিন্তু আহমদ মুসা এ সোজা পথ পছন্দ করেনি। আহমদ মুসা পরিষ্কারই বুঝতে পেরেছিল, ভেনিস থেকে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের লোকরা যখন তুলুজকে আহমদ মুসাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে পেরেছে, তখন তুলুজ মাদ্রিদকে অবশ্যই জানাতে পারে যে, আহমদ মুসারা গোরোনে হাইওয়ে ধরে ভেল্লার পথে স্পেনে প্রবেশ করছে। ভেল্লা থেকে আহমদ মুসারা যে সারাগোসা-মাদ্রিদ হাইওয়ে ধরে মাদ্রিদ প্রবেশ করছে, এ কথা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান চোখ বন্ধ করেই ধরে নেবে। সুতরাং তুলুজে তারা যে জাল পেতেছিল, তার চেয়েও বড় জাল ভাসকুয়েজ পাতবে মাদ্রিদ-সারাগোসা হাইওয়েতে। সুতরাং আহমদ মুসা ভেল্লা থেকে বেরুবার সময়ই মনস্থির করে নিয়েছিল, ভিন্ন রুটে তারা মাদ্রিদ প্রবেশ করবে।

ভেল্লা থেকে উত্তর-পূর্ব স্পেনের ক্যাটালোনিয়া প্রদেশের রাজধানী লেরিদায় প্রবেশ করে ড্রাইভিং সিট থেকে আবদুর রহমান বলেছিল, 'তখন আমরা তো পশ্চিমে সারাগোসার দিকে চলব, তাই না মুসা ভাই?'

'না আবদুর রহমান, সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে উপকুল শহর টেরাগন চল।'

'টেরাগন? আমরা মাদ্রিদ যাব না মুসা ভাই?' চোখ কপালে তুলে বলেছিল আবদুর রহমান।

'যাব, তবে সোজা পথে নয়। টেরাগন থেকে যাব ভ্যালেনসিয়া, ভ্যালেনসিয়া থেকে আলমানসা হয়ে অলবাসেট এবং সেখান থেকে মাদ্রিদ।'

'এত ঘুরার কি প্রয়োজন ছিল মুসা ভাই?'

'ছিল না। কিন্তু ওদের চোখ এড়িয়ে আমি মাদ্রিদ প্রবেশ করতে চাই। ওরা জানুক যে, আমরা মাদ্রিদে আসিনি, তাহলে কাজের একটু সুবিধা হবে। সবচেয়ে বড় কাজ এখন আমাদেরকে মাদ্রিদে করতে হবে। ওরা যত অপ্রস্তুত থাকে তত ভাল আমাদের জন্যে।'

'কিন্তু মুসা ভাই, ভ্যালেনসিয়া থেকে সোজা একটা হাইওয়ে গেছে মাদ্রিদে, ও পথেও তো আমরা যেতে পারি?' বলেছিল জোয়ান।

‘পারি, কিন্তু তারচেয়েও আলবাসেট-মাদ্রিদ হাইওয়েটা নিরাপদ হবে বলে আমি মনে করি। সারাগোসা-মাদ্রিদ হাইওয়ের পাশেই তো অনেকটা ভ্যালেনসিয়া-মাদ্রিদ হাইওয়ে।’

একে তো ঘুরা পথ, তার উপর ভ্যালেনসিয়া এসে একদিন দেরী হয়েছিল আহমদ মুসাদের। ভ্যালেনসিয়া শহরটি জোয়ান এবং আবদুর রহমান দু’জনেরই আবেগের সাথে জড়িত। তাছাড়া আহমদ মুসাও স্পেনের পুর্ব উপকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর নগরী ভ্যালেনসিয়া একটু ঘুরে দেখার লোভ সামলাতে পারেনি।

এখনকার ভ্যালেনসিয়া একেবারে নতুন, আগের ভ্যালেনসিয়ার কোন চিহ্নই এখন বর্তমান নেই। তবু জোয়ান এবং আবদুর রহমান পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছে ভ্যালেনসিয়ার এগলি থেকে সেগলিতে। ভ্যালেনসিয়ার পুরানো এলাকার যে বাড়িই দেখেছে, মনে হয়েছে এখানেই হয়তো তাদের পুর্ব পুরুষ আবদুর রহমান থাকতেন অথবা এই বাড়িতেই শুরু হয় আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের দাসজীবন। তারা ঘুরে ঘুরেই জানতে পারল, অতীতের দুটো স্মৃতিই মাত্র বর্তমান। একটি হলো, আবদুর রহমান ও জোয়ানের পুর্ব পুরুষ বিজ্ঞানী আবদুর রহমানের ‘দারুল হিকমা’ বা বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভ্যালেনসিয়া বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। আরেকটি হলো, ভ্যালেনসিয়া বন্দরের ইসাবেলা জেটি। বহু আশা করে জোয়ানরা গেয়েছিল বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আধুনিক বিল্ডিং-এর সারি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি জোয়ানরা। তবু সেখানে গিয়ে সজল হয়ে উঠেছিল জোয়ান ও আবদুর রহমানের চোখ। সেখানকার মাটিতে, বাতাসে দারুল হিকমার স্পর্শ তারা খুঁজছিল। বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা চলে এসেছিল ভ্যালেনসিয়া বন্দরে ইসাবেলা জেটিতে। এখানে জোয়ান, আবদুর রহমান, আহমদ মুসা সকলেই ভাবপ্রবন হয়ে পড়েছিল। ভ্যালেনসিয়া ও পুর্ব স্পেন থেকে উচ্ছেদকৃত মুসলিম নর-নারীদের সর্বশেষ দলটিকে নিয়ে সর্বশেষ জাহাজটি ছেড়েছিল এই জেটি থেকে। জাহাজ ছাড়লে স্বদেশভুমি স্পেনের জন্যে কান্নারত পাগল নারী-পুরুষরা চিৎকার করে অভিসম্পাত দিচ্ছিল রানী ইসাবেলা ও রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে। এর জবাবে রানী ইসাবেলা ও ফার্ডিন্যান্ডের সৈনিকরা উপকূল থেকে কামান দেগে

জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। নারী-পুরুষ সবাই ডুবে মরে, কাউকেই উপকূলে উঠতে দেয়া হয়নি। এই কৃতিত্বপূর্ন ঘটনার স্মরনে স্থানীয় খৃষ্টানরা এই জেটির নাম দেয় ইসাবেলা জেটি। এই জেটিতে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাতে গিয়ে অশ্রুতে চোখ ভরে উঠেছিল জোয়ান, আবদুর রহমান এবং আহমদ মুসা তিনজনেরই।

আহমদ মুসা তার এক হাত আবদুর রহমান আরেক হাত জোয়ানের কাঁধে রেখে সামনে সাগরের বুকের উপর দৃষ্টি রেখে বলেছিল, 'আমরা এক জাহাজের কথাই শুধু ভাবছি, কিন্তু জান কি স্পেনের মুসলিম উদ্বাস্তু বোঝাই কত জাহাজ সামনের ঐ মেজর্কা, মানর্কা দ্বীপে লুন্ঠিত হয়েছে, কত জাহাজ ডুবেছে, ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে সামনের ঐ ভূমধ্যসাগরে? স্পেনে একটি জাতি স্বত্ত্বা ধ্বংসের যে ঘটনা, ইতিহাসে তার নজীর নেই, আবার এই সাগরে মুসলিম উদ্বাস্তুদের যে পরিনতি হয়েছে ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে তা আর ঘটেনি। অথচ এই সাগরের দুইদিক ঘিরে তখনও মুসলিম সাম্রাজ্য!'

ভেজা চোখে তারা ফিরে এসেছিল ইসাবেলা জেটি থেকে।

তিনজনেরই পর্যটকের ছদ্মবেশ। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, কোমরে চওড়া বেল্ট। তিনজনের মুখেই দাঁড়ি ও গোঁফ লাগানো। খুব পরিচিত না হলে তাদেরকে চেনার উপায় নেই। আহমদ মুসা সাধারণত ছদ্মবেশ নেয় না, কিন্তু এবার নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছে। সে নিরপদ্রুপে মাদ্রিদ পৌঁছাতে চায়। তার লক্ষ্য এখন কোন সংঘাত নয়, তার লক্ষ্য তেজস্ক্রিয় সেটের পরিকল্পনার মানচিত্র উদ্ধার করা।

সাগরের কূল ছেড়ে বন্দরের অনেক খানি উপরে তারা উঠে এসেছে। পার্ক করা গাড়ির দিকে এগুচ্ছিল তারা। পাশেই এ সময় ছেলে-মেয়েদের একটা জটলা দেখতে পেয়েছিল। আহমদ মুসারা তিনজনেই সেদিকে তাকিয়ে ছিল। দেখলো, বৃদ্ধ-প্রায় একটা মহিলাকে ছেলেরা উত্যক্ত করছে। সমস্বরে তারা বলছে, মরিসকো পাগলী। বার বার একথা বলছে। সুবেশা মহিলাটা কোন ভ্রুক্ষেপই করছেনা। একমনে একটা রুটি চিবাচ্ছে।

'মরিস্কো পাগলী'র মরিস্কো শব্দটি আহমদ মুসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

হৃদয়ে এসে ঘা দিয়েছিলো শব্দটা। মহিলাটি কি মরিস্কো জোয়ানের মনটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। আহমদ মুসারা এগিয়ে গিয়েছিল জটলার দিকে। জোয়ান আগে আগে।

জটলা থেকে একজন যুবক ছেলে, বয়স আঠার, উনিশ হবে, চলে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদের পাশ দিয়েই।

জোয়ান তাকে ডেকে বলেছিল, ঐ যে মহিলাটিকে তোমরা উত্যক্ত করছ সে কে?'

কেন ওকে চিনেন না। সবাই বলে মরিস্কো পাগলী। বলেছিল ছেলেটি।

'কে ও? ওকি সত্যি পাগল? আবার জিজ্ঞাসা করে জোয়ান।

'জানি না, সবাই বলে পাগল। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে।'

'ওঁর আপন কেউ নেই?'

'ছিল, ওর আব্বা ও ভাই ছিল। কিন্তু তারা এখন নাই। ওদের হত্যা করা হয়েছে।'

'হত্যা করা হয়েছে? কে হত্যা করেছে?'

'ওরা মরিস্কো পরিচয় গোপন করে ওদের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল সেই অপরাধে ওদের হত্যা করা হয় শুনেছি। আর স্বামী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।' ছেলেটির কন্ঠ ভারি।

'বুঝেছি, তোমরা এমন দুঃখী মেয়েকে কষ্ট দাও, খারাপ লাগে না?'

'আমি দেখতে গিয়েছিলাম, আমি কিছু বলিনি, আমি কিছু করিনি' ছেলেটির কণ্ঠ ভারি ও ক্ষুব্ধ মনে হলো।

সে কণ্ঠে চমকে উঠেছিল জোয়ান এবং আহমদ মুসারাও।

'তুমি খুব ভাল ছেলে, মানুষের প্রতি তোমার দরদ আছে। চল তুমি একটু সাহায্য করবে, আমরা ওর সাথে কথা বলতে চাই।'

ছেলেটি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিল জোয়ান এবং আহমদ মুসাদের দিকে। পরে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, 'কোন লাভ নেই, ওঁ কাউকে চিনে না, কারও সাথে কথাও বলে না। যা বলে আপন মনে বলে।'

'তবুও চেষ্টা করে দেখি চল।' বলেছিল জোয়ান।

পাগলিনীকে ঘিরে ছেলেদের জটলা তখন ছিল না। চলে গিয়েছিল সবাই। মরিস্‌কো পাগলী একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে ঢুলছিল।

আহমদ মুসারা তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সাথে ছেলেটি। ছেলেটি হয়ে পড়েছিল গম্ভীর, তার মুখটা হয়ে উঠেছিল কেমন যেন ফ্যাকাশে। ব্যাপারটা আহমদ মুসার দৃষ্টিতে পড়েছিল।

জোয়ান মহিলাটির সামনে গিয়ে বসে পড়েছিল। মহিলাটিকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'মা'।

স্পষ্ট ওঁ দরদভরা কণ্ঠ ছিল জোয়ানের।

মরিস্‌কো পাগলী মহিলাটি মাথা খাড়া করেছিল অনেকটা চমকে উঠার মত করে। চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জোয়ানের দিকে। আবার ডেকে ছিল জোয়ান, 'মা।'

স্থির দৃষ্টি কাঁপছিল মহিলাটির। কাঁপছিল তার ঠোট। হঠাৎ তার কম্পিত ঠোট থেকে বেরিয় এল, মা, মা, মা।

'মা' শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে তার চোখের কম্পন বাড়ছিল, দৃষ্টি তীব্র হচ্ছিল। তার মধ্যে কি যেন খুঁজে পাবার আকুলি বিকুলি। অসহায়ভাবে অকূল সমুদ্রে সে যেন সাঁতরাচ্ছে, কূল খুঁজে পাচ্ছেনা।

এ সময় সেখানে দু'জন মহিলা পুলিশ এসে হাজির। তারা দু'জন দু'হাত ধরল মরিস্‌কো পাগলীর। টেনে তুলতে তুলতে তুলতে বলেছিল, চলুন ফেরার সময় হয়েছে।

মরিস্‌কো পাগলী জোয়ানের দিকে চোখ উঠিয়ে হেসে উঠেছিল উচ্চস্বরে।

পুলিশ দু'জন পাগলীকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

জোয়ানের বুক জুড়ে তোলপাড় করছিল, একটি কথা- 'স্পেনে মরিসকোদের হয় দাস হতে হয়, নয়তো মরতে হয়, অথবা হতে হয় পাগল'।'

চোখের দু'কোণ ভিজে উঠেছিল জোয়ানের।

ছেলেটি ভারি চোখে, পাংশু মুখে জোয়ানের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি কে?'

‘আমি? আমি ওঁর মতই একজন মরিস্‌কো ছিলাম। এখন মুসলমান।’

হঠাৎ ছেলেটি দেহ বাঁকিয়ে, মাথা ঝুকিয়ে বাও করেছিল জোয়ানকে। সেই সাথে তার দু’চোখে নেমে এসেছিল অশ্রু।

জোয়ান বিস্মিত হয়েছিল। বলেছিল, তুমি এভাবে বাও করলে কেন? তুমি কাঁদছোই বা কেন ?

‘আমি একজন মরিস্‌কো, একজন মুসলমানকে শ্রদ্ধা জানালাম। আর কাঁদছি আমি আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে।’

‘কি দুর্ভাগ্য?’

‘আমি আমার মাকে মা ডাকতে পারি না, মা বলতে পারিনা, তার কোন সাহ্যায্যে আসতে পারি না।’

বলতে বলতে কান্নায় ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

আহমদ মুসা এগিয়ে এসে দু’হাত দিয়ে ছেলেটিকে কাছে টেনে বলেছিল, ‘বুঝতে পেরেছি, ঐ মরিস্‌কো পাগলিনী তোমার মা, তুমি তোমার মাকে মা বলতে পার না, কোন সাহায্য করতে পার না সমাজের ভয়ে। সত্যিই তুমি দুর্ভাগা।’

ছেলেটি কান্না চাপতে মুখে রুমাল চাপা দিয়েছিল।

ছেলেটির সব কাহিনী শুনেছিল আহমদ মুসারা। তার বড় দুই ভাই সরকারী অফিসার, আর সে ভ্যালেনসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষের ছাত্র। তাদের পিতার মৃত্যু ঘটেছে অনেক দিন আগে। এরপর তারা তাদের মাকে এনে সেনিটোরিয়াসে রাখার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু মায়ের চিকিৎসার জন্যে তার কাছে মায়ের সন্তান হিসেবে হাজির হওয়া প্রয়োজন, তা তারা পারছে না। পারছে না কারন, তাতে তারাও সমাজ থেকে বিচ্যুত হবে, সব হারাবে, অন্যদিকে মায়েরও কোন উপকার করতে পারবে না। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই তারা বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে তারা সেনিটোরিয়াসে যায়। দূর থেকে দেখে আসে। সপ্তাহে একদিন পাগলিনী সকলকে শহরে ছেড়ে দেয়া হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সপ্তাহের এ দিনটিতে তারা নিয়মিত মায়ের সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু পরিচয় নিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

কাহিনী শেষ করে ছেলেটি বলেছিল, ‘একজন মরিস্‌কো পাগলিনীকে, যে সকলের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র, মা বলে ডাকতে পেরেছেন, আপনারা কে?’

‘জোয়ান বলেছেই আমরা মুসলমান।’ জবাব দিয়েছিল আহমদ মুসা।

‘এদেশের মরিস্‌কো আরো আছে, মুসলমানও গোপনে আছে, কিন্তু কেউ তো এই সাহস, এই আন্তরিকতা দেখাতে পারে না?’

‘তোমার ঠিকানা তো দিয়েছই, দরকার হলে তোমার সাথে পরে যোগাযোগ করব। এখন পরিচয় নিয়ে কি করবে?’

‘জানি, আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। তবে একটা কথা বলি, আমরা মায়ের সন্তান, বাপের সন্তান নই। আমরা কিছুই করতে পারিনি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও পিতাকে সমর্থন করিনি।’

‘অর্থাৎ তুমি নিজেকে মরিস্‌কো মনে কর তাই না?’ বলে জোয়ান জড়িয়ে ধরেছিল ছেলেটিকে। ছেলেটির পিট চাপড়ে বলেছিল, ‘মরিস্‌কো হওয়া গর্বের, দুঃখের নয়।’

এই সময় আব্দুর রহমান জোয়ানের কাহিনী বলেছিল ছেলেটিকে। ছেলেটি আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল আবার জোয়ানকে। বলেছিল, ‘আপনারা যদি আমার বড় দুই ভায়ের সাথে দেখা না করে চলে যান, তাহলে ওঁরা আমার উপর ভীষণ রাগবেন। আপনারা খুশী হবেন আমার দু’ভাইয়ের সাথে দেখা করে।’

কিন্তু আহমদ মুসারা ছেলেটিকে সময় দিতে পারেনি। বলেছিল, ‘তোমাদের টেলিফোন থাকলে, আমরা কথা বলব তোমার ভাইদের সাথে।’

বিদায়ের সময় ছেলেটি ভারি কণ্ঠে বলেছিল, আপনাদের এক ঘণ্টার সঙ্গ আমার কাছে এক যুগের মত মনে হচ্ছে। আপনারা আমাকে নতুন জীবন দিয়ে গেলেন, সেই সাথে করে গেলেন অসহায়। কারণ চলার পথ আমার জানা নেই।’

আহমদ মুসা ছেলেটির কপালে চুমু খেয়ে বলেছিল, ‘আমরা গোটা স্পেনের জন্যে নতুন জীবনের সন্ধান করছি, হতাশ হয়ো না।’

আলবাসেট-মাদ্রিদ হাইওয়ে ধরে চার দিকের অখণ্ড নিরবতার মধ্যে কালো রাতের বুক চিরে চলার সময় এই কথাগুলো আহমদ মুসা, জোয়ান ও আব্দুর রহমান সকলের মনকেই তোলপাড় করে তুলছিল। ভ্যালেনসিয়ার সেই

মরিস্কো পাগলিনী এবং সেই পাগলিনীর হতভাগ্য ছেলে জোসেফ ফার্ডিনান্ডের কথা তারা ভুলতেই পারছিল না।

মাদ্রিদ আর খুব বেশী দূরে নয়। সামনেই মাদ্রিদকে বেষ্টন করে তৈরি রিং রোড।

রিং রোডের উপর দিয়ে ফ্লাইওভার। ট্রাফিকের কোন ঝামেলা নেই।

একশ' তিরিশ কিলোমিটার বেগে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। ড্রাইভ করছিল আহমদ মুসাই। তার পরনে শিখের পোশাক। মাথায় পাগড়ী, ইয়া বড় দাঁড়ি-গোঁফ।

আর জোয়ান ও আবদুর রহমান দু'জন তরুণ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীক কাজ সেরে তারা মাদ্রিদে ফিরছে। জোয়ানের মুখে পরিপাটি করে ছাটা দাঁড়ি-গোঁফ।

রিং রোডের ফ্লাইওভারটি তখনও পাঁচশ গজের মত দূরে। হঠাৎ ফ্লাইওভারের মুখে লাল আলো জ্বলে উঠল। দেখেই বুঝা গেল আলোটি লাইট স্টিকের। কেউ একজন উঁচিয়ে ধরে আছে।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। চলে যেতে চেষ্টা করে লাভ নেই, গুলী করতে পারে। পুলিশ হতে পারে। আবার শত্রু হওয়াও বিচিত্র নয়।

ফ্লাইওভারের প্রায় কাছাকাছি এসে থেকে গেল আহমদ মুসার গাড়ি।

গাড়ি থামতেই ছুটে এল দুইজন। মনে হলো, শিখ ড্রাইভারের উপর নজর পড়তেই ওরা একটু থমকে গেল। পরক্ষণেই বলে উঠল, 'তোমরা আরোহী ক'জন, কারা?'

'দু'জন। ব্যবসায়ী।' পাঞ্জাবী ও স্প্যানিশ ভাষা মিশিয়ে শিখ ড্রইভারদের মতই উত্তর দিল আহমদ মুসা।

'ওদের নামতে বল।'

'তোমরা কে, পুলিশ তো নও?'

'আমরা পুলিশের বাবা।'

'তাহলে গোয়েন্দা পুলিশ, কোন আসামী ফেরার হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, কথা বাড়িও না, যা বলছি কর।'

আহমদ মুসা ভেতরের আলো জ্বেলে দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল, ‘দেখো।’

দরজা দিয়ে উঁকি দিল দু’জন। সামনেই বসে ছিল আবদুর রহমান। তারপর জোয়ান।

মাথায় হ্যাট পরা, লম্বা কালো ওভার কোটে দেহ ঢাকা লোক দু’জন পকেট থেকে ফটো বের করে আবদুর রহমান ও জোয়ানের সাথে মিলিয়ে দেখল। তারপর দরজা থেকে সরে গিয়ে ফটো পকেটে ফেলে বলল, ‘যাও।’

‘আর কত জায়গায় এভাবে আমাদের সময় নষ্ট হবে বলতো?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘না আর চেক হবে না। মাদ্রিদের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে শুধু রিং রোড়ের পয়েন্টেই চেক করা হচ্ছে।’

‘আর ওদিকে? খুব বড় কিছু ঘটেছে নাকি?’

‘ওদিকে মানে উত্তর ও পুবদিকে মাদ্রিদে পৌঁছা পর্যন্ত বার বার চেক হচ্ছে।’

‘কি ঘটেছে তা তো বললেন না?’

‘আমরা জানি না। হুকুম হয়েছে আমরা কাজ করছি।’

‘ফটোগুলো সেই ক্রিমিনালদের বুঝি?’

‘ক্রিমিনাল কিনা জানি না।’

‘ফটো মিলিয়ে দেখছ, অথচ তারা কে জান না?’

‘জানি না কে বলল, ও আহমদ মুসা নামের একজন লোক। এত জানার তোমার কি দরকার, যাও।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল। লাফিয়ে উঠে চলতে শুরু করল গাড়ি।

আবার সেই গতিবেগ- একশ’ তিরিশ কিলোমিটার বেগে ছুটতে লাগল গাড়ি।

রাত তখন এগারটা।

রাস্তায় গাড়ি খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

রাতের নিরবতায় একটানা শো শো শব্দের স্পন্দন তুলে ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসা মুখটা একটু পাশে টেনে পেছনে জোয়ানকে লক্ষ্য করে বলল, 'জোয়ান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্লানের তালিকায় আহমদ মুসার পাশে তোমারও নাম উঠল মনে হয়। দ্বিতীয় ফটোটা ছিল সম্ভবতঃ তোমারই।'

'আমার সৌভাগ্য মুসা ভাই।' বলল জোয়ান।

'তোমার বাড়িতে থাকা তোমার জন্যে নিরাপদ হবে?'

'দ্বিতীয় বার পরিবর্তন করে যে বাসা নিয়েছি, সেটার সন্ধান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কিছুতেই পাবার কথা নয়।'

'তবু আজ রাতেই ফিরবে বাড়িতে?'

'অসুবিধা নেই মুসা ভাই।'

'ঠিক আছে, চল ফিলিপের ওখানে আগে যাই, তারপর তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'ঠিক আছে। আবদুর রহমান ভাই আমার বাসাতে তো যাবেই।'

'তোমাদের সম্মিলনিতে আমিও যেতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু ঘুমাব। ভোর রাতে আমাকে বেরুতে হবে।'

'ভোর রাতে? কোথায় মুসা ভাই?' বলল আবদুর রহমান।

'যে বাঘ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার গুহায়।'

'তার মানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টারে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরাও তো যাচ্ছি।' বলল জোয়ান।

'এবার না, কাল একাই যাব।'

আবদুর রহমান এবং জোয়ান দু'জনেরই মুখটা মলিন হলো। বলল জোয়ান, 'কি ক্ষতি হবে আমাদের নিলে, আমরা বাইরে পাহারায় তো থাকতে পারবো।

'কালকে আমি সংঘাত করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি চোরের মত গোপনে অনুসন্ধান অভিযানে। এখানে লোক যত কম, তত ভাল।'

আবদুর রহমান ও জোয়ান আর প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হলো, আহমদ মুসার এ যুক্তি তারা গ্রহন করতে পারেনি।

আবার নিরবতা নামল গাড়িতে।

সামনে একটু দূরে লিওন সাইনে ‘ওয়েলকাম’ শব্দটি জ্বল জ্বল করছে। ওখান থেকেই মাদ্রিদ শহরের শুরু।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাদ্রিদ শহরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আহমদ মুসার বুক থেকে। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল আহমদ মুসা।

ধীর ভাবে এগিয়ে চলল গাড়ি শহরের পথ ধরে।

তাহাজ্জত নামায শেষ করে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তারপর পোশাক পরে রাতের অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

রাতেই আহমদ মুসা তার এ অভিযানের কথা ফিলিপকে বলেছিল। ফিলিপও আহমদ মুসাকে একা যেতে দিতে রাজি হয়নি। আহমদ মুসা তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, সে যাচ্ছে একটা অনুসন্ধান মিশনে- তেজস্ত্রিয় পাতায় পরিকল্পনা- ম্যাপের সন্ধানে। এমন গোপন মিশন এক ব্যক্তির জন্যেই মানায় ভাল।’ ফিলিপ আর আপত্তি করতে পারেনি। আহমদ মুসার বিবেচনাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসা চলে এল দু’তালায় নামার সিঁড়ির মুখে।

বাড়িটা তিনতলা। তিনতলায় থাকে ফিলিপের পরিবার। দু’তলা জুড়ে লাইব্রেরী, স্টাডিরুম, স্টোর রুম, গেস্ট রুম ইত্যাদি। নিচের তলাটা রান্না, খাবার ও কর্মী ও কর্মচারীদের বাসের জন্যে। আর বড় ড্রইং রুমটা নিচের তলাতেই- একেবারে বাড়িতে ঢোকার মুখেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামার জন্যে পা তুলতে গিয়ে হঠাৎ বাম দিকে তিন তলায় উঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে একটি নারীমুর্তির উপর নজর পড়ল আহমদ মুসার।

আবছা আলো-অন্ধকারেও বুঝতে পারল ও মারিয়া। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্থিরভাবে।

আহমদ মুসা চমকে উঠার চাইতে বিরক্তি বোধ করল বেশী। এই রাতে, এইখানে, এইভাবে সে মারিয়াকে আসা করেনি। নামার জন্যে এগিয়ে দেয়া পাটা টেনে এনে দৃষ্টি নিচু করে বলল আহমদ মুসা, 'এত রাতে এখানে? কিছু বলবে মারিয়া?' গলার স্বরটা কঠোর শোনাল আহমদ মুসার।

মারিয়ার কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। মাথার রুমালের একটা অংশ মুখ দিয়ে কাপড় ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল তিন তলার দিকে।

আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে দোতলা থেকে নামার জন্যে। বিরক্তির চিহ্ন তার মুখ থেকে তখনও যায়নি। মারিয়ার কাছ থেকে এই আচরণ সে মেনে নিতে পারছে না।

নিচের তলার ড্রইং রুমের দরজায় এসে আহমদ মুসা দেখল ফিলিপ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি বারান্দায় তাকিয়ে দেখল গাড়ি রেডি।

বিস্মিত আহমদ মুসা ফিলিপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমন তো কথা ছিল না ফিলিপ, তুমি এভাবে উঠে বসে আছ! আমি তো দারোয়ানকে বলে রেখেছিলাম। কোনই অসুবিধা আমার হতো না।'

ফিলিপ বলল, 'আমাকে দোষ দেবেন না মুসা ভাই। মারিয়া আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। রাত ৩টার সময় ডেকে তুলেছে। বলেছে, 'আপনি আমাদের মেহমান, তার উপর যাচ্ছেন ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ঘাটিতে। কিছুতেই আপনাকে একা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তার কথা, আমি যেন আপনাকে আবার অনুরোধ করি আমাকে সাথে নেয়ার জন্যে।'

আহমদ মুসার মনটা নরম হলো। একধাপ এগিয়ে ফিলিপকে দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এ অভিযানের জন্যে যদি এমন প্রয়োজন থাকতো, তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম ফিলিপ। যদি পারি আজ শুধু ভাসকুয়েজের ঘরটা অনুসন্ধান করব, আর কিছু নয়। যখন প্রয়োজন হবে, তখন দেখবে ডেকে নিয়ে যাব।'

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে ফুয়েল মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভর্তি।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে পেছনে দাঁড়ানো ফিলিপের সাথে হ্যান্ডশেক করে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে গাড়িতে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি একটা গর্জন করে জেগে উঠে চলতে শুরু করল।

দারোয়ান আগেই গেট খুলে দিয়েছিল।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসার গাড়ি।

নিস্তব্ধ রাতের নিরব রাজপথ ধরে ছুটে চলল আহমদ মুসার গাড়ি তীর বেগে। লক্ষ ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টার।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

গোয়াদেল কুইভারে নতুন স্রোত

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Sohel Sharif
2. Monirul Islam Moni
3. Salahuddin Nasim
4. Gazi Salahuddin Mamun
5. Bondi Beduyin
6. Tariq Faisal
7. Ismail Jabihullah
8. Mohammod Amir
9. S A Mahmud
10. Anisur Rahman
11. Sharmeen Sayema
12. Arif Rahman
13. Mustafijur Rahaman
14. Mohammad Ahsanul Haque Arif
15. Nazrul Islam
16. Tareq Samsul Alam
17. Ashrafuj Jaman
18. Syed Murtuza Baker
19. Tuhin Azad
20. Md. Jafar Ikbal Jewel
21. A.S.M Masudul Alam
22. Mohammod Amir
23. Tabassum Jannat
24. Esha Siddique
25. Akramul Haq Farhad
26. Shaikh Noor-E-Alam